160 معجزة من معجزات القرآن الكريم

আল কুরআনের ১৬০ মুজিজা ও রহস্য

(বাংলা-bengali-البنغالية)

বিশেষ দ্রষ্টব্য

1431هـ - 2010م

islamhouse.com

আল কুরআনের ১৬০ মুজিজা ও রহস্য

160 MIRACLES AND MYSTERIES OF THE QURAN

ড. মাজহার কাজি

ভাষান্তর

মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ মুজহিরী

সম্পাদনা

এম মুসলেহ উদ্দিন

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

অন্যথা পাবলিকেশন

আল কুরআনের ১৬০ মুজিজা ও রহস্য
মূল: ড. মাজহার কাজি
অনুবাদ: মাওলানা ফয়জুল্লাহ মুজহিরী
সম্পাদনা: এম মুসলেহ উদ্দিন
মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক
বানান সমন্বয় ও পরিমার্জন: আলী হাসান তৈয়ব

প্রকাশক
অন্যথা পাবলিকেশন-এর পক্ষে
এম মুসলেহ উদ্দিন
ইসলামি টাওয়ার, ১১, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০১০

প্রচ্ছদ
হা-মিম কিফায়াতুল্লাহ

কম্পিউটার কম্পোজ
আলী হাসান তৈয়ব

মুদ্রণ
সালমানি প্রিন্টার্স, নয়াবাজার, ঢাকা
মূল্য: ১২০ টাকা মাত্র

প্রকাশকের কথা

আল কুরআনের ১৬০ মুজিজা ও রহস্য। রচয়িতা ড. মাজহার কাজি। বইটি, আল কুরআনের অলৌকিক ও রহস্যময় দিকগুলোর উন্মোচনে খুবই চমৎকার বলে মনে হয়েছে। সাবলীল ভাষায়, মনোজ্ঞ উপস্থানে, তথ্যবহুল রচনায় সমৃদ্ধ এ-বইটি আমেরিকা থেকে বগলে করে নিয়ে এসেছেন কল্যাণকামী এক দুর্লভ মানুষ জনাব এম মুসলেহ উদ্দিন। বইটি পড়ে অনেকেই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন বলে তিনি জানালেন। হবারও কথা তাই; কেননা আল কুরআনের ঐশী উৎসের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর ইসলামি ভাবাদর্শকে অকাট্য, শাশ্বত, নির্ভুল বলা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

মাওলানা ফয়জুল্লাহ মুজহিরী যথেষ্ট শ্রম দিয়ে অল্প সময়ে বইটির অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করেছে। উদিয়মান লেখক আলী হাসার তৈয়ব বইটির বইটির সার্বিক পরিমার্জনে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের সবাইকে উত্তম জাযা দান করুন।

যারা আল কুরআনের প্রতি বিশ্বাসী, বইটি তাদের বিশ্বাসের ভিত আরো মজবুত, সুদৃঢ় করবে বলে আশা। যারা অবিশ্বাসী, আশা করা অসঙ্গত হবে না, তাদেরকেও বিশ্বাসী করে তুলবে, আগ্রহ- প্রেরণার উপস্থিতির শর্তে।

ইসলামি আদর্শ-জীবনবোধের চৌসীমনার বাইরে, ভিন্ন আদর্শের গড্ডালিকা প্রবাহে গা-ভাসানোর উন্মত্ততায় যারা আক্রান্ত, বইটি তাদের জন্য বিশেষভাবে কাজে আসবে বলে আমার ধারণা।

বাংলা ভাষাভাষীদের হাতে বইটি তুলে দিতে পারায় আল্লাহর দরবারে লাখোকটি শুকরিয়া আদায় করছি।

-প্রকাশক

সম্পাদকের ভূমিকা

আল কুরআন আল্লাহর গ্রন্থ। ভাবে-ভাষায়-শব্দে আল কুরআন আল্লহর পক্ষ থেকে আগত, অবতীর্ণ। সাহিত্যের সকল ধরন-ধারণ ছাপিয়ে, কি নান্দনিকতায় কি পরিব্যাপ্ত জ্ঞানের সঞ্চারে, প্রজ্ঞার মহিমান্বিত-নিটোল বিচ্ছুরণে আল কুরআনের উচ্চতা অপরিমেয়।

কোনো মনুষ্য রচনা আল কুরআনের শীর্ষতা স্পর্শ করতে অক্ষম, অপারগ। সে হিসেবে আল কুরআন নিজেই তার ঐশী উৎসের দ্ব্যর্থহীন ঘোষক।

আল কুরআনের সকল দিকই অলৌকিক। জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায় মানুষ যতোই সমৃদ্ধ হচ্ছে, আল কুরআনের অলৌকিক দিকগুলো নানা আঙ্গিক থেকে স্পর্শ করার সুযোগ পাচ্ছে। বিশেষত আধুনিক বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার...বিভিন্ন শাখায়, বিচিত্র ময়দানে... আল কুরআনের অলৈকিতার কতার পক্ষে পেশ করে যাচ্ছে একের পর এক দলিল, উন্মোচিত করে যাচ্ছে এর রসহ্যালোক স্তরে-স্তরে।

বর্তমান বইটি আল কুরআনের অলৌকিক ও রহস্যময় বিষয়কেন্দ্রিক একটি অনবদ্য রচনা। বিষয়বস্তুর চয়নে, বিন্যাসে, সাবলীল উপস্থাপনায়, বইটি...এক্ষেত্রে রচিত অন্যান্য বইয়ের তুলনায়...অনন্যসাধারণ বললে অত্যুক্তি হবে না।

ড. মাজহার কাজি পেশায় একজন চিকিৎসক, নেশায় একজন দায়ী, ইসলাম প্রচারক। বইটির পাতায় পাতায় তার শ্রম ও মেধার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। মূল বইটি ইংরেজি ভাষায়। বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করেছেন মিরপুরের দারুর রাশাদ মাদ্রাসার সুযোগ্য শিক্ষক মাওলানা ফয়জুল্লাহ মুজহিরী। আক্ষরিকতা বজায় রেখে ঝরঝরে ভাষায় অনুবাদকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। মাওলানা ফয়জুল্লাহ মুজহিরীকে, এ জন্য, জানাই আন্ত রিক মোবারকবাদ।

সম্পদানার ক্ষেত্রে মূল ইংরেজি টেক্সটের সাথে অধিকাংশ অনুবাদ মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

লেখক, অনুবাদক, পরিমার্জক এবং বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশে যাদের শ্রম রয়েছে আল্লাহ তাদরে সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

এম. মুসলেহ উদ্দিন

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

ঢাকা- ২১/০২/২০১০

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

লেখকের অবতরণিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি এক ও অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞাতা, পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। তার দয়া ও করুণা ব্যতীত না কোনো কল্যাণ অর্জন করতে পারে, না পারে কোনো অকল্যাণ এড়িয়ে যেতে। তিনি আমার একমাত্র প্রভু। ইহকাল ও পরকালের সকল কর্মে তিনিই আমার জন্য একমাত্র সহায়। আমি সর্বোতভাবে তার দয়ার ওপর নির্ভর করি এবং আমার সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে তার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তার প্রিয় বান্দা, মনোনীত রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর। যিনি সর্বশেষ নবী, নবী-রাসুলের ক্রমধারার পরিসমাপ্তকারী, মানবজাতির জন্যে রহমত, সমুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, ঈমানদার ও বিশ্বাসীদের প্রতি সর্বাধিক দয়ালু ও প্রেমময় এবং বিচার দিনে আমার সুপারিশকারী। আল্লাহর রহমত ও দয়া অবতীর্ণ হোক তার পবিত্র পরিবার-পরিজন, তার সকল সাহাবি এবং তাদের ওপরও যারা তাকে অনুসরণ করবে কিয়ামত দিবস অবধি।

আগত পৃষ্ঠাগুলোতে কুরআন মাজিদের কিছু প্রকাশ্য মুজিজা পেশ করা হবে। পাঠকদের আলবত মনে রাখতে হবে, এই পৃষ্ঠাগুলি কুরআন মাজিদের কোনো নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করে নি। আমি ও গ্রন্থতালিকায় প্রদত্ত গ্রন্থগুলির রচয়িতাগণ কুরআন মাজিদের কিছু আয়াতকে কুরআনের প্রকাশ্য মুজিজা হিসেবে উপলব্ধি করি। যদিও কুরআন মাজিদের মুজিজা অসংখ্য। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা, বলা যায়, কিছু প্রমাণসমগ্র, যা আল কুরআনের এসব আয়াতরে অলৌকিক প্রকৃতির সমর্থনে উল্লিকিত লেখকগণ পেশ

করেছেন। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি এসব প্রমাণপুঞ্জের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত মতামত বাড়িয়ে না দিতে।

এই বইটির সকল অধ্যায় অথবা অংশত নয়জনের একটি প্যালেনকর্তৃক রিভিউ হয়েছে; পাঁচজন জন্মগত মুসলমান, যার মধ্যে তিনজন মেডিকেল ডাক্তার, তিনজন নওমুসলিম এবং একজন অমুসলিম। যেখানে ডাক্তারগণ সেসব আয়াতের বিস্ময়কর প্রকৃতি সম্পর্কে একবাক্যে স্বীকার করেছেন, যেগুলি 'মানবপ্রজাতি' ও 'ভ্রুণতত্ত্ব' বিষয়ক আবিষ্কার সংক্রান্ত অধ্যায়গুলিতে উপস্থাপন করা হয়েছে,- সেখানে অন্যান্য রিভিউকারীদের মতামতে বিভিন্নতা রয়েছে। উল্লেখ্য, একজন রিভিউকারী একটি আয়াতের যে ব্যাখ্যাকে তার বিস্ময়কর প্রকৃতির প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন নি, অন্য রিভিউকারী সেটিকেই কুরআনের প্রকাশ্য মুজিজা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অনুরূপভাবে একজন পাঠক সকল মুজিজার সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন, যা এই বইয়ে পেশ করা হয়েছে। অতএব পাঠকের উচিত হবে সেসব প্রমাণের ওপর মনোনিবেশ করা, যা কুরআনের প্রকাশ্য মুজিজা হিসেবে তার মনে আবেদন সৃষ্টি করে এবং এই বিশেষ বিশেষ আয়াত থেকে পথ নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা খুঁজে নেবে।

ডক্টর এ্যাঞ্জেলা উইলিয়াম হিউস্টনের সানডে ইসলামিক স্কুলের আমার একজন ছাত্র- আমার সঙ্গে হাতে হাতে কাজ করেছেন এবং এই কাজের একটি চূড়ান্ত রূপ দান করেছেন। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে নেহায়েত কৃতজ্ঞ এজন্যে যে, ডক্টর উইলিয়াম সেই দিন কালিমা পড়েছেন (ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন) যেদিন তিনি এই বইয়ের রিভিউ সম্পন্ন করেছেন। আমি ইতোপূর্বে 'কুরআনের ১৩০ প্রামাণ্য মুজিজা' নামে একটি বই প্রকাশ করেছিলাম। যা প্রথমে ১৯৯৮ সালে নিউইয়র্ক থেকে ছাপা হয়। পরবর্তীতে তা সৌদি আরব, ভারত এবং পাকিস্তান থেকেও ছাপা হয়েছিল। এই বইটি পূর্বের বইটির একটি পরিমার্জিত সংস্করণ। যারা পূর্বের বইটি পড়েছেন তারা এতে কিছু পরিমার্জন ও সংযোজন দেখতে পাবেন।

আমি দুআ করি যেন, পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ তাআলা এই তুচ্ছ কাজকে কবুল করেন এবং এটিকে তার দয়া ও ক্ষমা লাভের একটি উসিলা বানিয়ে দেন। আমি আরও দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন এই

কাজকে পাঠকদের জন্য হেদায়েত ও করুণা লাভের একটি উত্তম উসিলা বানিয়ে দেন। (আমিন)

মুহাররম, ১৪২৪ হিজরি

মার্চ ২০০৩ ঈসায়ি

ডক্টর মাজহার ইউ কাজি

হোস্টন, টেক্সাস

সূচী

অষ্টম অধ্যায়: কুরআন মাজিদের রহস্য সংক্রান্ত মুজিজাসমূহ

আল কুরআনের ১৬০ মুজিজা ও রহস্য

প্রথম অধ্যায়

কুরআন মাজিদের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতা

কুরআন মাজিদই আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত একমাত্র নিখাঁদ গ্রন্থ হিসেবে বর্তমান বিশ্বে চলমান। মুসলিম-অমুসলিম সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে যে, এটিই একমাত্র গ্রন্থ যা তার প্রাচীন অবস্থায় আজাবধি বিদ্যমান। এটি অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর, মানবজাতির জন্য হেদায়েতের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ বার্তা হিসেবে। এই মহিমান্বিত খোদায়ি গ্রন্থটি মানব সমাজে প্রচলিত সবধরনের প্রমাণ ও মানদণ্ডে উত্তীর্ণ সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত। পেছনের দিকে তাকালে দেখা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্তৃক এটি সর্বাপেক্ষা অকাট্য ও অভ্রান্ত বিশ্বাস হিসেবে নির্দেশিত, যেমনটি তা সর্বাধিক প্রামাণ্য ও শাশ্বতরূপে সংরক্ষিত। এই গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ, এমনকি বর্ণসমূহও সামান্যতম পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা সংমিশ্রণ– সবধরনের বিচ্যুতি থেকে সংরক্ষিত রয়েছে। এটি কেবল লিখিতরূপে গ্রন্থ আকারেই সংরক্ষিত নয়, বরং সব সময় অসংখ্য মানুষের হৃদয় তটেও সংরক্ষিত রয়েছে। এটি বিগত চৌদ্দশ বছর যাবৎ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে এবং একস্থান থেকে আরেক স্থানে কুরআন মাজিদেও সংরক্ষণ ও স্থানান্তরের বিশ্বাসযোগ্যতাকে আরও সুনিশ্চিত করেছে।

কোনো অনুসিদ্ধান্ত কিংবা রিপোর্টের (Reliability) গ্রহণযোগ্যতা ও (Validity) যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করতে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্যে একটি বৈজ্ঞানিক কৌশল সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। ওয়েবস্টার (The Webstar 1996) অভিধানে ‘Reliabile’ শব্দের অর্থ করা

হয়েছে নির্ভরযোগ্য (Trustworthy) এবং 'Valid' শব্দের অর্থ করা হয়েছে উত্তম (Sound) ও যুক্তিসম্মত (Logical)। অক্সফোর্ড (The Oxford) (১৯৯৫) 'Reliable' শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছে, 'able to be relied upon' (যার ওপর নির্ভও করা সম্ভব), 'constantly good in quality and pertormance' (মান ও যোগ্যতায় চির উত্তম) এবং 'Validity' শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছে এভাবে, having legal torce (নৈতিক বলের অধিকারী হওয়া), legally acceptable (নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য) sound to the points and logical (যথার্থরূপে উত্তম এবং যৌক্তিক)।

এ সকল সংজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে আমরা শব্দ দু'টিকে একটি সাধারণ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারি। কিছু লোক একটি আঞ্চলিক রেডিওস্টেশনে বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন শুনতে পেল। তাতে বলা হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট গুদাম বা স্টোর থেকে প্রত্যেক পণ্য ৫০% (শতকরা পঞ্চাশভাগ) কম মূল্যে বিক্রি হচ্ছে। যারা এই প্রজ্ঞাপন শুনল তারা এই তথ্যটি আর কিছু মানুষকে জানিয়ে দিল, যারা পর্যায়ক্রমে এই তথ্যটিকে অন্য কিছু লোককে জানাল। যদি এই বিনিময়ের প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকে অভিন্ন তথ্য প্রদান করে, তখন এই তথ্যকে নির্ভরযোগ্য (Reliable) বলা যাবে। উপরন্তু যদি লোকেরা সেই গুদামে গিয়ে দেখে যে, প্রত্যেক পণ্যই ৫০% হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি হচ্ছে– তখন এই তথ্যকে বলা হবে Valid বা প্রমাণসিদ্ধ। অন্যথায় তথ্যটি হবে invalid (অসত্য)। এভাবে একটি তথ্য নির্ভরযোগ্য কিন্তু অশুদ্ধ ও ভুলও হতে পারে।

তাহলে এবার আসুন উদাহরণটি আমরা কুরআনের সঙ্গে মিলিয়ে নিই। যদি এ কথা প্রমাণ করা যায় যে, রাসুলুল্লাহ সা. থেকে প্রজন্মান্তরে এবং স্থানবেধে আল কুরআনের বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি এবং বর্তমানে কুরআন মাজিদ হুবহু তেমনটিই আছে যেমনটি রাসুলুল্লাহ সা. মানুষের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন– তাহলে তা কুরআন মাজিদের নির্ভরযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করবে। আগত পৃষ্ঠাগুলি এমন কিছূ প্রমাণ যোগান দিচ্ছে যা কোনো ধরনের সন্দেহ-সংশয় ব্যতিরেকে কুরআনের নির্ভরযোগ্যতাকে প্রতিষ্ঠা ও সপ্রমাণ করবে।

যদি একথা প্রতিষ্ঠা করা যায় যে, কুরআন মাজিদ একটি খোদায়ি গ্রন্থ, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক অবতীর্ণ- তাহলে তা কুরআন মাজিদের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করবে সন্দেহাতীতভাবে। যা হোক, যৌক্তিকতার বিষয়টি জটিলতাপূর্ণ। কারণ, বাস্তবতা হল, মানুষের মন সেসব সত্য সম্পর্কে সংশয় লালন করে যা জড়বাদী পরীক্ষণের বলয় থেকে দূরে। এ কারণেই বইয়ের বাকি অংশ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কুরআনের যৌক্তিকতা ও সত্যতা প্রতিষ্ঠার প্রমাণ যোগান দিতে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

কুরআনের নির্ভরযোগ্যতা

মুসলমানরা কুরআনের সংরক্ষণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। প্রথমটি মৌখিক, হেফজ করার মাধ্যমে। দ্বিতীয়টি লৈখিক, লিপবিদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। নিচে এই পদ্ধতিদ্বয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল :

হেফজ করার মাধ্যমে মৌখিক বর্ণনা

নবী মুহাম্মদ সা. ছিলেন পূর্ণাঙ্গ কুরআন মাজিদের প্রথম হাফিজ (মুখস্ত কারী)। যখনই কুরআনের কোনো আয়াত নাজিল হত তিনি তা আত্মস্থ করে নিতেন। মাঝেমধ্যে অহি অবতীর্ণ হওয়ার সময় তিনি আয়াতগুলি দ্রুত পুনরাবৃত্তি করতেন পাছে যেন ভুলে না যান। আল্লাহ তাআলা তখন এত দ্রুততার সঙ্গে জিহ্বা না নাড়ানোর জন্যে বললেন এবং আল্লাহ তাআলা তাকে আশ্বস্ত করলেন যে, তিনি নিজেই কুরআন মাজিদ তার স্মৃতিতে সংরক্ষিত করে দেবেন। কুরআনের ভাষায় :

'তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্যে আপনি দ্রুত আপনার জিহ্বা নাড়াবেন না। এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্বে। অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব। (কিয়ামা, ১৬ : ১৯)

আপনার প্রতি আল্লাহর অহি সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কুরআন গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। (ত্ব-হা, ২০ : ১১৪)

এই আয়াতগুলি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয় যে, কুরআনের যে অংশই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর নাজিল হত, তা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তার মনে সংরক্ষিতও হয়ে যেত। এটি তাকে মানুষের কাছে কুরআন মাজিদকে হুবহু সেরকমভাবে ব্যক্ত করতে সক্ষম করেছে যেমনটি তিনি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে লাভ করেছেন।

হাদিসের গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, রমজান মাসে রাসুলুল্লাহ সা. পুরো কুরআন মাজিদ ফেরেশতা জিব্রাইলকে তেলাওয়াত করে শুনাতেন। অতঃপর তিনি জিব্রাইল আ. থেকে পুরো কুরআন মাজিদের তেলাওয়াত শুনতেন। এও বর্ণিত আছে যে, যে বছর রাসুলুল্লাহ সা. ইন্তেকাল করেন সে বছর তিনি পুরো কুরআন মাজিদ দুইবার তেলাওয়াত করেন এবং জিব্রাইল আ. থেকে দুইবার তেলাওয়াত শ্রবণ করেন। এভাবে আল্লাহ তাআলা তার মনোনীত প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্মৃতিতে কুরআন মাজিদের সংরক্ষণকে আরও বেশি সুনিশ্চিত করেন।

রাসুল সা. তাঁর সাহাবিদেরকেও কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত এবং মুখস্ত করার নির্দেশনা দিয়েছেন। এমন অসংখ্য হাদিস রয়েছে যাতে কুরআন মাজিদ শেখা ও শিখানোর ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। নিচে একটি হাদিস উল্লেখ করা হল, যা মহান সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সা. ইরশাদ করেন,

‘তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে কুরআন মাজিদ শিখে ও শিক্ষা দেয়।’ (বুখারি)

এই শিক্ষার ফলস্বরূপ অসংখ্য সাহাবি সমগ্র কুরআন মাজিদ হিফজ করেছেন। ইতিহাস এমন অনেক সাহাবির নাম সংরক্ষণ করে রেখেছে যারা পুরো কুরআন মাজিদ হিফজ করেছিলেন। তাছাড়া দৈনিক পাঁচওয়াক্ত ফরজ নামাজে কুরআনের তেলাওয়াত করা একটি অপরিহার্য বিষয়। এ কারণে সকল সাহাবি তাদের প্রাত্যহিক নামাজ আদায়ের জন্যে একটি বিশেষ অংশ মুখস্ত করেছিলেন।

অধিকন্তু রাসুলুল্লাহ সা.ও প্রাত্যহিক নামাজ আদায়কালে উচ্চস্বরে কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করতেন। এভাবে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সাহাবায়ে কিরাম প্রতিদিন তিন ওয়াক্ত নামাজ, যাতে উচ্চস্বরে কুরআন

তেলাওয়াত করা হয়- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তেলাওয়াত শ্রবণ করতেন। বহুসংখ্যক সাহাবি কুরআন মুখস্ত করার জন্যে এটি ছিল বাড়তি সহায়ক।

রমজান মাসে সাহাবায়ে কিরামের যুগে তারাবির নামাজ পড়ার রীতি ছিল। তারাবির নামাজের একটি সাধারণ চিত্র হল, যে ব্যক্তি তা পড়িয়ে থাকেন তিনি সচরাচর একজন হাফেজ হয়ে থাকেন। তিনি তারাবির নামাজের মধ্যে পুরো কুরআন মাজিদের তেলাওয়াত খতম করে থাকেন। এই রীতিটি প্রত্যেক যুগে অসংখ্য মুসলমানকে পুরো কুরআন মাজিদ হিফজ করতে সাহায্য করেছে। বস্তুত প্রত্যেক মুসলিম সমাজেই চাই তা ছোট কিংবা বড়- সব সময় এমন কিছু লোক আছে যারা পুরো কুরআন মাজিদ মুখস্ত করেছে। এসব লোক তাদের স্ব-স্ব সমাজ বা এলাকায় প্রতি বছর তারাবির নামাজ পড়িয়ে থাকেন এবং রমজান মাসে তিরিশ দিনের ভেতরেই তারাবির নামাজে পুরো কুরআন মাজিদ খতম করেন।

এসকল পদ্ধতিতেই প্রথম দিকে কুরআন মাজিদ সংরক্ষিত হয়েছিল, কেবল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্মৃতিতেই নয় বরং একটি বড় সংখ্যক সাহাবিদের অন্তরেও। তখন থেকে এই ধারা সারা পৃথিবীতে সকল মুসলিম প্রজন্মের মধ্যে চলে আসছে। প্রত্যেক মুসলমান সমাজ ও গোত্রে প্রত্যেক মুসলিম প্রজন্মে এমন অসংখ্য নারী-পুরুষ ছিল যারা পুরো কুরআন মাজিদ মুখস্ত করেছিল। এসকল লোক বাচনিকভাবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কুরআন মাজিদ বর্ণনা করেন। বস্তুত মানব ইতিহাসে কুরআন মাজিদই একমাত্র গ্রন্থ যা তার প্রতি বিশ্বাসীরা মুখস্ত করে এবং এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে বাচনিকভাবে বর্ণনা করে। ফলশ্রুতিতে কুরআন মাজিদের বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কখনও কোনো প্রশ্ন ওঠে নি।

লিখিত প্রামাণ্য বর্ণনা

হাদিস ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহ থেকে প্রমাণিত, যখনই রাসুল সা. কুরআনের কোন অহি লাভ করতেন তিনি একজন কাতিব বা লেখককে ডাকতেন এবং তা লিখে নিতে বলতেন। একই সাথে কুরআনের কোন আয়াত কোন জায়গায় রাখতে হবে তাও সুনির্দিষ্টভাবে বলে দিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি

লেখককে বলে দিতেন কোন সুরায় কোন আয়াতগুলো লিপিবদ্ধ করতে হবে। অতঃপর তিনি সুরার হুবহু সেই স্থানটি বলে দিতেন যেখানে অবতীর্ণ আয়াতগুলি সন্নিবেশিত করতে হবে। যেমন : অমুক সুরার অমুক আয়াতের আগে বা পরে। লেখক তখন কুরআনের অবতীর্ণ আয়াতগুলি খেজুর গাছের ছাল কিংবা পশুর চামড়া বা উটের হাড্ডিতে লিখে নিতেন অতঃপর তিনি আয়াতগুলি রাসুল সা. কে পড়ে শুনাতেন এবং তার লিখা ঠিক আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিতেন। ঐতিহাসিকগণ ও হাদিসের বিভিন্ন গ্রন্থাবলি ৪০ জনেরও অধিক কুরআনের অহি লেখকের নাম রেকর্ড করেছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ হলেন জায়েদ বিন সাবিত রা.।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের প্রসিদ্ধ ঘটনা আল কুরআন লিখিত আকারে সংরক্ষণ করার একটি সমুজ্জ্বল প্রমাণ, এ থেকে বুঝা যায় মক্কায় আংশিকভাবে লিখিত কুরআন ছিল সচরাচর, এমনকি যখন রাসুল সা. সবেমাত্র তার মিশন শুরু করেছিলেন তখনও। বর্ণিত আছে, একদা উমর রা. রাসুল সা.- কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ক্রোধান্বিত অবস্থায় বের হন। রাসুলের সা. বাড়ি যাওয়ার পথিমধ্যে কারও সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় এবং সে তাকে জানায় যে, তার বোন এবং ভগ্নিপতি ইসলাম গ্রহণ করেছে। উমর রা. দ্রুতবেগে তার বোনের বাড়িতে উপনীত হলেন এবং তাদেরকে কি যেন পড়তে দেখলেন। উমরের বোন তা লুকিয়ে ফেললেন। তখন উমরের সন্দেহ রইল না যে, তারা কুরআন তেলাওয়াত করছিল, তিনি তখন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন এবং উভয়কে প্রহার করতে লাগলেন। এরই মধ্যে তাঁর তার বোন মাটিতে পড়ে যান এবং তার দেহ থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করে। উমর রা. সম্বিত ফিরে পান এবং বুঝতে পারেন যে, তিনি তাঁর বোনকে আঘাত দিয়েছেন, তখন তিনি বোনকে অনুরোধ করলেন তারা যা পড়ছিল তা দেখাতে। বোন বললেন, তারা কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন এবং অপবিত্র অবস্থায় তিনি তা স্পর্শ করতে পারেন না। তিনি তাকে বললেন গোসল করে নিজেকে পবিত্র করতে। উমর সম্মত হলেন এবং লিখিত কপিটি নিয়ে পাঠ করলেন। তাতে সুরা 'ত্ব-হা'র কিছু আয়াত লিখিত ছিল। উমর তা পড়ে এত গভীরভাবে আলোড়িত হলেন যে, দ্রুত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাড়ির দিকে ছুটে গেলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইতিহাস ও হাদিসের গ্রন্থসমূহে সুলিখিত প্রামাণ্য এই ঘটনা থেকে বুঝা যায়, মক্কায় কুরআনের লিখিত কপি সুলভ

ছিল, এমনকি যখন মুসলমানদের ধর্ম পালন ও ইসলাম প্রচারের স্বাধীনতা ছিল না তখনও।

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাদিস থেকে জানা যায়, মদিনাতেও কুরআন মাজিদের লিখিত কপি সহজলভ্য ছিল। তন্মধ্যে একটি হাদিসে এসেছে, 'যখন লোকেরা মদিনায় আসত. তাদেরকে কুরআনের কপি সরবরাহ করা হত, যাতে তারা নিজে নিজে কুরআন মাজিদ পড়ে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে।' (সূত্রঃ হাদিসের একটি প্রাচীন গ্রন্থ 'সহিফায়ে হুমাম ইবনে মুনাব্বিহ')

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রাসুল সা. ইরশাদ করেন–

'সফরে তোমার সঙ্গে কুরআন নিয়ে যাবে না, পাছে তা আবার কোনো শত্রুর হাতে পড়ে যায় (যে তার অসম্মান করবে)।' (মুসলিম)

হাদিস ও ইতিহাসের বেশ কিছু গ্রন্থ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিদায় হজের বিস্তারিত বিবরণ উদ্ধৃত করেছে, যেখানে তিনি প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার (১,২৪,০০০) মুসলমানের সমাবেশে 'বিদায় ভাষণ' প্রদান করেছিলেন। রাসুল সা. বলেন, 'আমি তোমাদের কাছে দু:টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা সেগুলি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর, তবে তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না। (তা হল) আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসুলের সা. সুন্নাহ বা জীবনাদর্শ।' এই ভাষ্য পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তিকালের পূর্বে কুরআন মাজিদ একটি কিতাব বা গ্রন্থের আকারে সাহাবায়ে কেরামের কাছে সুলভ ছিল। নয়তো তিনি এটিকে একটি গ্রন্থ বলে উল্লেখ করতেন না।

বস্তুত কুরআন মাজিদও একথার সাক্ষ্য দেয় যে, তা সব সময় একটি গ্রন্থের আকারে সুলভ ছিল। 'নিশ্চয় এটি সম্মানিত কুরআন, যা আছে এক সুরক্ষিত গ্রন্থে। যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করে না। এটি জগতসমূহের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৭৭-৮০) এই আলোচনা থেকে যা পরিষ্কারভাবে সামনে আসছে তা হল, রাসুলুল্লাহ সা-এর জীবদ্দশাতেই কুরআন মাজিদ লিখিত আকারে সংরক্ষিত

ছিল। আর তা মক্কা ও মদিনায় মুসলিম-অমুসলিম সকলের কাছে সুলভ ছিল।

প্রথম খলিফা আবু বকর রা.-এর শাসনামল (১০-১৩ হি. মোতাবেক ৬৩২-৬৩৫ ইং) :

যখন রাসুল সা. চলে গেলেন, আবু বকর রা. প্রথম খলিফা মনোনীত হলেন। তাঁর খেলাফতকালে ৯ম হিজরি মোতাবেক ৬৩৩ ঈসায়ি) তে ইয়ামামার যুদ্ধ সংগঠিত হয়। একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান সেই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন, যাতে ৭০ (সত্তর) জন কুরআন মাজিদের হাফিজও ছিল। এসময় উমর রা. আবু বকর রা. কে পরামর্শ দিলেন এবং কুরআন মাজিদকে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরূপে দাপ্তরিকভাবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা জোরালভাবে তুলে ধরলেন। উল্লেখ্য যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশায় কুরআন মাজিদ একটি একক গ্রন্থিত বই আকারে সংকলিত ছিল না, তার কারণ; রাসুল সা. জানতেন না, কখন কুরআন মাজিদের সর্বশেষ আয়াতগুলি অবতীর্ণ হবে এবং কুরআনের কোন স্থানে সেগুলিকে রাখা হবে। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনের পরিসমাপ্তির সঙ্গেই কুরআন অবতরণের ধারা সম্পূর্ণ হবে।

আবু বকর রা. কুরআন মাজিদের প্রধান লেখক জায়েদ ইবনে সাবিত রা. কে নির্দেশ দিলেন বিভিন্ন আয়াতের বিচ্ছিন্ন লিখিত কপিগুলো সংগ্রহ করে একটি একক গ্রন্থরূপে বাঁধাই করতে। অতঃপর জায়েদ রা. ঘোষণা দিলেন, যাদের কাছে কুরআন মাজিদের কোনো লিখিত অংশ আছে তারা যেন সেগুলো তাঁর কাছে নিয়ে আসে। তিনি কুরআনের লিখিত কপিগুলো গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করলেন। যখন কেউ কুরআন মাজিদের কোনো বিশেষ অংশ নিয়ে আসত, তখন তিনি তা অন্যান্য লিখিত অংশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন। তারপর ঘোষণা দিতেন, কুরআনের এমন একটি লিখিত অংশ তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ- তিনি ঘোষণা করতেন, তিনি কুরআন মাজিদের ৬নং সুরার ১০-১৫নং আয়াতগুলির একটি লিখিত কপি হাতে পেয়েছেন। তখন তিনি অন্যদের বলতেন, এই আয়াতগুলি তাঁদের স্মৃতি থেকে তেলাওয়াত করতে। এভাবে কুরআনের লিখিত কপির নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করতেন। কমপক্ষে দু'জন

ব্যক্তি তাদের হিফজের সঙ্গে মিলিয়ে নির্দিষ্ট লিখিত কপির সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া ব্যতিরেকে তিনি তা গ্রহণ করতেন না। এভাবে তিনি কুরআনের সকল আয়াত একটি গ্রন্থাকারে সেই ক্রমানুসারে সন্নিবেশিত করলেন যেভাবে রাসুল সা. তা লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। কুরআনের এই কপিটি তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী হাফসা রা.-এর কাছে সংরক্ষণ করা হয় যা লিখিত কুরআনের অফিসিয়াল কপি হিসেবে ব্যবহৃত হত।

তৃতীয় খলিফা উসমান রা.-এর শাসনামল (২৪-৩৫ হি. মোতাবেক ৬৪৪-৬৫৫ ইং) :

তৃতীয় খলিফা উসমান রা.-এর শাসনামলে ইসলাম দূর-দূরান্তে বিস্তার লাভ করে। নওমুসলিমরা বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন মাজিদ পড়তে শুরু করে। তখন মুসলমানদের মধ্যে কুরআন মাজিদের বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে চরম বৈসাদৃশ্য দেখা দেয়। তখন উসমান রা. কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে অভিন্নতা আনয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি জায়েদ বিন সাবিত রা. এবং আরও তিনজন সাহাবিকে কুরাইশের স্থানীয় ভাষায় কুরআন মাজিদ পুনর্লিখনের জন্য নিযুক্ত করলেন। এটি সেই গোত্রের ভাষা যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। জায়েদ রা. কুরআন মাজিদের সেই প্রথম কপিটি আনিয়ে নিলেন যা রাসুলুল্লাহ সা.-এর স্ত্রী হাফসা রা.-এর তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত ছিল।

কুরআনের এই কপির ওপর ভিত্তি করে কুরাইশের স্থানীয় ভাষায় তিনি সাতটি (নতুন) কপি লিপিবদ্ধ করলেন। পরে উসমান রা. এই কুরআনের একটি করে কপি ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক রাজধানীতে প্রেরণ করেন। একটি কপি রাখেন মদিনায়। তিনি এই আদেশও জারি করেন যে, কুরআনের বাকি সকল কপি যেন নষ্ট করে ফেলা হয়। অধিকন্তু কুরআন মাজিদের প্রতিটি কপির সঙ্গে উসমান রা. একজন করে দক্ষ ক্বারিও প্রেরণ করেন যারা কুরাইশের স্থানীয় ভাষায় তেলাওয়াত করতে পারতেন। এটি কুরআনের পঠন ও লিখনের ক্ষেত্রে পুরো মুসলিম বিশ্বে একটি পরিপূর্ণ অভিন্নতা ও ঐক্য নিয়ে আসে। এই কপিসমূহের দু'টি এখনও বিদ্যমান

রয়েছে। একটি রাশিয়ার তাসখন্দে এবং অপরটি তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে। বাস্তবতা হল, বিগত চৌদ্দশ বছরে কুরআন মাজিদে কোনো ধরনের পরিবর্তনই আসে নি। যা বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান যে কোনো কপির সঙ্গে কুরআনের এই কপিগুলো মিলিয়ে দেখার মাধ্যমে নিরূপণ করা যেতে পারে।

তাবেয়িদের শাসনামল (সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী যুগ) :

সপ্তম শতাব্দীতে আরবি যে পাণ্ডুলিপি ব্যবহৃত হত, উদাহরণ স্বরূপ- রাসুল সা. ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে তা ছিল নিতান্ত মৌলিক প্রতীক সর্বস্ব। যা কেবল শব্দের ব্যঞ্জণবর্ণীয় রূপেই ব্যক্ত হত। কিন্তু তাতে শব্দের পরিষ্কার উচ্চারণ নির্দেশক চিহ্নগুলো ছিল না। ফলে তা কেবল একজন আরবি ভাষায় পারঙ্গম ব্যক্তিই পড়তে পাড়ত। তাবেয়িদের সময়ে দুপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নের শুরু হয় যা কুরআন মাজিদের অভিন্ন উচ্চারণকে আরও নিশ্চিত করে। পারিভাষিকভাবে এ লোকে 'নুকতা' ও 'হরকত' বলা হয়। 'হরকত' বলা হয় এমন কিছু বিশেষ চিহ্নকে যা স্বরবর্ণকে নির্দেশ করে। আরবিতে এগুলিকে 'ফাতহা', 'কাসরা' ও 'যাম্মা' বলে এবং বাংলায় যের, যবর ও পেশ বলে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের লিখন পদ্ধতিতে এগুলি ব্যবহৃত হত না। তাবেয়িগণই উসমান রা. কর্তৃক সংকলিত কুরআন মাজিদে এই চিহ্নগুলি সংযুক্ত করে। এভাবে প্রত্যেকটি শব্দ সুস্পষ্টভাবে পড়া যেতে পারে। যেমন, 'বা' কে 'বা' 'বি' 'বু' রূপে পড়া যায়।

'নুকতা' হল, প্রত্যেক শব্দের সঙ্গে যথোপযুক্ত বিন্দু বা বিন্দুসমূহ সন্নিবেশিত করা। যেমন : 'বা' এর নিচে একটি বিন্দু দেয়া হত, এবং 'ইয়া'-এর নিচে দু'টি বিন্দু দেয়া হত। অনুরূপভাবে 'তা' ও 'ছা' এর উপরে পর্যায়ক্রমে দু'টি ও তিনটি বিন্দু দেয়া হত। এই স্মরণীয় কাজ সম্পাদিত হয় উমাইয়া যুগের পঞ্চম খলিফা আব্দুল মালিকের আমলে (৬৬-৮৬ হি. মোতাবেক ৬৮৫-৭০৫)। বর্ণিত আছে, কুফার গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আরবি ভাষায় সুপণ্ডিত দু'জন ব্যক্তি- যাদের নাম ইয়াহইয়া বিন আমের এবং নাসর বিন আসেম- কে এই কাজ সম্পন্ন করার আদেশ দেন। 'হরকত' ও 'নুকতা'র

সংযোজন কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে একটি পরিপূর্ণ সমতা ও অভিন্নতা নিশ্চিত করে। এমনকি যাদের মাতৃভাষা আরবি নয় তাদের ক্ষেত্রেও।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হল যে, কুরআন মাজিদ মুমিনদের মাঝে দু'টি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র কৌশল ও পদ্ধতিতে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সংরক্ষিত ও বর্ণিত হয়ে এসেছে। যথা : বাচনিক ও লিখিত পদ্ধতি। কুরআনের বাচনিক বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে নি, তবে তার লিখিত বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছু উন্নতি বিধান করা হয়েছে। এই উন্নতি বিধান কেবল তার বিষয়বস্তু সংহত করে নি; বরং কুরআন মাজিদের তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও শাশ্বত ঐক্য ও অভিন্নতা নিয়ে এসেছে। বাস্তবতা হল, বিগত চৌদ্দশ বছরের মধ্যে তার এই বর্ণনার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন সাধিত হয় নি- যা বর্তমান পৃথিবীতে বিদ্যমান মূল ও আদিগ্রন্থ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে। একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের কতিপয় হাফেজ থেকে কুরআনের তেলাওয়াত শোনার মাধ্যমেও তা নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে। এভাবে কুরআন মাজিদ দু'টি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতার অভিধা লাভ করেছে। যথা : লিখার মাধ্যমে গ্রন্থরূপে এবং মুখস্ত করার মাধ্যমে বাচনিকভাবে। বস্তুত কুরআন মাজিদই একমাত্র খোদায়ি গ্রন্থ যা নির্ভরযোগ্যতার মানদণ্ডে পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে।

কুরআন মাজিদের প্রামাণ্যতা

কুরআন মাজিদের প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য এ কথা প্রমাণ করা আবশ্যক যে, তা আল্লাহ তাআলার বাণী এবং এভাবে একটি আসমানি গ্রন্থের ব্যাপারে একথা বলাইবাহুল্য যে, মানুষের কাছে এমন কোনো উপকরণ এবং কৌশল নেই যার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তির ভিত্তিতে তা প্রমাণ করা যেতে পারে। যা হোক, সাধারণ বোধ, কার্যকারণ, যুক্তি এবং বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে কেউ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অনুরূপভাবে কুরআনের প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও যে কেউ কিছু ভিন্ন ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করতে পারে।

অভিধানগুলিতে `Miracle' শব্দকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে স্বর্গীয় বা অলৌকিক কাজ হিসেবে। আল্লাহ তাআলাই কেবল এ ধরনের মিরাকল বা মুজিজা ঘটানোর ক্ষমতা ও ইচ্ছা রাখেন। অতএব যদি এ কথা প্রমাণ করা যায় যে, কুরআনের বিষয়বস্তু ও জ্ঞান কোনোভাবেই মানুষের পক্ষ থেকে হতে পারে না, তখন তা কুরআন মাজিদকে একটি মিরাকল বা মুজিজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে। আগত পৃষ্ঠাগুলি কুরআন মাজিদের কিছু প্রকাশ্য মুজিজা উপস্থাপন করবে। একজন পাঠক যদি এই মুজিজাগুলোর মধ্যে কোনো একটির ব্যাপারে এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে, তখন তা আল্লাহর বাণী ও আসমানি গ্রন্ত হিসেবে কুরআনের প্রামাণ্যতাকে প্রতিষ্ঠা করবে। ইরশাদ হয়েছে–

'নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাযিল করেছি মানুষের জন্য; তাই যে সৎপথ অবলম্বন করে, সে তা নিজের জন্যই করে এবং যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজের ক্ষতির জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। আর তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।' (যুমার : ৪১)

নিশ্চয় এ কুরআন এমন একটি পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল এবং যে মুমিনগণ নেক আমল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। (বনি ইসরাইল : ০৯)

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরআন মাজিদ :

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি জীবন্ত মুজিজা

'মিরাকল' বা মুজিজাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, তা এমন একটি কাজ যাকে প্রকৃতির নিয়মে ব্যাখ্যা করা যায় না বা তা এমন একটি বিষয় যা মানুষের ক্ষমতা ও সাধ্যের ঊর্ধ্বে। কিংবা তা এমন একটি ঘটনা যা মানবিক কার্যকারণ ও যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ থেকে বুঝা যায়, মুজিজা যেহেতু মানুষের ক্ষমতা ও যোগ্যতার মাধ্যমে আয়ত্ব করা যায় না, তাই তা অবশ্যই সরাসরি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার কর্ম বলেই বিবেচিত।

মুজিজা- আল্লাহ তাআলার প্রত্যক্ষ কাজ হিসেবে- আল্লাহ তাআলার সার্বভৌম ক্ষমতা ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের প্রতিফলন ঘটায়। মুজিজা মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ। এটি অনস্বীকার্য পরিষ্কার সত্য যে, আল্লাহ তাআলা বিশ্ব-জাহানের একমাত্র প্রভু। তাই তিনি তাঁর সকল সৃষ্টিকে তাঁরই আনুগত্যের নির্দেশ দেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ তাআলা মানুষকে সফলতা ও মুক্তির পথ দেখানোর জন্যে অনেক নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন। যখন কোনো সম্প্রদায়ের কাছে কোনো নবী প্রেরিত হতেন তখন তারা তাঁর কাছে এই দাবি করত যে, তিনি যেন তাদেরকে মুজিজা পেশ করে দেখান। তারা নবী কিংবা রাসুলের আখলাক ও আচরণের প্রতি ততধিক গুরুত্বারোপকারী ছিল না; সেই বাণীর প্রতিও নয় যা তিনি তাদের জন্য নিয়ে এসেছেন। বিপরীতে তারা এ ব্যাপারে অধিক উদগ্রীব ছিল যে, তিনি পারলে তাদেরকে কোনো অতি প্রাকৃতিক ব্যাপার দেখিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিবেন। ত আদম আ. থেকে শুরু করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবী-রাসুলই এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন।

উম্মতের প্রতি সকল নবী-রাসুলের জবাব ছিল একটিই- 'আমি আল্লাহ তাআলার একজন বান্দা বৈ অন্য কিছু নই এবং তোমাদের জন্যে তার পক্ষ থেকে একটি নির্দেশনা বা হেদায়েত নিয়ে এসেছি। আমার কোনো অতিরিক্ত ক্ষমতা নেই। আমার ইচ্ছা মাফিক কিংবা তোমাদের দাবি অনুসারে কোনো মুজিজা দেখাতে আমি সক্ষম নই।' যা হোক, আল্লাহ তাআলা তাঁর অপরিসীম দয়ায় প্রত্যেক নবী-রাসূলকে বহু মুজিজা দান করেন। এভাবে তিনি সব ধরনের সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে তাঁর নবী-রাসুলগণের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। একদল লোক এসব মুজিজাকে বক্রাঘাতমূলকভাবে জাদু ও ভেলকিবাজি বলে একেবারে উড়িয়ে দিত, পক্ষান্তরে যারা তাদের বিচার-বুদ্ধি, যুক্তি ও সাধারণ বোধকে কাজে লাগাত তারা নবী-রাসুলের এই অতিপ্রাকৃতিক কর্মসমূহকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুজিজা হিসেবে গ্রহণ করত এবং সম্মানিত নবী-রাসুলের বাণী অনুসরণ করত।

ইতিহাসও আমাদের এ কথা বলে, প্রত্যেক নবী-রাসুল যে সম্প্রদায় বা যে স্থানে প্রেরিত হয়েছিলেন সে সম্প্রদায় ও স্থানের জন্যে তাদেরকে বহু মুজিজা প্রদান করা হয়েছিল। একইভাবে এ কথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ক্ষেত্রেও সত্য। তিনি অগণিত মুজিজা দেখান, যা তার সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রত্যক্ষ করেছিল এবং ইতিহাস ও সিরাত গ্রন্থে তা যথাযথভাবে লিখিত রয়েছে। তম্মধ্যে কতিপয় হল : তাঁর আদেশে স্বস্থান থেকে একটি গাছের সরে আসা, সামান্য খাবার দিয়ে বহু লোককে আহার করানো, তাঁর সাথীদের আঙ্গুল থেকে আলোর বিচ্ছুরণ হওয়া, তাৎক্ষণিকভাবে রোগের নিরাময় করা, আঙ্গুলের ইশারার মাধ্যমে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করা ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি বহু ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যার সবকটিই সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবী-রাসুলগণের মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য নবী-রাসুলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন কোনো বিশেষ স্থান ও সময়ের জন্য। আর আল্লাহ তাআলা এসব নবী-রাসুলকে কিছু বিশেষ মুজিজা দান করেছিলেন, একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত

তাঁদের স্বজাতিকে প্রদর্শন করার জন্যে। এসব মুজিজা সময় ও স্থানের সঙ্গে সীমাবদ্ধ ছিল। এসব মুজিজা কেবল গল্প আকারে আজও বিদ্যমান রয়েছে মানব ইতিহাসের অংশ হিসেবে। অপরপক্ষে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন সর্বশেষ রাসুল হিসেবে। পুরো মানব জাতির জন্যে এবং আগত পুরো সময়ের জন্যে। এই বিষয়টির দাবি হল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে থাকবে এমন একটি সার্বজনীন মুজিজা যা স্থান-কাল নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য হবে। মানব ইতিহাসের প্রতিটি যুগের প্রত্যেক ব্যক্তি, পৃথিবীর যে অংশেই সে বসবাস করুক না কেন, যথার্থই বলতে পারে, 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্তমানে যদি আমার জন্য নবী হয়ে থাকেন, তাহলে আমি পছন্দ করব, আমার জন্য বর্তমানে একটি মুজিজাও থাকবে।'

আল্লাহ তাআলা মানব জাতির সর্বশেষ রাসূল হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তাকে যে সার্বজনীন মুজিজা দান করেছেন তা হল কুরআন মাজিদ। পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা কুরআন মাজিদের বিস্ময়কর প্রকৃতির বিবরণ দিয়ে অসংখ্য, অগণিত পৃষ্ঠা রচনা করেছেন। বস্তুত বিগত চৌদ্দশ বছর ধরে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক প্রজন্মই কুরআন মাজিদের নতুন নতুন বিস্ময় ও মুজিজা আবিষ্কার করেছে। এই অশেষ মুজিজা এ কথার শাশ্বত ও স্থায়ী প্রমাণ যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসুল এবং কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পুরো মানবজাতির জন্যে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত গ্রন্থ।

কুরআন মাজিদের বিস্ময়কর প্রকৃতিকে আরও ভালভাবে হৃদয়াঙ্গম করতে হলে আমাদেরকে সে স্থান ও কালের দিকে ফিরে দেখতে হবে যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৫৭১ ঈসায়ি সনে। তৎকালে মানবিক জ্ঞানের স্তর এতই অধপতিত ছিল যে, ঐতিহাসিকরা তাকে মানব ইতিহাসের 'অন্ধকার যুগ' বলে অভিহিত করেন। তখন মানুষের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ন্যূনতম জ্ঞানও ছিল না। তাছাড়া সাধারণ মানুষ না জানত লেখা-পড়া, না জানত মুদ্রণের কলা-কৌশল। ফলে যদি কোনো ব্যক্তি একটি সুনির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত

জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হত তবে সে জ্ঞান একটি সুনির্দিষ্ট বলয়ে সীমিত থাকত। সে জ্ঞান প্রচার-প্রসারের কোনো উপায় বা মাধ্যম ছিল না।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের মক্কা নামক একটি ছোট শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময়কালে আরব উপদ্বীপের জীবন ব্যবস্থা ছিল খুব সেকেলে। দেশটিতে যে কেউ দেখতে পেত কেবল সীমাহীন মরুভূমি ও বালিয়াড়ি। না ছিল সেখানে কোনো রাস্তা-ঘাট, না ছিল কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ, না ছিল কোনো বুনিয়াদি কৃষিব্যবস্থা। আরব উপদ্বীপের আবহাওয়া এমনকি বর্তমানেও এত উষ্ণ যে, ছায়ার মধ্যেও তাপমাত্রা প্রায়ই ১২০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উন্নীত হয়। এহেন রূঢ় আবহাওয়া ও দারিদ্রের কারণে আরব উপদ্বীপ বিদেশি বণিক কিংবা পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারে নি। গোটা বিশ্ব থেকে দেশটি ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ফলে প্রতিবেশী দেশ সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও রোমে যে সামান্য জ্ঞানের চর্চা ছিল তাও আরব উপদ্বীপে পৌঁছতে পারে নি।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, লোকেরা সেখানে যাযাবরের মত বসবাস করত। তারা তাদের গবাদিপশু ও পরিবারের জন্য বৃষ্টি ও চারণভূমির তালাশে নিয়মিত একস্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়াত। সেখানে ছিল না কোনো সরকারি ব্যবস্থাপনা, না ছিল কোনো নাগরিক আইন। এমনকি তথায় ছিল না কোনো সুসংহত নগর জীবন। লোকেরা গোত্রে গোত্রে বসবাস করত। গোত্রের শক্তি ও প্রতিপত্তিই একজন ব্যক্তির ক্ষমতা ও অধিকার হিসেবে বিবেচিত হত। 'জোর যার মুল্লুক তার' কেবল এই একটি নীতিই সে ভূখণ্ডে বলবৎ ছিল। অপেক্ষাকৃত শক্তিধর গোত্রগুলি দুর্বল গোত্রদের ওপর প্রায়ই লুটতরাজ ও লুণ্ঠন চালাত। এটিই ছিল তাদের জীবিকার প্রধান উৎস। অধিকন্তু গোত্রের শক্তি-সামর্থ নির্ভরশীল ছিল পুরুষদের সংখ্যার ওপর। নারীদেরকে বোঝা মনে করা হত। অধিকাংশ লোকই এ বোঝা বহন করতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে তারা তাদের নবজাতক কন্যা সন্তানকে হত্যা করত।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি ও তৎকালীন বিরাজমান অবস্থার উল্লেখ করার পর তাঁর শৈশবকালীন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও উল্লেখ করা উচিত বলে মনে করছি।

জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। ছয় বছর বয়সে তিনি তার মাকেও হারান। অতঃপর তাঁর পিতামহ দেখাশোনার ভার নেন। কিন্তু তিনিও পরপারে পাড়ি জমান যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বয়স মাত্র আট। এসময় তিনি তাঁর এক দরিদ্র চাচার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই চাচা তাঁকে কেবল আশ্রয়ই দান করতে সক্ষম ছিলেন। তিনি তাঁর জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করতে কিংবা জীবন ধারণের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণে সক্ষম ছিলেন না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও গবাদি পশু চরিয়ে চাচাকে সহযোগিতা করতেন। যে কেউ দেখতে পাবেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাল্য জীবন ছিল খুবই কঠিন ও অসাধারণ। তিনি তাঁর পিতা, মাতা কিংবা দাদার ভালবাসা ও সেবা-যত্ন লাভ করতে পারেন নি। তার ছিল না স্থায়ী কোনো ঠিকানা। এক অভিভাবক থেকে আরেক অভিভাবকের কাছে স্থানান্তরিত হয়ে হয়ে তিনি বড় হন। এই বিরূপ ও রূঢ় পরিস্থিতির কারণে ন্যূনতম জ্ঞান কিংবা শিক্ষা, যা তৎকালে মক্কায় সুলভ ছিল- তাও অর্জন করার সুযোগ তাঁর ছিল না। ঐতিহাসিকরা লিখেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না লিখতে জানতেন, না পড়তে। এমন কি তিনি নিজের নামটি পর্যন্ত স্বাক্ষর করতে জানতেন না। অধিকন্তু তাঁর জীবনের এহেন রূঢ় ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তাঁকে সেসব হাতে গোনা গুটিকয়েক শিক্ষিত লোকদের সাহচর্যে বসারও সুযোগ দেয় নি, যারা তৎকালে মক্কায় বসবাস করত।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে কেবল দু'বার দীর্ঘ সফর করেছেন। প্রথম সফর ছিল তাঁর আট বছর বয়সে। দ্বিতীয়বার সফর করেন যখন তাঁর বয়স পঁচিশ বছর। উভয় সফরই ছিল সিরিয়ার অভিমুখে বাণিজ্যের উদ্দেশে এবং খুবই সংক্ষিপ্ত। কোনো ঐতিহাসিক কখনও একথা লিখেন নি যে, এই সফরগুলি তাঁকে এমন কিছু জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করেছিল যা তিনি পরবর্তীতে কুরআন মাজিদে সন্নিবেশিত করেছেন। তিনি একজন সাধারণ আরব বেদুঈনের মত খুব সহজ সরল ও সাধাসিধে জীবন যাপন করতেন। তিনি না একজন জনসমাবেশের বক্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন, না একজন কাব্য রচয়িতা ছিলেন, আর না অন্য এমন কোনো কাজ সম্পাদন করেছিলেন যা তাঁর প্রতি অন্যান্যদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল।

তিনি কোনো ধরনের বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ কিংবা যুদ্ধে জড়াতেন না। একথা সর্বজন বিদিত যে, মক্কার লোকেরা মূর্তিপূজা করত এবং যখন তারা কাবা শরিফে প্রবেশ করত, তখন পুরুষ-মহিলা সকলে কাপড় খুলে ফেলত। এটি ছিল তাদের প্রার্থনা-রীতির একটি অংশ। এটিও সর্বজন বিদিত যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না তাদের প্রথার সমালোচনা করতেন, আর না তাদের মূর্তিপূজার। একটি মাত্র বিষয় যা ঐতিহাসিকরা তার বাল্যজীবন সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করেছেন তা হল, তিনি তাঁর সততা এবং সদাচারের জন্য পরিচিত ও সকলের সম্মানের পাত্র ছিলেন। আর এ জন্যই মক্কার লোকেরা তাঁকে 'আল-আমিন' বা বিশ্বাসী এবং 'আস-সাদিক' বা সত্যবাদী উপাধিতে ভূষিত করে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা করলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁকে পুরো মানবজাতির জন্য সর্বশেষ রাসুল হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব তখন হঠাৎ করে পাল্টে যায়। অনতিবিলম্বেই তিনি নানা ভূমিকা পালন করেন। যেমন, একজন ধর্মপ্রচারক, রাষ্ট্রনায়ক, বক্তা, সৈনিক, সেনানায়ক, নেতা, আইন প্রণেতা, বিচারক, চুক্তিসম্পাদনকারী, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, স্বামী, পিতা ইত্যাদি। তিনি এসব বিভিন্ন সেক্টরের প্রতিটিতেই এতই সফল ছিলেন যে, একজন ইহুদি ঐতিহাসিক মাইকেল এইচ হার্ট মানবজাতির একশজন মহান ব্যক্তিত্বের তালিকায় তাঁকে সবার শীর্ষে রেখেছেন।

মানবতার প্রতি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল আল্লাহ তাআলার আসমানি গ্রন্থ কুরআন মাজিদ, মানবজাতির ইতিহাসে যার কোনো তুলনা নেই। অন্যান্য নবী-রাসুলের মুজিজা তাদের জীবনকাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু কুরআন মাজিদ কিয়ামত পর্যন্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবন্ত মুজিজা হিসেবে বিদ্যমান থাকবে। কুরআন মাজিদ এমন অসংখ্য তথ্য ধারণ করে আছে যা তা অবতীর্ণ হওয়ার সময় মানুষের জানা ছিল না। এসব তথ্যের অনেকগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে বর্তমানে নিশ্চিত সত্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

বস্তুত প্রত্যেক যুগে মানুষ কুরআন মাজিদে নতুন নতুন 'মিরাকল' বা মুজিজা আবিষ্কার করেছে। মানুষের জ্ঞানের পরিধি যতই প্রসারিত হচ্ছে, ততই তা কুরআন মাজিদের মুজিজার তালিকাকে সমৃদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে, কুরআন মাজিদের বিষয়বস্তুতে এ পর্যন্ত কোনো ধরনের অসঙ্গতি কিংবা বিজ্ঞানের প্রামাণ্য সত্যের পরিপন্থী কোনো বিষয় পাওয়া যায় নি।

আগত পৃষ্ঠাগুলি কেবল কুরআন মাজিদের সমুজ্জ্বল মুজিজাসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করবে। এসব মুজিজা একথার সমর্থন ও সাক্ষ্য দেয় যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মত একজন নিরক্ষর মানুষ কুরআন মাজিদ রচনা কিংবা তাঁর মানবীয় কল্পনাশক্তির মাধ্যমে তার চিত্রকল্প তৈরি করতে পারেন না। উপরন্তু তা একথা প্রমাণ করে যে, কুরআন মাজিদ সর্বজ্ঞাতা ও মহামহিম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত একটি আসমানি মুজিজা। ইরশাদ হয়েছে-

'তুমি তো এর পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করতে না। আর না তুমি তোমার দক্ষিণ হাত দ্বারা তা লিখতে পারতে। এমনটি হলে, অবশ্যই মিথ্যাবাদীরা (কুরআন সম্বন্ধে) সন্দেহ পোষণ করত।' (আনকাবুত, ২৯ : ৮৮)

'আর এই কুরআন এমন নয় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ তা বানিয়ে নেবে। অবশ্য এটি পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়ন করে এবং সে কিতাবের বিশ্লেষণ করে যাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশ্বজাহানের পালনকর্তার পক্ষ থেকে। নাকি তারা বলে, তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা বানিয়ে এনেছেন? তুমি বলে দাও, 'তাহলে তোমরা নিয়ে আস এর মত একটি সুরা এবং আহ্বান কর (সাহায্যের জন্য) যাদেরকে তোমরা সক্ষম হও, আল্লাহ ব্যতীত। যদি তোমরা (তাতে) সত্যবাদী হয়ে থাক।' (ইউনুস, ১০; ৩৭ : ৩৮)

তৃতীয় অধ্যায়
কুরআন মাজিদের ভাষাগত মুজিজা

যদি আমরা কেবল কুরআন মাজিদের ভাষাকেই বিবেচনায় আনি এবং সাধারণ বোধ, বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তির নিরিখে তা পর্যালোচনা করি তবে আমাদের একথা স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে, কোনো মানুষ এধরনের নিখুঁত ও অনুপম ভাষা রচনা করতে পারে না। অধিকন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লিখতে-পড়তে জানতেন না। বাস্তবতা হল, এমনকি তিনি নিজের নামটি পর্যন্ত স্বাক্ষর করতে জানতেন না। তাঁর চারপাশে কোনো শিক্ষিত শ্রেণীও ছিল না। তাছাড়া আরব উপদ্বীপের বাইরে তিনি তেমন সফরও করেন নি, যেখানে তিনি ভাষার ওপর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারেন। তথাপি কুরআন মাজিদের ভাষা এক অনুপম বিস্ময় এবং তা নিজেই একটি মিরাকল বা মুজিজা। সরল যুক্তি ও সাধারণ বোধসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন মাজিদের গ্রন্থকার বা রচয়িতা হতে পারেন না। বরং এটি এমন একটি গ্রন্থ যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। নিম্নে যা পেশ করা হল তা আল কুরআনের ভাষাগত মুজিজাসমূহের সামান্য নমুনামাত্র।

মুজিজা-০১

যে সময় কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল, তৎকালীন আরবি গদ্য ও পদ্য সাহিত্য সমসাময়িক আরব পরিবেশ, সংস্কৃতি, প্রথা ও ইতিহাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এভাবে অধিকাংশ আরবি সাহিত্য গড়ে উঠেছিল উট, ঘোড়া, নারী, গোত্রপতি, গোত্রীয় সংঘাত ও গোত্রীয় ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ কিংবা প্রশংসার ওপর ভিত্তি করেএ যা হোক, কুরআন মাজিদ এমন কোনো

কিছুর বিবরণ দেয় না, যা তৎকালীন আরবীয় পরিবেশ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ইত্যাদির প্রতিফলন বলে বিবেচিত হতে পারে। তাছাড়া কুরআন মাজিদ বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনার বর্ণনার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব বিশেষ শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহার করেছে। এসব শব্দ ও পরিভাষার অধিকাংশই তৎকালীন সমসাময়িক লেখকদের জানা ছিল না। যেমন, কুরআন মাজিদ তার অধ্যায় বর্ণনার ক্ষেত্রে সুরা এবং তার চরণ বুঝানোর জন্য 'আয়াত' শব্দ ব্যবহার করেছে। অথচ তৎপূর্বের আরবি বইসমূহে অধ্যায় বুঝানোর জন্য 'কাসিদা' এবং চরণ বুঝানোর জন্য 'বায়ত' পরিভাষা ব্যবহৃত হত।

মুজিজা-০২

আরবি কবিতা ও গদ্য যখন কোনো বিষয় বা ঘটনার বর্ণনা দেয়, প্রায়ই তাতে এমন অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেয়া হয় যে, প্রকৃত ঘটনাই প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট হয়ে যায়। এটি আরবি ভাষার একটি সহজাত প্রবণতা। তবে কুরআন মাজিদের ভাষা কোনো কিছুকেই অতিরঞ্জিত আকারে ব্যক্ত করে না। বস্তুত কুরআন মাজিদের ভাষা এই বিচারে অনুপম যে, তা আরবি ভাষার স্বাভাবিক রীতি ও সহজাত প্রবণতার অনুসরণ করে না।

মুজিজা-০৩

সকল কবিতা ও কাব্যধর্মী লেখার ক্ষেত্রে এটি একটি বাস্তবতা যে, তার অল্প কিছু বাকরীতি কিংবা চরণ, শব্দ ও প্রবাদ-প্রবচনের বিচারে অন্যগুলির তুলনায় মানসম্পন্ন হয়ে থাকে। কুরআন মাজিদ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কাব্যধর্মী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তার সকল আয়াত ও সুরা সমভাবে সবাক, সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। এমন সুন্দর, অনুপম রচনাশৈলী ও ভাষার স্বচ্ছন্দ গতিসম্পন্ন ৬,৬৩৬ আয়াতের একটি গ্রন্থ রচনা করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

মুজিজা-০৪

যদি একটি নির্দিষ্ট ধারণা কিংবা ঘটনাকে একই গ্রন্থে বারবার উল্লেখ করা হয়, ভাষা সাধারণত শ্রুতিকটু ও একঘেয়ে হয়ে পড়ে এবং এতে তার সৌন্দর্যও হারিয়ে যায়। এটি কুরআন মাজিদেরই একমাত্র বৈশিষ্ট্য যে, বহু ধারণা ও ঘটনাকে পুনঃপুনঃ বর্ণনা করার পরও কুরানিক ভাষা তার সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে। কিছু বিষয় যেমন : আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াত, কিয়ামত দিবস, মুমিনের গুণাবলি, নামাজ, দান-দক্ষিণা ইত্যাদি কুরআন মাজিদর অধিক পুনরাবৃত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যাহোক কেউ এসব বিষয়ের বর্ণনার ক্ষেত্রে শব্দ ও বাকরীতির ন্যূনতম একঘেয়েমিও অনুভব করে না। পক্ষান্তরে এসব বিষয়ের প্রতিটি বিবরণ শব্দ চয়ন ও ভাষার সৌন্দর্যের বিচারে অনুপম ও স্বতন্ত্র। আমরা তাতে কোনো ধরনের শব্দ কিংবা বাকরীতির দ্বিরুক্তি লক্ষ করি না। এমনকি যদিও কুরআন মাজিদ একই ঘটনা কিংবা ধারণার পুণঃবর্ণনা দেয়।

মুজিজা-০৫

কুরআন মাজিদে আলোচিত অধিকাংশ বিষয়ই আকাইদ বা বিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতা, ব্যক্তিগত আচরণ, সামাজিক বাধ্যবাধকতা, নৈতিক বিষয় ও মানবিক ইতিহাস ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত। এ পর্যন্ত কোনো মানুষই এ ধরনের বিষয়ের ওপর কাব্যগ্রন্থ রচনা করে নি। পক্ষান্তরেন কুরআন মাজিদ এ ধরনের বিষয়ের আলোচনা পেশ করেছে এমন কাব্যধর্মী ভাষায় যা তার ছন্দে, সৌকর্যে ও রচনাশৈলীতে অতুলনীয়।

মুজিজা-০৬

একজন (মানুষ) লেখক সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট বিষয় কিংবা কিছু পারস্পরিক সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানগত নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। যেমন - কেউ ইতিহাস কিংবা অর্থনীতি কিংবা দর্শন কিংবা পদার্থ বিদ্যা কিংবা নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে লিখতে পারে। বহুসংখ্যক পরস্পর সম্পর্কিত নয় এমন বিভিন্ন জ্ঞানশাস্ত্রের ওপর যুগপৎভাবে কলম ধরা-ভাষার সমান স্বচ্ছন্ন গতিধারা অক্ষুণ্ন রেখে ও জ্ঞানের পূর্ণতার মাধ্যমে-কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি একজন সাধারণ পাঠকও দেখতে পাবে, কুরআন মাজিদ ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, আকাইদ, সামাজিক বিধান, বিজ্ঞান ইত্যাদি বহুসংখ্যক বিষয়ে আলোচনা করেছে, ভাষার সমান স্বচ্ছন্ন গতিধারা ও জ্ঞানগভীরতার সঙ্গে। তাছাড়া জ্ঞানের যে শাখা সম্পর্কেই কুরআন মাজিদ যা কিছু বর্ণনা দিয়েছে তা চিরন্তন সত্য হিসেবে সদা প্রমাণিত।

কুরআন মাজিদের কোনো সাধারণ বিবরণের ক্ষেত্রেও কখনও কোনো ধরনের অসঙ্গতি পাওয়া যায় নি। এমন সুনিপুণ ও নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে কোনো মানুষই এমন একটি সমন্বিত গ্রন্থ রচনা করে নি, করতে পারে না।

মুজিজা-০৭

একটি মানবরচিত গ্রন্থ সেই জ্ঞানেরই প্রতিনিধিত্ব করে যা একজন লেখকের জন্যে একটি নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে সুলভ হয়। মানুষের জ্ঞানের পরিধি নিত্যপ্রসার লাভ করছে। এজন্যে মানবরচিত প্রত্যেকটি বই-ই কিছুদিন পর অচল হয়ে যায়। একটি সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার পর একটি বইয়ে গ্রন্থিত জ্ঞান হয়তো মিথ্যা প্রমাণিত হয় কিংবা তা অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। মানবজাতিকে কুরআন মাজিদ প্রদান করা হয়েছে সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে। এই সময়ের মধ্যে মানুষের জ্ঞানে বহু পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়েছে।

যাহোক এটি একটি বাস্তবতা যে, কুরআন মাজিদের একটি একক শব্দ, প্রবাদ-প্রবচন, বাক্য কিংবা বিষয়বস্তুকে সংস্কার কিংবা পুনর্লিখনের প্রয়োজন পড়ে নি। তাছাড়া কুরআন মাজিদ প্রকৃতি ও মানুষের সুন্দরতম রহস্য সম্পর্কেও আলোচনা করেছে। এটিও একটি বাস্তব সত্য যে, বিগত চৌদ্দশ বছরের অধিককালে বিভিন্ন আবিষ্কার-উদ্ভাবন এবং বিজ্ঞানের নিরিখে কোনো সাধারণ অমিল কিংবা তারতম্য খুঁজে পাওয়া যায় নি। উল্লেখ থাকে যে, বর্তমান পর্যন্ত বাইবেলের বহুসংখ্যক সংস্করণ সাধিত হয়েছে। তথাপি বর্তমানেও তার মধ্যে বিজ্ঞানের সঙ্গে বহু সাংঘর্ষিক বিষয় রয়েছে।

মুজিজা-০৮

একজন সফল লেখক সর্বদা পাঠকের রুচি-বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে নিজের লেখার স্টাইল ও ভাষা পরিবর্তন করে থাকেন। যা একজন তরুণের মনে আবেদন সৃষ্টি করে, একজন বৃদ্ধলোকের মনে সৃষ্টি করে না। তেমনিভাবে যা একজন মূর্খ ব্যক্তির মনে আবেদন সৃষ্টি করে, একজন শিক্ষিত লোকের মনে আবেদন সৃষ্টি করে না। তাছাড়া জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার বিচারেও সমাজে নানা স্তরের মানুষ রয়েছে। এসব লোক ভিন্ন ভিন্ন ধাঁচের লেখার মাধ্যমে

আলোড়িত হয়ে থাকে। যেমন, একজন সুখীমানুষ যা পড়তে ভালবাসে তা একজন অসুখী মানুষ যা পড়তে ভালবাসে তা থেকে ভিন্ন।

কিছু লোক কবিতা পড়তে ভালবাসে, অন্যরা ভালবাসে গদ্য পড়তে। অন্য কিছু লোক সাদামাটা ভাষা পড়তে ভালবাসে, পক্ষান্তরে অন্যকিছু লোক ভালবাসে গুরুগম্ভীর ধাঁচের লেখা পড়তে। কোনো ব্যক্তিই এমন কোনো গ্রন্থ রচনা করেনি যা মানব সমাজের সকল বিভাগ, বয়স, শিক্ষার মান ও বিভিন্ন রুচির মানুষের মনে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে। তাদেরকে আলোড়িত ও অনুপ্রাণিত করতে পারে। কুরআন মাজিদই একমাত্র গ্রন্থ যা মানব সমাজের সকল পর্যায় ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রয়োজন সার্বজনীনভাবে পূরণ করেছে। একটি বিপুল সংখ্যক মানুষকে সম্বোধন ও তাদের অন্তরাত্মায় আবেদন সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রদান করার এই অতুলনীয় যোগ্যতা কুরআন মাজিদের ভাষার একটি বিশেষ 'মিরাকল' বা মুজিজা।

মুজিজা-০৯

যদি একজন মানুষ বছরের পর বছর লিখা অব্যাহত রাখে, সে তার লেখার স্টাইল, তার ধারণা ও চিন্তা-চেতনার মধ্যে একটি ক্রমশ পরিবর্তন দেখতে পাবে। এভাবে কেবল ভাষার মধ্যেই নয়, বরং একজন লেখকের দর্শন ও মতামতের ক্ষেত্রেও সময়ের একটি পর্যায় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সচরাচর পরিবর্তন দেখা যায়।

কুরআন মাজিদ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর ২৩ বছরব্যাপী সময়ের মধ্যে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে। যদি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন মাজিদের লেখক হতেন, তবে তার প্রথম দিকের লিখনীর সঙ্গে পরবর্তী সময়ের লেখনীর নিশ্চিত কিছু ভিন্নতা পরিলক্ষিত হত এবং সময়ের পালাবদলের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনা প্রকাশের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ও অনৈক্য দেখা দিত। যা হোক বাস্তবতা হল, কুরআন মাজিদের প্রথম দিককার ও পরবর্তী সময়ের অবতীর্ণ আয়াতসমূহের ভাষার মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয় না। অধিকন্তু প্রথম দিকের ও পরবর্তী সময়ে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের ভাষ্য ও দর্শনের ক্ষেত্রেও কোনো তারতম্য দেখা যায় না।

মুজিজা-১০

একজন (মানব) লেখক প্রায়ই তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের পরিবর্তিত অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। যা পরবর্তীতে তার আবেগ-অনুভূতিকে আলোড়িত করে। আর তা পরবর্তীতে তার লেখার স্টাইল ও স্বরূপে প্রতিফলিত হয়। কবিদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি অধিক বেশি সত্য। কেননা, কবিতা সর্বদা লেখকের মনন-মেজাজ ও আবেগের প্রতিফলন ঘটায়।

উল্লিখিত বাস্তবতার নিরিখে বলা যায়, কুরআন মাজিদ কাব্যধর্মী ভাষায় লিখিত হয়েছে, এ কথা লক্ষ্যণীয় যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দীর্ঘ ২৩ বছরের মিশনে অনেক ব্যক্তিগত বিপদাপদ ও বিজয়ের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করেছেন। তিনি নবুওয়াতের সপ্তম বছরে নিদারুণ কষ্ট ও কঠোরতার সম্মুখীন হন, যখন তিনি ও তার সকল আত্মীয়-পরিজন মক্কা থেকে বহিস্কৃত হন এবং তিন বছর যাবত জীবনের সবধরনের মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত থাকেন। পক্ষান্তরে ৮ম হিজরিতে তিনি একটি গৌরবময় বিজয় উপভোগ করেন। যখন তিনি ১০,০০০ (দশ হাজার) মুসলিম সেনাদলের প্রধান হিসেবে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং মক্কার সকল আত্মসমর্পণকারী লোককে সদয়ভাবে গ্রহণ করেন।

যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন মাজিদের লেখক হতেন তবে তার নবুওয়াতি মিশনের বিভিন্ন পরিস্থিতি ও সময়ে তার ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতিসমূহ কুরআনের ভাষায় প্রতিফলিত হত। কিন্তু বাস্তব সত্য হল, কুরআন মাজিদের স্টাইল কিংবা রচনাশৈলীতে এসবের কোনো প্রতিফলন দেখা যায় না- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনের বিভিন্ন স্তরে যেসব সংঘাত, অত্যাচার, অবিচার, কঠোরতা কিংবা বিজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। সব ধরনের পরিবেশগত উত্থান-পতন ও পরিবর্তনের ছোঁয়া থেকে বেঁচে থেকে কুরআন মাজিদের ভাষা এখনও পর্যন্ত সমহিমায় অটল-অবিচল।

মুজিজা-১১

কেবল কুরআন মাজিদের পাঠরীতিও একটি মুজিজা ধারণ করে আছে। অন্য কোনো বইয়ের ভাষার ক্ষেত্রে তেমনটি দেখা যায় না। বিষয়টি বুঝার

সুবিধার্থে একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দেয়া প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা একটি ইংরেজি বইয়ের পঠনকে বিবেচনায় আনি। একটি ইংরেজি বইয়ের একটি পৃষ্ঠা কিছু লোককে দেয়া যাক, যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি। কিন্তু তারা ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসী। যেমন : ইংল্যান্ড, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। তাদের প্রত্যেককে একই বইয়ের একটি পৃষ্ঠা পড়তে দেয়া যাক। দেখা যাবে প্রত্যেক ব্যক্তি পৃষ্ঠাটিকে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণশৈলীতে পড়ছে। এখন কিছু ক্বারি (যারা কুরআন মাজিদের তেলাওয়াত শিক্ষা করেছেন) নেয়া যাক, যাদের মাতৃভাষা আরবি নয়। যেমন : বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ঘানা, কানাডা, ফিলিপাইন ইত্যাদি। তাদেরকে কুরআন মাজিদের একটি পৃষ্ঠা পাঠ করতে বলা হোক। তাদের মাতৃভাষা আরবি নয় এবং তারা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের অধিবাসী এতদসত্ত্বেও তাদের প্রত্যেকেই একটি বিশুদ্ধ অভিন্ন উচ্চারণে কুরআন মাজিদ পাঠ করবে। এটি কুরআন মাজিদের অন্য একটি মুজিজা যে, যেসব লোকের মাতৃভাষা আরবি নয় এবং যারা কুরআন মাজিদের ভাষাও বুঝে না, তারা এটিকে একটি বিশুদ্ধ অভিন্ন রীতিতে, একই উচ্চারণশৈলীতে তেলাওয়াত করে।

মুজিজা-১২

কুরআন মাজিদের একটি সমুজ্জ্বল ও অনন্য মুজিজা হল, তার ভাষা এখনও সজীব। এখনও কুরআন মাজিদ সেই একই ভাষায় পড়া ও বুঝা যায় যে ভাষায় তা আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। পক্ষান্তরে সে যুগের মানুষের সকল ভাষাতেই পরিবর্তন এসেছে। একথা অনস্বীকার্য যে, একটি সময়ের পালাবদলে বহু শব্দ, বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচন অকেজো হয়ে যায়; শব্দের অর্থ ও তাদের বানানরীতিতে পরিবর্তন আসে এবং প্রত্যেক ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে কিছু নতুন শব্দ সংযোজিত হয়। সর্বোপরি শব্দের ব্যবহার, প্রবাদ বাক্য এবং বাক্যের গঠনশৈলীতেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে।

কুরআন মাজিদের একটি জীবন্ত মুজিজা চৌদ্দশ বছরের অধিককাল পরেও এই আসমানি কিতাবের না এক শব্দ, প্রবাদ বাক্য কিংবা বাগধারা অব্যবহৃত হয়ে গেছে, আর না তার প্রকৃত অর্থ হারিয়ে গেছে। যদিও আরবি ভাষা স্বাভাবিক গতি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে পথ অতিক্রম করেছে,

কুরআনের ভাষা তার সৌন্দর্য ও বাচনভঙ্গির মানদণ্ডে এখনও সমহিমায় সমুজ্জ্বল।

উপরোল্লিখিত বাস্তবতার নিরিখে দু'টি সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। মানুষ কি এমন একটি সার্বজনীন ভাষা রচনা করতে সক্ষম, যা ১৪০০ (চৌদ্দশ) বছর পর্যন্ত জীবন্ত ও মানুষের বোধগম্য থাকতে পারে? দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মত একজন ব্যক্তি যিনি না জানেন পড়তে, না জানেন লিখতে, না জানেন নিজের নামটি পর্যন্ত দস্তখত করতে-কিভাবে তিনি এমন একটি শাশ্বত রচনাশৈলী উপস্থাপন করতে পারেন? উভয় প্রশ্নের উত্তরই খুব সুনিশ্চিত। এমন শাশ্বত ও চিরন্তন ভাষা না কোনো মানুষ লিখেছে, আর না কোনো মানুষ লিখতে সক্ষম? কেবলমাত্র সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ তাআলারই এ ধরনের চিরন্তন ও সর্বাঙ্গসুন্দর পরিপূর্ণ ভাষা রচনার শক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে।

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে উপসংহার টানা যায় যে, কুরআনের মতো একটি গ্রন্থ রচনা করা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষে মানবীয়ভাবে সম্ভব ছিল না। কুরআন মাজিদের ভাষা এমনসব মিরাকল ও মুজিজা ধারণ করে যা বিচার বুদ্ধি ও যুক্তির নিরিখে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে না। এসব মুজিজা এই বাস্তব সত্যকে প্রমাণ করে যে, কুরআন মাজিদ সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আসমানি গ্রন্থ। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে এমন সমুজ্জ্বল মুজিজাসমূহ এজন্য রেখেছেন যাতে মানুষ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে এটিকে আসমানি হেদায়েত ও নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করে এবং এটির নির্দেশনা অনুসারে নিজেদের জীবন গঠন করে।

কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে, 'বলুন, যদি মানুষ ও জিন জাতি এ মর্মে একতাবদ্ধ হয় যে, তারা কুরআনের মত একটি গ্রন্থ (তৈরি করে) নিয়ে আসবে, তারা কিছুতেই তার মত রচনা করতে সক্ষম হবে না। এমনকি যদিও তারা (এ ব্যাপারে) পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হয়।' (বনি ইসরাইল, ১৭ : ৮৮)

তিনিই তোমার ওপর কিতাব নাজিল করেছেন, তার মধ্যে আছে মুহকাম আয়াতসমূহ। সেগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ্। ফলে

যাদের অন্তরে রয়েছে সত্যবিমুখ প্রবণতা, তারা ফিতনার উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ্ আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক, তারা বলে, আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে। আর বিবেক সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে। (আলে ইমরান, ০৩ : ০৭)

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাকৃতিক আবিষ্কার সংক্রান্ত মুজিজাসমূহ

কুরআন মাজিদ একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রাকৃতিক বিস্ময়ের বর্ণনা দেয়, যা তার অবতরণকালে মানুষের কাছে অজানা ছিল । তবে কুরআন মাজিদ এসব ঘটনাবলির এমন ভাষায় বর্ণনা দেয় যা স্থান-কাল-পাত্র বেধে সবার কাছে বোধগম্য। যদি কুরআন মাজিদ এসব বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিভাষা ব্যবহার করত, যেমন : গ্রহসমূহের কক্ষপথে বৃত্তাকার পরিভ্রমণ, অসংখ্য গ্যালাক্সি বা ছায়াপথের উপস্থিতি, মহাবিশ্বের নিত্য সম্প্রসারণ ইত্যাদি- তাহলে কয়েক শতাব্দী পূর্বের মানুষেরাও তা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হত না। এমনকি এটি কুরআন মাজিদের অন্য একটি মুজিজা যে, এতে পূর্বের অজানা অনেক প্রাকৃতিক ঘটনা ও তথ্য এমন ভাষায় সন্নিবেশিত হয়েছে যা একটি সার্বজনীন বার্তা বহন করে।

এটি অতীত প্রজন্মের মানুষের মধ্যে কোনো দ্বিধার উদ্রেক করে নি। পাশাপাশি এটি প্রত্যেক যুগের মানুষের জন্যে বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জের একটি চলমান উৎসে পরিণত হয়েছে। নিরন্তর গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ফলে মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডারে চৌদ্দশ বছরের ক্রমাগত সমৃদ্ধি দেখিয়ে দিয়েছে যে, প্রকৃতির রহস্য সম্পর্কে কুরআন মাজিদ যা-ই বর্ণনা দিয়েছে তা চিরসত্য। প্রকৃতি সম্পর্কে সাম্প্রতিক আবিষ্কারসমূহ মানুষকে কুরআন মাজিদের বার্তাসমূহ নতুন আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে উপলব্ধি করতে সক্ষম করেছে।

কুরআন মাজিদের বাণীসমূহ এমন যে, তা প্রত্যেক নতুন প্রজন্মের সঙ্গে জ্ঞান ও বোধশক্তির মান অনুযায়ী সরাসরি কথা বলে। এই আবিষ্কারসমূহ সব ধরনের সহজলভ্য বৈজ্ঞানিক ডাটা ব্যবহার করে মানুষকে কুরআন মাজিদের আয়াতসমূহ অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম করেছে। এটি

কুরআন মাজিদের অন্য একটি মুজিজা যে, এ সকল প্রাকৃতিক আবিষ্কারের কোনোটিই কুরআন মাজিদের একটি সাধারণ আয়াত, এমনকি একটি শব্দের মধ্যেও, কোনো অসঙ্গতি খুঁজে পায় না। পক্ষান্তরে এই আবিষ্কারসমূহ কুরআন মাজিদের বিষয়বস্তুর সত্যতার সপক্ষে সাক্ষ্য বহন করে।

কুরআন মাজিদের বৈজ্ঞানিক তথ্য, যা আগত পৃষ্ঠাগুলিতে উপস্থাপিত হয়েছে- তার অধিকাংশই মানুষ বিগত দুই শতাব্দীর মধ্যে আবিষ্কার করেছে। অথচ এই তথ্যগুলি মানুষের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে চৌদ্দশ বছরেরও অধিককাল পূর্বে এমন এক নবীর মাধ্যমে যিনি নিরক্ষর, যিনি না জানতেন পড়তে, না জানতেন লিখতে। এমনকি জানতেন না নিজের নামটি পর্যন্ত স্বাক্ষর করতে। নিশ্চিতভাবে বলা যায় এই বিষয়সমূহ এই নিরক্ষর বা উম্মি নবী সা-এর কল্পনা কিংবা রচনা হতে পারে না। এ কথা বিশ্বাস করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই যে, কুরআন মাজিদ সেই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আসমানি গ্রন্থ যিনি মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তা কোনোভাবেই চৌদ্দশ বছরের অধিককাল পূর্বের একজন ব্যক্তির রচনা হতে পারে না। নিম্নে কুরআন মাজিদের মুজিজাধর্মী বিস্ময়কর কিছু আয়াত তুলে ধরা হল :

মুজিজা-১৩

একটি গ্যাসীয় পিণ্ডরূপে মহাবিশ্বের সূচনা

তিনি মনোনিবেশ করলেন আসমানের (সৃষ্টির) প্রতি, যখন তা ছিল (কেবল) একটি ধুম্রকুঞ্জ। (ফুসসিলাত, ৪১ : ১১)

এই আয়াত নির্দেশ করে, গ্রহ-নক্ষত্র সমেত বিভিন্ন ছায়াপথ গঠিত হওয়ার পূর্বে, সূচনালগ্নে মহাকাশ ছিল কেবল একটি ধুম্রকুঞ্জ। Big Bang (মহা বিস্ফোরণ) তত্ত্বের একটি পরিমার্জিত রূপ, যার নাম Inflationary theory (স্ফীতি তত্ত্ব)। এটি একটি শূন্যস্থান থেকে আদি ঘনীভূত বস্তুর উদ্ভব হওয়ার বর্ণনা দেয়। বর্তমানে জ্যোতির্বিদদের কাছে অন্যান্য ছায়াপথগুলি মহাজাগতিক স্বর্পিল বাষ্পকুণ্ডলী ঘনীভূত হওয়ার মাধ্যমে গঠিত হওয়ার ছবি রয়েছে। সাম্প্রতিককালের এই দুই আবিষ্কার কুরআন মাজিদের উপরোক্ত আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যা হোক, এখানে

লক্ষণীয় বিষয় হল, জ্যোতির্বিদরা যাকে Mist বা 'বাষ্প' বলেছে, কুরআন মাজিদ তাকে বলেছে Smoke বা 'ধুম্র'। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, 'বাষ্প' হল পানির একটি শীতল ও শান্ত উড়ন্ত ধারা বা স্প্রে। পক্ষান্ত রে ধুম্র হল একটি উষ্ণ বায়বীয় পিণ্ড যা কিছু উড়ন্ত অনুকণা ধারণ করে। মূলত: এটিও কুরআন মাজিদের একটি সাহিত্যগত মু'জিজার দৃষ্টান্ত যে, এটি আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে যথোপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে তার যথার্থ বর্ণনা পেশ করে।

মুজিজা-১৪

একক বস্তুরূপে মহাবিশ্বের উদ্ভব

কাফেররা কি দেখে না যে, আকাশ ও পৃথিবী ছিল একত্রে সংলগ্ন (একটি টুকরার মত), অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করলাম। (আম্বিয়া, ২১ : ৩০)

এই আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা এমন একটি রহস্যের বর্ণনা দিয়েছেন যা বহু শতাব্দী পর্যন্ত বড় বড় প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও মহাকাশ বিজ্ঞানীদের অগোচরে ছিল। কুরআন মাজিদ এই আয়াতে মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্যকে ব্যক্ত করেছে দু'টি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে : 'ফাতাক্ব' ও 'রাতাক্ব'। আরবি ভাষায় 'রাতাক্ব' শব্দের অর্থ হল বস্তুর বিভাজন ও ভাঙনের প্রক্রিয়া এবং 'রাতাক্ব' শব্দের অর্থ হল, একটি সমজাতীয় ক্ষেত্রে কিছু পদার্থকে একত্রিতভাবে বাঁধা ও গ্রথিত করা। যাহোক, আয়াতে বলা হয়েছে, মহাকাশ ও পৃথিবী প্রথমে একত্রে সংলগ্ন ছিল এবং পরবর্তীতে সেগুলি পৃথক হয়ে যায়।

মহাকাশ বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণা, বিশেষত মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত Big Bang তত্ত্ব কুরআন মাজিদের এই বর্ণনাকে সমর্থন করে। Big Bang তত্ত্বটি সর্বপ্রথম ১৯৫০ সালে রাল্ফ আলফার, হ্যান্স বিথ ও জর্জ গ্যাস্মো কর্তৃক প্রস্তাবিত হয়। এই তত্ত্বানুসারে, গোড়াতে এই মহাবিশ্ব বস্তু ও শক্তির একটি অতি ঘন পিণ্ডের আকৃতিতে একক ইউনিটরূপে কেন্দ্রীভূত ছিল। প্রায় পনের বিলিয়ন বছর পূর্বে একটি বিস্ফোরণ সংগঠিত হয়। যখন কেবল ১০-৩২ সেকেন্ডের মধ্যে মহাবিশ্ব তার পূর্ব আয়তনের ১০ থেকে ৩০ কিংবা তারও অধিক গুণ বেশি প্রসারিত হয়। এই আকস্মিক মহা-বিস্ফোরণের ফলে বস্তু ও শক্তির অতি ঘন পিণ্ডটি টুকরো টুকরো হয়ে

ছড়িয়ে পড়ে, যা ভিন্ন ভিন্ন গতিতে ও ভিন্ন ভিন্ন দিকে ঘুরতে থাকে। অবশেষে বর্তমান মহাকাশের (মহাবিশ্বের) রূপ পরিগ্রহ করে। কুরআন মাজিদের এই আয়াতটি এ কথারই বর্ণনা দেয়- 'আকাশ ও পৃথিবী ছিল একত্রে সংলগ্ন, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করলাম।'

মুজিজা-১৫

আদি পিণ্ড বিভাজন ও বিক্ষেপনে সময় উপাদান

নিশ্চয় আমি (আল্লাহ) প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি পরিমিতরূপে, আমার কাজ তো এক মুহূর্তে, চোখের পলকের মত। (ক্বাসাস, ২৮ : ৪৯-৫০)

উপরোক্ত আয়াতের বর্ণনার অনুরূপ, বিজ্ঞানীরা মনে করে, আদি পিণ্ড বিভাজন ও বিক্ষেপনে সময় লেগেছিল ১/১০-৩২ সেকেন্ডেরও কম। এই আয়াত বলে আল্লাহ তাআলার আদেশ, চোখের পলকের মত। অন্যকথায় বলা যায়, আমাদের বর্তমান মহাবিশ্ব গঠনে সময় লেগেছিল শূন্য সেকেন্ডের একটি ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ। ১৯৭৭ সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল এই আবিষ্কারের জন্যে। অথচ কুরআন মাজিদ রহস্যের জট উম্মোচন করেছে বহু শতাব্দী পূর্বে।

মুজিজা-১৬

একাধিক বিশ্বের উপস্থিতি

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, যিনি সকল বিশ্বের প্রতিপালক। (ফাতিহা, ০১ : ০১)

এটি কুরআন মাজিদের প্রথম সুরার প্রথম আয়াত। চৌদ্দশত বছর পূর্বে মানুষের মন, পৃথিবী, সৌর জগৎ কিংবা ছায়াপথসমূহ সম্পর্কে কোনো ধরনের স্বচ্ছ ধারণা করতে অক্ষম ছিল। এমতাবস্থায় কুরআন মাজিদের সর্বপ্রথম আয়াত বলে যে, আল্লাহ তাআলা সকল বিশ্বের অধিপতি, যা পৃথিবী ব্যতীত আরও একাধিক বিশ্বের উপস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে। বস্তুত 'সকল বিশ্বের অধিপতি' কথাটি কুরআন মাজিদে সর্বমোট ৭৩ বার দেখা যায়। যেমন : সুরা ও আয়াত নং ২: ১৩১; ৬: ৪৫,৭১; ২৬: ১৬; ৩২: ০২;

৪১: ০৯; ৪৩: ৪৬; ৬৯: ৪৩ ইত্যাদি। বর্তমানে মানব সমাজ এ ব্যাপারে সম্যক অবহিত যে, পৃথিবী ছাড়া আরও গ্রহ রয়েছে। এই বিষয়টি জানা গেছে কেবল টেলিস্কোপ আবিষ্কার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে। অথচ সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা তার প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর এই জ্ঞান অবতীর্ণ করেছেন মানুষ টেলিস্কোপ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের অনেক পূর্বে।

মুজিজা-১৭

বিংশ শতাব্দীর একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার

কুরআন মাজিদ তিন প্রকারের সৃষ্টির কথা বারবার উল্লেখ করেছে : যেসব বিষয় বা বস্তু নভোমণ্ডলে রয়েছে, যেসব বস্তু ভূমণ্ডলে রয়েছে এবং যেসব বস্তু নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মাঝখানে রয়েছে।

আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তা যথার্থভাবেই সৃষ্টি করেছি। (হিজর, ১৫ : ৮৫)

নভোমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে তা তাঁরই। (ত্বাহা, ২০ : ০৬)

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মাঝে যা আছে, তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। (আম্বিয়া, ২১ : ১৬)

কুরআন মাজিদের আরও কিছু আয়াত সেসব বস্তুর নির্দেশ করে যা আল্লাহ তাআলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মাঝখানে সৃষ্টি করেছেন। যেমন : ২৫:৫৯; ৩২:০৪; ৪৩:৮৫; ৪৪:০৭, ৩৮; ৪৬:০৩; ৫০:৩৮; এবং ৭৮:৩৭। মহাকাশ বিজ্ঞান সংক্রান্ত আমাদের সাম্প্রতিক জ্ঞানের ভিত্তিতে আমরা বর্তমানে কুরআন মাজিদে বারংবার উল্লিখিত এসব বিষয়ের ব্যাখ্যার একটি পর্যায়ে রয়েছি। বৈজ্ঞানিকগণ সাম্প্রতিক সময়ে মহাশূন্যে ছায়াপথ বহির্ভূত বস্তুর উপস্থিতি আবিষ্কার করেছে। আমাদের মহাবিশ্বের মৌলিক গঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্তি ও একীভূত হওয়ার পর বিভাজন ও বিক্ষেপণের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। যেমনটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, কুরআন মাজিদ মহাবিশ্বের গঠন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছে সর্বাধিক উপযুক্ত আরবি শব্দ 'ফাতাক্ব' (বিভাজন)

ও 'রাতাক্ব' (সংযুক্তি)- এর মাধ্যমে। 'রাতাক্ব' (সংযুক্তি)- এর প্রাথমিক প্রক্রিয়ার সময় কিছু টুকরো মহাশূন্যের বাইরে থেকে গিয়েছিল। এগুলিকেই বর্তমানে আন্তঃছায়াপথীয় বস্তু বলা হয়। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা অতি সম্প্রতিই সেসবের উপস্থিতি সনাক্ত করতে পেরেছে। পক্ষান্তরে কুরআন মাজিদ এসব বিক্ষিপ্ত টুকরার উপস্থিতির স্বীকৃতি দিয়েছে বহু শতাব্দী পূর্বে।

মুজিজা-১৮

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ

> **আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে নভোমণ্ডল বিনির্মাণ করেছি এবং নিশ্চয় আমি (নিরন্তর) প্রসারণকারী।** (যারিয়াত, ৫১ : ৪৭)

১৯৩৭ সালে রেডিও টেলিস্কোপের (দূরদর্শন যন্ত্রের) উন্নয়নের পরই মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ডাটা-উপাত্ত প্রত্যক্ষ করা গেছে এবং তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রত্যক্ষণের বাইরে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা উপস্থাপন করেছেন, যাকে বলে 'Hubbel Control' তত্ত্ব। যা সেই পরিমাণ সরবরাহ করে সম্প্রতি মহাবিশ্বের প্রসারণের মাত্রা অনুমানের জন্য যা ব্যবহৃত হয়েছে। এখন বিষয় এই নয় যে, মহাবিশ্ব সম্প্রসারণ হচ্ছে কি-না। বরং বিষয় হল, তা কী মাত্রায় সম্প্রসারিত হচ্ছে? মহাকাশ বিজ্ঞানীগণ এই ব্যাপ্তিকে বিশ বিলিয়ন আলোকবর্ষের একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের পরিভাষায় ব্যক্ত করেছেন। রেডিও টেলিস্কোপ সম্প্রতি এই প্রমাণ সরবরাহ করেছে যে, এই মহাশূন্য প্রায় আলোর গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ ধরনের মহাকাশ বিজ্ঞানসংক্রান্ত সাম্প্রতিক জ্ঞান কিভাবে চৌদ্দশ বছর পূর্বের কুরআন মাজিদে বর্ণিত হতে পারে? তা এ কথাই প্রমাণ করে যে, কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত আসমানি গ্রন্থ।

আল কুরআনের ১৬০ মুজিজা ও রহস্য

মুজিজা-১৯

সপ্তস্তর বিশিষ্ট আসমান

> **তিনিই সে সত্তা (আল্লাহ) যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্যে যা কিছু রয়েছে জমিনে, তারপর তিনি মনসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুত তিনি তৈরি করেছেন সাত আসমান। আর তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত।** (বাকারা, ০২ : ২৯)

> **আর আমি তোমাদের ওপর সৃষ্টি করেছি সপ্তপথ।** (মুমিনূন, ২৩ : ১৭)

> **আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের ওপর মজবুত সপ্ত আকাশ।** (নাবা, ৭৮ : ১২)

এই আয়াতগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রহস্য হয়েই থেকে গেছে। এমনকি এই বিজ্ঞানের যুগের মানুষদের কাছেও। সাম্প্রতিক সময়ে একজন তুর্কি মহাকাশ বিজ্ঞানী ডক্টর হালুক নূর বাকি মহাকাশ বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণার ভিত্তিতে এই আয়াতগুলির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, যে মহাশূন্য আমাদের পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে তা নিম্নলিখিত সাতটি সমকেন্দ্রিক চৌম্বক স্তরে গঠিত।

১. মহাশূন্যের যে ক্ষেত্র সৌরজগত দ্বারা গঠিত তা প্রথম আসমানের প্রতিনিধিত্ব করে।

২. সম্প্রতি 'মিল্কিওয়ে' বা আকাশগঙ্গার চারপাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। আমাদের ছায়াপথের এই বিস্তৃত ক্ষেত্রটি দ্বিতীয় আসমানের প্রতিনিধিত্ব করে।

৩. ছায়াপথসমূহের `Local Cluster` মহাকাশীয় ক্ষেত্র তৃতীয় আসমানের প্রতিনিধিত্ব করে।

৪. ছায়াপথসমূহের সমন্বয়ে গঠিত মহাবিশ্বের কেন্দ্রীয় চৌম্বক ক্ষেত্র চতুর্থ আসমানের প্রতিনিধিত্ব করে।

৫. অতি দূর থেকে আগত আলোকতরঙ্গের উৎসসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী মহাজাগতিক বলয় পঞ্চম আসমানের প্রতিনিধিত্ব করে।

৬. মহাবিশ্বের প্রসারমান ক্ষেত্র ষষ্ঠ আসমানের প্রতিনিধিত্ব করে।

৭. মহাবিশ্বের প্রান্তহীন অসীমত্বের নির্দেশক সর্ববহিরস্থ ক্ষেত্র সপ্তম আসমানের প্রতিনিধিত্ব করে।

আসমানের এই স্তরসমূহ অকল্পনীয় স্থান জুড়ে আছে। প্রথম আসমান স্তরের পুড়ত্ব আনুমানিক ৬.৫ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার। দ্বিতীয় স্তর তথা আমাদের ছায়াপথের ব্যাস হল ১৩০ হাজার আলোকবর্ষ। তৃতীয় স্তরের বিস্তার ২ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। চতুর্থ স্তরের ব্যাস ১০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। পঞ্চম স্তরটি ১ বিলিয়ন আলোকবর্ষের দূরত্বে। ষষ্ঠ স্তরটি অবস্থিত ২০ বিলিয়ন আলোকবর্ষের দূরত্বে। একথা বলা বাহুল্য যে, সপ্তম স্তরটি বিস্তৃত হয়ে আছে অসীম দূরত্ব পর্যন্ত। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা সেই আল্লাহ তাআলার জন্যে যিনি এই সুবৃহৎ ও অসীম মহাবিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। এই হল সেই সপ্তস্তর আসমান যার ঘোষণা দিয়েছে কুরআন মাজিদ আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে।

মুজিজা-২০

পৃথিবীর ক্রমবিকাশে চারটি ধাপ

আর তিনি পৃথিবীর উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং তাতে বরকত দান করেছেন এবং চারদিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, তাদের জন্যে (তথ্যস্বরূপ) যারা জিজ্ঞাসা করে। (ফুসসিলাত, ৪১ : ১০)

বর্তমান বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর ইতিহাসকে নিম্নবর্ণিত প্রধান চারটি ভাগে বিভক্ত করেন−

১. Pre-Cambrian যুগ : ৬০০ থেকে ৩৩০০ মিলিয়ন বছর। এই যুগে পৃথিবী তার আদি পিণ্ড থেকে বিকশিত হয় এবং একটি স্বতন্ত্র

গ্রহের রূপ ধারন করে। জীবনের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের মাধ্যমে এ যুগের সমাপ্তি ঘটে।

২. Paleozoic যুগ : ২৩০ থেকে ৬০০ মিলিয়ন বছর। এই যুগে সর্বপ্রথম ভূমিজ লতা-পাতা, উভচর প্রাণী ও সরীসৃপ দৃষ্টিগোচর হয়। এটি হল প্রাচীন প্রাণ যুগ।

৩. Mesozoic যুগ : ৬৩ থেকে ২৩০ মিলিয়ন বছর। এটিকে মধ্যপ্রাণ যুগ বলে বিবেচনা করা হয়। মৌসুমী পরিবর্তনের সঙ্গে বৃক্ষ-লতা ভালভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছিল। মেরুদণ্ডী প্রাণী, স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখিও এ যুগে গোচরীভূত হয়। আর ডাইনোসর ছিল প্রচুর।

৪. Conozoic যুগ : বর্তমান সময় থেকে ৬৩ মিলিয়ন বছর। এই যুগ জীবনের বর্তমান ধাপকে অন্তর্ভুক্ত করে।

পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসকে এই চার ভাগে বিভাজন অবিন্যস্ত কিংবা বিশৃঙ্খল নয়, বরং তা করা হয়েছে দৈহিক গঠন প্রক্রিয়ার ক্রম-বিকাশের সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে। এই যুগগুলি বিশ্ব বিস্তৃত পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে সার্বজনীনভাবে গৃহীত হয়েছে। এগুলি প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিদজগতের ক্রমোন্নতি এবং মহাদেশগুলির গতিপ্রবাহ, মহাসাগর ও পর্বতমালার রূপ পরিবর্তনের রেকর্ডেরও প্রতিনিধিত্ব করে। এটিই সম্ভবত সেই চার যুগ যা কুরআন মাজিদ বর্ণনা করে−

'এবং তিনি (আল্লাহ) পৃথিবীর উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন.........তাতে খাদ্যের সংস্থান করেছেন চারদিনের মধ্যে (চারটি সুষম সময়ের মধ্যে)।'

এখানে লক্ষণীয় যে, পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের এই চারটি সময়কাল আকাশ, পৃথিবী ও পুরো মহাবিশ্ব সৃষ্টির ছয় সময়কাল থেকে ভিন্ন। সেগুলি অতীত হয়ে গেছে পাঁচ বিলিয়ন বছরেরও অধিককাল পূর্বে যেখানে মহাবিশ্বের বয়স বর্তমানে ১০ বিলিয়ন বছরেরও অধিক।

মুজিজা-২১

মহাশূন্য বিজয়

> **'হে জিন ও মানবকুল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলোয় তবে অতিক্রম কর। তবে (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) ক্ষমতা ব্যতিরেকে তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না।** (রহমান, ৫৫ : ৩৩)

এই আয়াতের প্রকৃত অনুবাদ বুঝার জন্যে কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় 'যদি' (ইংরেজিতে if) শব্দটি এমন একটি শর্ত নির্দেশ করে যা, হয়তো সম্ভব কিংবা অসম্ভব ---। আরবি ভাষায় 'যদি' বুঝানোর জন্যে একাধিক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যখন 'লাও' (لو) শব্দ ব্যবহৃত হয়, তা এমন একটি শর্ত নির্দেশ করে যা অসম্ভব। আর যখন 'ইন' (إن) শব্দ ব্যবহৃত হয়, তা এমন একটি শর্ত নির্দেশ করে, যা সম্ভব। উপরিউক্ত আয়াতে কুরআন মাজিদ (إن) 'ইন' শব্দ ব্যবহার করেছে। 'লাও' (لو) শব্দ ব্যবহার করে নি। অতএব কুরআন মাজিদ ইঙ্গিত করছে, এক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা বিদ্যমান রয়েছে যে, মানুষ একদিন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্তরসমূহ ভেদ করতে পারবে। আরও লক্ষণীয় যে, নিম্ন লিখিত আয়াতেও মহাশূন্য ভেদ করার কথা উল্লেখ করে। কিন্তু তাতে 'লাও' (لو) ব্যবহৃত হয়েছে–

'আর যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোনো দরজাও খুলে দিই, আর তারা তাতে দিনভর আরোহনও করতে থাকে, তবুও তারা একথাই বলবে, আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে, না- বরং আমরা যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।' (হিজর, ১৫ : ১৪-১৫)

এই আয়াতটিতে মক্কার কাফিরদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এমনকি যদি তারা নভোমণ্ডল ভেদ করতেও সক্ষম হয়, তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীকে বিশ্বাস করবে না। এই আয়াতে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে 'লাও' (لو) যা এমন সম্ভাবনার কথা বলে, যা বাস্তবায়িত হওয়ার নয়। ইতিহাস দেখিয়েছে, মক্কার কাফিররা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসংখ্য

মুজিজা প্রত্যক্ষ করেছে। তথাপি তারা তিনি যে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে নি।

ইতোপূর্বে উদ্ধৃত আয়াত সম্পর্কে আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। তাতে আরবি শব্দ 'তানফুযু' (تنفذوا) ব্যবহৃত হয়েছে, যার ক্রিয়ামূল হল 'নাফাজা' (نفذ) যার পরে আরবি শব্দ 'মিন' (من) এসেছে। আরবি অভিধান অনুসারে এই বাকরীতির অর্থ হল, 'সোজা অতিক্রম করা এবং একটি বস্তুর একদিকে প্রবেশ করে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে আসা। অতএব এটি নির্দেশ করে একটি গভীর অনুগমন এবং একটি বস্তুর অপরপ্রান্ত দিয়ে নির্গমন। এটি হুবহু তা-ই, যে অভিজ্ঞতা বর্তমানে মহাশূন্য বিজয়ের ক্ষেত্রে মানুষ লাভ করেছে। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি একটি বস্তু ছেড়ে দেয় এবং তা মহাশূন্যে তার বাহিরে নির্গমন করে। এভাবে কুরআন মাজিদ মহাশূন্য বিজয়ের বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করেছে। অধিকন্তু এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিকতথ্য, সর্বাধিক উপযুক্ত শব্দে, চৌদ্দশ বছরেরও পূর্বের এমন একজন নিরক্ষর মানুষের নিছক কল্পনা বলে আরোপিত হতে পারে না, যিনি তার পুরো জীবন কাটিয়েছেন একটি মরুময় এলাকায়।

মুজিজা–২২

পৃথিবীর ডিম্বাকার কিংবা বর্তুলাকার আকৃতি

> **'অতঃপর তিনি (আল্লাহ) পৃথিবীকে দান করেছেন ডিম্ব আকৃতি।'** (নাজিয়াত, ৭৯ : ৩০)

এই আয়াতে যে আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা হল 'দাহাহা' 'دحها'। পুরনো অনুবাদগুলিতে এই আয়াতের অর্থ রয়েছে- 'অতঃপর তিনি পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছেন।' যেহেতু তারা পৃথিবীর আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না তাই তারা দাহাহা (دحها) শব্দটিকে 'দাহবুন' (دحو) এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছিলেন এবং তার অর্থ করেছিলেন 'প্রসারিত করা বা বিছিয়ে দেওয়া।' 'দাহা' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'উটের ডিম'। নিম্নে তার কিছু সাধিত শব্দ দেওয়া হল–

= আল-উদহিয়্যু (الأدحي) ! উটপাখির ডিম।

= আল-উদহুয়্যাতু (الأدحوة) ! উটপাখির ডিমের স্থান।

= তাদাহহিয়ান (تدحيا) : গর্তের মধ্যে একটি পাথর পতিত হওয়া।

আয়াতটি এভাবে পৃথিবীর গোলাকৃতি হওয়ার কথা পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণের ব্যাসের তুলনায় নিরক্ষীয় ব্যাসের আপেক্ষিক পার্থক্য এটিকে একটি বর্তুল আকৃতি কিংবা ডিম্ব আকৃতি দান করেছে। আরও পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে, পৃথিবীর প্রকৃত আকৃতি গঠনে এই আকৃতিটি কিছুটা বিকৃত হয়েছে, যাকে বলা হয় 'Geoid', যা একটি নাশপাতির অনুরূপ। পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাসার্ধ্য হল ৬৩৭৮ কিলোমিটার, যেখানে তার মেরু অঞ্চলীয় ব্যাসার্ধ্য হল ৬৩৫৬ কিলোমিটার।

এই আয়াত থেকে একথাও বুঝা যায়, আদিকালে পৃথিবী এই আকৃতির ছিল না। পরবর্তীতেই এই আকৃতি প্রাপ্ত হয়। মহাকাশ বিজ্ঞানে পৃথিবীর বর্তমান আকার সম্পর্কে দুটি মতবাদ রয়েছে। প্রথম মতানুসারে, পৃথিবী ছিল সূর্য থেকে ছিটকে পড়া একটি টুকরো। দ্বিতীয় মতানুসারে, সূর্য ও পৃথিবী উভয়টিই একটি নীহারিকা থেকে গঠিত হয়েছে। উভয় মতই স্বীকার করে, প্রথম যখন পৃথিবী সৃষ্টি হয় তখন তার বর্তমান আকার ছিল না। পরবর্তী সময়েই এটি ডিম্বাকার লাভ করেছে। এই আয়াতটি উভয় মতের সঙ্গে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই আয়াতের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এটি সুরা 'আন নাযিয়াত'-এরই একটি অংশ, যাকে 'Extractors' বা উৎপাটনকারীগণ শব্দে ভাষান্তরিত করা যেতে পারে। এই সুরায় সৃষ্টি সম্পর্কিত আরো কিছু রহস্য বর্ণিত হয়েছে। ২৮ থেকে ৩২ নং আয়াত পর্যন্ত আছে পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য।

৩১ নং আয়াতে আছে, 'আর তিনি তা থেকে নির্গত করেছেন পানি ও চারণভূমি।' অন্য কথায়, এই আয়াত বলে, পৃথিবী তার ডিম্ব আকৃতি লাভ করার পর তাতে পানি প্রদান করা হয়েছিল। ফলে তা পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর উদ্ভিদ, যেমন- তৃণ বা ঘাস উৎপন্ন করেছিল। আধুনিককালের ভূতত্ত্ববিদরাও এখন এ কথা বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবী বর্তুলাকৃতি লাভ করার পর

বারিমণ্ডল গঠিত হয়। সৃষ্টি হয় সাগর-মহাসাগর। অতঃপর ক্রমান্বয়ে উদ্ভিদরাজি উদ্‌গত হয়।

৩২ নং আয়াতে আছে, 'আর পর্বতমালা, তিনি স্থাপন করেছেন সুদৃঢ়ভাবে।' মহাবিশ্ব সৃষ্টির যে ক্রম পর্যায় কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে ভূবিদ্যাসংক্রান্ত অধুনা ধারণাসমূহ তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

মুজিজা নং– ২৩

বিচার দিবসে পৃথিবীর স্বরূপ

> **যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এই পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং আসমানসমূহকে (অনুরূপভাবে) এবং লোকেরা একক, পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে পেশ হবে।** (ইবরাহিম, ১৪ : ১৮)
>
> **যখন পৃথিবী (-এর আকৃতি) সম্প্রসারিত করা হবে এবং তা নিক্ষেপ করবে তার গর্ভস্থিত সবকিছু আর তা হয়ে যাবে শূন্যগর্ভ।** (ইনশিক্বাক, ৮৪ : ০৩-০৪)

প্রথম আয়াতে যে আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা হল 'মুদ্দাত' (مدت) যার অর্থ করা যেতে পারে : প্রসারিত, সমতল বা চ্যাপ্টাকৃত, কিংবা চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে চওড়াকৃত। এই আয়াত বলে, বিচার দিবসে পৃথিবী হয়ে যাবে সমতল। অন্য কথায় এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, বর্তমানে পৃথিবী সমতল অবস্থায় নেই। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল হতে পারে ৬০৯ থেকে ৬২২ ঈসায়ি সালের মধ্যে। সে সময় একথা সার্বজনীনভাবে বিশ্বাস করা হত যে, পৃথিবী সমতল। প্রায় এক হাজার বছর পর পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোপার্নিকাস এই তথ্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন যে, পৃথিবী আমাদের গ্রহজগতের কেন্দ্রবিন্দু নয়। পরবর্তী সময়ে গ্যালিলিও গ্যালিলি কোপার্নিকাসের তথ্যকে সমর্থন করে ঘোষণা দেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে এবং তা সমতল নয়; বরং গোলাকার। কুরআন মাজিদে এই বাস্তবতা অবতীর্ণ হয়েছে বহু শতাব্দী পূর্বে।

পৃথিবী তার গোলাকৃতির কারণে, কখনো তার সমগ্র অংশে একই সময়ে দিন হয় না। তার যে অংশ সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে তাতে দিন হয় এবং তার বিপরীত অংশে হয় রাত। পক্ষান্তরে, বিচার দিবসে একই সময়ে সারা পৃথিবীতে দিন থাকবে। এটি তখনই সম্ভব যখন পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার থেকে সমতলে পরিবর্তিত হবে। এটা হুবহু তা-ই যা উপরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে কুরআন রচনা করে থাকেন, তবে তিনি কিভাবে এ ধরনের জটিল প্রাকৃতিক রহস্য উদ্ঘাটনে সক্ষম হলেন?

মুজিজা নং– ২৪

ভূমির সংকোচন

> **তারা কি দেখে না যে, আমি ভূভাগকে তার প্রান্তসীমা থেকে ক্রমান্বয়ে সংকোচিত করে আসছি? আল্লাহ নির্দেশ দেন। তার নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।** (রা'দ, ১৩ : ৪১)

যেমনটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, পূর্ব যুগের মুসলমানরা এই আয়াতটিকে কুরআন মাজিদের একটি রহস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। যতদিন তাদের যথাযথ জ্ঞান ছিল না, তারা এই আয়াতের সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করতে চেষ্টা করে নি। অধুনা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আজ আমাদেরকে এই আয়াতের অর্থ অনুধাবন করতে ও ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম করেছে।

এটি একটি জ্ঞাত বিষয় যে, মেরু অঞ্চলে জমাট বরফের স্তুপগুলি গলতে শুরু করেছে এবং সাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা পর্যায়ক্রমে আরও ভূভাগকে ঢেকে ফেলছে। আয়াতে উল্লিখিত প্রান্তসীমা হল সমুদ্র উপকুলসমূহ। মেরু অঞ্চলের গলিত বরফের ফলে যতই সমুদ্রের উপকুল পানির নিচে তলিয়ে যাবে, ততই ভূভাগ বা পৃথিবী সংকোচিত হয়ে পড়বে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথীরা চৌদ্দশ বছর

পূর্বে আরব উপদ্বীপের মত একটি মরুভূমিতে বসে এই বিস্ময়কর তথ্য নিশ্চয় কল্পনা করতে সক্ষম ছিলেন না।

মুজিজা নং– ২৫

ভূ-গর্ভস্থ তৈলসম্পদের গঠন

> **আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের মহিমা বর্ণনা করুন। যিনি সৃষ্টি করেছেন (সবকিছু) এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন। আর যিনি উৎপন্ন করেছেন তৃণ-লতা। অতঃপর তাকে পরিণত করেছেন কাল 'গুছা'।** (আল-আলাক, ৮৭ : ০১-০৫)

অধিকাংশ অনুবাদের ক্ষেত্রে কুরআন মাজিদের শব্দ 'গুছা' غثاء -এর জন্যে খড়কুটা বা আবর্জনা (ইংরেজিতে stubble) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যে ব্যক্তি ভূতত্ত্ববিদ্যা সম্পর্কে ধারণা রাখে, সত্বরই সে জানতে পারবে, এই আয়াতটি তৈলজাত সম্পদ গঠনের রহস্যের বর্ণনা দেয়। ভূতত্ত্ববিদদের ধারণা মতে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম উদ্ভিদ ছিল প্রকাণ্ড পর্ণাঙ্গ ও সামুদ্রিক শৈবাল। যদি এ সকল তৃণশ্রেণী যেমনটি ছিল তেমনটি বিদ্যমান থাকত, তবে আবহাওয়ায় অক্সিজেনের পরিমাণ অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে যেত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডলে আগুন ধরে যেত। উল্লিখিত আয়াতটি এ কথারই ব্যাখ্যা প্রদান করে : 'আপনার পালনকর্তা প্রত্যেক বস্তুকে তৈরি করেছেন সুপরিমিতভাবে।' এভাবে প্রকাণ্ড পর্ণাঙ্গ ও শৈবালদাম পরবর্তীতে প্রবল ভূতাত্ত্বিক আলোড়নের মাধ্যমে মাটির নিচে চলে যায় এবং বিশেষ রাসায়নিক লঘুকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তেলে পরিণত হয়।

বর্তমানে এটা জ্ঞাত বিষয় যে, তৈলজাত খনিজ পদার্থগুলি প্রধানত গঠিত হয়েছিল বিভিন্ন জাতের ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ সকল পর্ণাঙ্গ ও শৈবালের বিগলন ও পচনের মাধ্যমে, যা শিলাস্তরের ফাঁকে আটকে পড়ে। বর্তমানে একথাও আমাদের অজানা নয় যে, তৈলজাত পদার্থ কৃষ্ণ তরল পদার্থের রূপে ভূগর্ভস্থ নদীতে প্রবাহিত হয়। এই ভূ-অভ্যন্তরীন প্রবাহকে

বর্ণনা করার জন্যে 'বন্যার পানি'ই সবচেয়ে পরিষ্কার অভিব্যক্তি। এ কারণে এই আয়াত তৈলনদীর প্রবাহেরও বর্ণনা দেয়, যাকে ভূতত্ত্ববিদ্যার পরিভাষায় 'oil migration' বলা হয়।

মুজিজা নং– ২৬

বৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রাণের জাগরণ

> **আর (আল্লাহ) যিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন পরিমিত পরিমাণে। অতঃপর আমি (আল্লাহ) তা দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করি মৃত ভূভাগকে। তেমনিভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।** (যুখরুফ, ৪৩ : ১১)
>
> **আর আমি তৈরি করেছি পানি থেকে প্রাণবন্ত সবকিছুকে। এরপরেও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?** (আম্বিয়া, ২১ : ৩০)

সজীব বস্তুর মৌলিক রাসায়নিক উপাদান হল হাইড্রোজেনের সেতুবন্ধন, যাকে বলা হয় 'হাইড্রোজেন বন্ড'। এই হাইড্রোজেন কেবল পানির আয়োনাইজেশানের মাধ্যমেই প্রতিস্থাপিত হতে পারে। এ কারণেই প্রাণের জন্যে পানি অপরিহার্য। একটি পানিশূন্য বস্তু জমাট কঙ্কালের মত, যদিও তা তার জেনেটিক কোডসহ DNA সংরক্ষণ করে থাকে। এটি প্রয়োজন পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ন গ্রহণ করা ব্যতীত না পুনরুৎপাদন করতে পারে, আর না পারে ক্রিয়াশীল হতে। যখন পানি পৌঁছে এবং হাইড্রোজেন-আয়ন প্রদান করে, তখন প্রাণের জেনেটিক কোড সক্রিয় হয়। এটি ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে অতি সাধারণ ঘটনা। প্রায় ১০০ বছর পূর্বে এ তথ্য আবিস্কৃত হয় যে, বিভিন্ন ধরনের প্রাণ সত্তা দ্বারা মাটি গঠিত। প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে আবিস্কৃত হয়, মাটির ৮০ ভাগ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা গঠিত। তারা বৃষ্টির পানি পাওয়া মাত্রই প্রয়োজন পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ন গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন পুনরুৎপাদনশীল কর্মতৎপরতা শুরু করে। বৃষ্টির পানি এভাবে মৃত ভূমিতে পুনরুজ্জীবন নিয়ে আসে। বিজ্ঞানীরা যা আবিষ্কার করেছেন সাম্প্রতিক সময়ে কুরআন মাজিদ তার বর্ণনা দিয়েছে বহু শতাব্দী পূর্বে।

ধারণা করা হয়, আদম আলাইহিস সালাম থেকে এ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় দশ বিলিয়ন মানুষ বসবাস করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির জেনেটিক কোডের আকার প্রায় এক মাইক্রন (এক মিলিমিটারের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ)। যদি আমরা তাদের সকলের জেনেটিক কোড সংগ্রহ করি, তবে তাতে একটি চায়ের পেয়ালাও পূর্ণ হবে না। এসব জেনেটিক কোড এখনও মাটির নিচে সংরক্ষিত আছে। এটি তেমনি সুনিশ্চিত যে, যখন আল্লাহ্ তাআলা এক ছিটা বৃষ্টির ফোটায় মৃত ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন, তেমনি তাঁর ক্ষমতা রয়েছে জেনেটিক কোডসমূহকে সাধারণ হাইড্রোজেন বন্ডের যোগান দেয়া। তখন কিয়ামত দিবসে সকল মানুষ জেগে ওঠবে। কুরআন মাজিদ তারই বর্ণনা প্রদান করে, 'তেমনিভাবেই তোমরা পুনরুত্থিত হবে।'

মুজিজা নং– ২৭

পর্বতমালার গঠন-কাঠামো ও ভূমিকা

> **তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানসমূহ কোনো খুঁটি ব্যতীত, যা তোমরা দেখছ। আর তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা, পাছে যেন তা তোমাদের নিয়ে ঢলে না পড়ে।** (লোকমান, ৩১ : ১০)
>
> **আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা এবং পর্বতমালাকে পেরেক? আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়।** (নাবা, ৭৮ : ৬-৮)

সম্প্রতি ভূতত্ত্ববিদরা আবিষ্কার করেছেন, গাছের শিকড়ের মত পর্বতমালার সুদৃঢ় ভিত্তি রয়েছে, যা মাটির সুগভীর পর্যন্ত প্রোথিত। অধিকন্তু তা পৃথিবীর স্থিতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কুরআন মাজিদ এই আয়াতে যে আরবি শব্দ ব্যবহার করেছে তা হল 'আওতাদ' (أوتادا)। আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী এবং ড. মুহসিন খান ইংরেজিতে তার অনুবাদ করেছেন, Peg। ইংরেজি অভিধানগুলি Peg শব্দের অর্থ করতে গিয়ে লিখে– A pin or a nail that is used to bold something or to fasten part

of a thing together. (একটি পিন কিংবা পেরেক যা কোনো কিছু ধরে রাখতে বা একটি বস্তুর দুটি অংশকে দৃঢ়ভাবে একত্রে আটকানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়)। এই আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ তাআলা পর্বতমালাকে করেছেন সুবৃহৎ পেরেক সদৃশ, যা মাটির সুগভীরে প্রোথিত এবং এসবের কাজ হল পৃথিবীর স্থিতি প্রতিষ্ঠা করা। এটি হুবহু তা-ই, যা বর্তমানে ভূতত্ত্ববিদরা পর্বতমালার গঠনপ্রকৃতি ও তার ভূমিকা সম্পর্কে আবিষ্কার করেছেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, আরব উপদ্বীপে কোনো সুবৃহৎ পর্বত নেই। অধিকন্তু তার অধিকাংশ পর্বতই বালিময়, শিলাবিশিষ্ট নয়। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত তিনি আর কে হতে পারেন, যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর কুরআন মাজিদে এই তথ্য অবতীর্ণ করেছেন?

মুজিজা নং– ২৮

আলোর একমাত্র উৎস হিসেবে সূর্য

> **আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের ওপর সুদৃঢ় সপ্ত (আকাশ) এবং স্থাপন করেছি (তন্মধ্যে) একটি উজ্জ্বল প্রদীপ।** (নাবা, ৭৮ : ১২-১৩)
>
> **তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ কিভাবে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে এবং তন্মধ্যে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে।** (নূহ, ৭১ : ১৫-১৬)

এই আয়াতগুলিতে কুরআন মাজিদ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা দেয় যে, আমাদের সৌরজগতের জন্যে সূর্যই একমাত্র আলোর উৎস। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এ সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, চন্দ্র আলোর উৎস নয়, বরং সূর্যের আলোর প্রতিফলন মাত্র। কুরআন মাজিদ এই সত্যের বর্ণনা দিয়েছে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণার মাধ্যমে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করার বহু শতাব্দী পূর্বে।

মুজিজা নং– ২৯

চন্দ্র ও সূর্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি

> **তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি সূর্যকে বানিয়েছেন একটি জ্যোতিষ্ক এবং চন্দ্রকে আলোকরূপে। আর নির্ধারণ করেছেন তার জন্য মনজিলসমূহ। যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা ও (সময়ের) হিসাব। আল্লাহ তা সৃষ্টি করেন না, তবে যথার্থভাবে। তিনি (এভাবে) বিবৃত করেন (তাঁর) নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে, সেসব লোকের জন্যে যারা অনুধাবন করে।** (ইউনূস, ১০ : ০৫)
>
> **শপথ, সূর্যের এবং তার কিরণের। শপথ, চন্দ্রের যখন তাকে প্রতিফলিত করে।** (শামস, ৯১ : ১-২)

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, বাইবেল চন্দ্র ও সূর্যকে সব সময় সমজাতীয় শব্দে উল্লেখ করেছে। যথা Light (বাতি)। এটি সূর্যের আগে greater (বৃহত্তর) বিশেষণ যোগ করে এবং চন্দ্রের আগে Lower (ক্ষুদ্রতর)। তাতে আছে, 'বৃহত্তর বাতি দিন নিয়ে আসে এবং ক্ষুদ্রতর বাতি নিয়ে আসে রাত।' (জেনেসিস, ১ : ১৭)

যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন মাজিদ বাইবেল থেকে নকল করতেন, যেমনটি কিছু খৃস্টান অপবাদ দিয়ে থাকে, তিনিও সূর্য ও চন্দ্রের জন্য একই ধরনের শব্দ ব্যবহার করতেন। যাহোক, কুরআন মাজিদ এই সূর্য ও চন্দ্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছে। একটিকে বলা হয়েছে, 'নূর' (আলো), যা চন্দ্রকে নির্দেশ করে। অন্যটিকে বলা হয়েছে 'জিয়া' (জ্যোতিষ্ক), যা নির্দেশ করে সূর্যকে। এভাবে কুরআন মাজিদ এ কথার স্বীকৃতি দিয়েছে যে, সূর্য হল আলোর উৎস এবং চন্দ্র কেবল তার আলোকেই প্রতিফলিত করে। বিজ্ঞানীরা এই সত্যকে আবিষ্কার করেছে মহাকাশ বিজ্ঞানের জ্ঞান-ভাণ্ডারের উৎকর্ষ সাধনের পর। অথচ কুরআন মাজিদ এই বর্ণনা প্রদান করেছে বহু শতাব্দী পূর্বে।

মুজিজা নং– ৩০

তাপের একমাত্র উৎসরূপে সূর্য

কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন নক্ষত্রপুঞ্জ এবং তাতে স্থাপন করেছে সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র। (ফুরকান, ২৫ : ৬১)

তোমরা কি দেখতে পাও না কীভাবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আসমান, একটির ওপর আরেকটি এবং তাতে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোকরূপে এবং সূর্যকে প্রদীপরূপে। (নূহ, ৭১ : ১৫-১৬)

কুরআন মাজিদের প্রতিটি শব্দেরই রয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ। প্রয়োজন আমাদের সতর্ক মনোযোগ। সূর্য ও চন্দ্রের জন্য দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করার পাশাপাশি-যেমনটি ইতোপূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে- কুরআন মাজিদে একটি বিশেষ পারিভাষিক শব্দ 'মিসবাহ' ও ব্যবহৃত হয়েছে, যার ভাষান্তর করা হয়েছে Lamp বা প্রদীপ শব্দের মাধ্যমে। জেনে রাখা উচিত, কুরআন মাজিদ শব্দটি ব্যবহার করেছে কেবল সূর্যের জন্যে, চন্দ্রের জন্যে নয়। আমাদের জানা মতে, একটি Lamp বা প্রদীপ, যার থাকে কিছু জ্বালানি, যা জ্বলে এবং আলোর পাশাপাশি তাপ প্রদান করে। কুরআন মাজিদ এভাবে বর্ণনা করে যে, সূর্য কেবল আলোরই উৎস নয়, বরং তাপেরও একটি উৎস। আরবি ভাষার সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই লক্ষ্য করবেন, সুরা বাকারার (২য় সুরা) ১৭ নং আয়াতে আগুন থেকে নির্গত আলোর বর্ণনা দেয়ার জন্যে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হল 'আজাআত' (أضاءت) , তা ঠিক একই ধাতু বা ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত হয়েছে, সূর্যের আলোর বর্ণনা দেয়ার জন্যে যে 'জিয়া' (ضياء) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা যেখান থেকে উৎকলতি হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, সূর্য থেকে যে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় তা আলো ও তাপ উভয়ই ধারণ করে। পক্ষান্তরে চন্দ্র থেকে যে রশ্মি (নূর) আসে তা কেবল আলোই ধারন

করে। কুরআন মাজিদের এই বিস্ময়কর শব্দ নির্বাচন দেখে যে কাউকে পুনর্বার বিস্মিত হতে হবে।

মুজিজা নং– ৩১

সূর্যের গতি

সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। (ইয়াসিন, ৩৬ : ৩৮)

নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যের আবর্তন, যেমনটি উপরের আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে- বিষয়টি ব্যাখ্যার দাবি রাখে। আমাদের ছায়াপথ একটি থালার আকৃতিতে বহু সংখ্যক নক্ষত্রপুঞ্জ নিয়ে গঠিত। এই ছায়াপথে সেই থালার কেন্দ্র থেকে দূরে সূর্য একটি অবস্থান দখল করে আছে। ছায়াপথটি তার আপন অক্ষরেখার ওপর পরিক্রমণ করে, যা তার কেন্দ্র। ফলে তা সূর্যকে একই কেন্দ্রের চারপাশে একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তিত করে। ছায়াপথটি তার আপন অক্ষরেখায় তার আবর্তন শেষ করতে সময় নেয় ২৫০ মিলিয়ন বছর। সূর্য, এই আবর্তন সম্পন্ন করার প্রাক্কালে প্রতি সেকেন্ডে মোটামুটিভাবে ১৫০ মাইল বেগে পরিভ্রমণ করে। এটি সূর্যের নির্দিষ্ট গতিপথ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে- এতে কোনো সন্দেহ নেই যেমনটি কুরআন মাজিদের এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এটি সুনিশ্চিত যে, না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর, আর না যারা তার চারপাশে ছিলেন তাদের কাছে সূর্যের পরিভ্রমণের এই সুনির্দিষ্ট জ্ঞান ছিল। কিন্তু বাস্তবতা হল, এই তথ্যটি কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে মানুষ তা আবিষ্কার করারও বহু পূর্বে। যা এ কথার অন্য একটি সাক্ষ্য যে, সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলাই এই জ্ঞানের উৎস।

মুজিজা নং– ৩২

সূর্যের ভিন্ন ভিন্ন উদয়াচল ও অস্তাচল

তিনিই অধিপতি দুটি উদয়াচল ও দুটি অস্তাচলের। (রহমান, ৫৬ : ১৭)

নিশ্চয় তোমাদের মাবুদ এক। আসমানসমূহ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। (সাফফাত, ৩৭ : ০৫)

আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার। (মাআরিজ, ৭০ : ৪০)

কুরআন মাজিদের উদ্ধৃত প্রথম আয়াত সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলি বলেন, দু'টি উদয়াচল হল সারা বছর সূর্য উদয়ের দু'টি প্রান্ত সীমা। অনুরূপভাবে দু'টি অস্তাচল হল সূর্যাস্তের দু'টি চূড়ান্ত সীমা। কুরআন মাজিদের এই সুরায় উল্লিখিত দ্বৈত সংখ্যার সঙ্গে দ্বৈততার সাধারণ আবহ সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্য দুইটি আয়াত সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দেশ করে। বিষুবরেখা থেকে কোনো ব্যক্তি যতই দূরে বসবাস করবে তার কাছে সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচলগুলি ততই সুস্পষ্ট হবে। উল্লেখ্য যে, আরব উপদ্বীপ বিষুবরেখা থেকে ততদূরে অবস্থিত নয়, তাই এই বিভিন্নতার রহস্যটি সেখানে সহজে নির্ণয় করা যায় না। এ কথা বলাবাহুল্য যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদয়াচল ও অস্তাচলের এই বিভিন্নতা প্রত্যক্ষ করেন নি। তবে কুরআন মাজিদে এই সার্বজনীন বিস্ময়ের সত্যতা সুস্পষ্টভাবে উল্লখে রয়েছে।

মুজিজা নং– ৩৩

সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথে পরিভ্রমণ

তিনিই (আল্লাহ তাআলা) সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। প্রত্যেকেই (নভোমণ্ডলীয় বস্তুসমূহ) আপন আপন কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান। (আম্বিয়া, ২১ : ৩৩)

সূর্যের জন্যে অনুমতি নেই যে তা চন্দ্রকে অতিক্রম করে যাবে। আর না রাত আগে চলে দিনের। তারা প্রত্যেকেই (নিজ নিজ) কক্ষপথে সন্তরণ করে। (ইয়াসিন, ৩৬ : ৪০)

এসব আয়াতে যে আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা হল ফালাক (فلك)। কুরআনের অধিকাংশ অনুবাদক এই শব্দের অনুবাদ করেছেন 'কক্ষপথ' (ইংরেজিতে Orbit)। স্মর্তব্য যে, মহাশূন্যে অবস্থানরত বস্তুসমূহ সাম্প্রতিককালে আবিস্কৃত হয়েছে টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কল্যাণে। বলার অপেক্ষা রাখে না, ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবদের কোনো দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না। তথাপি একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারণা, সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথে পরিভ্রমণ, যা কি-না কুরআন মাজিদে বিদ্যমান রয়েছে। এটি কুরআন মাজিদের অন্য একটি মুজিজা যে, তা গ্রহ-নক্ষত্রের বৃত্তাকার কক্ষপথে পরিভ্রমণের বর্ণনা দিয়েছে, মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় তা আবিষ্কার করার বহু পূর্বে।

মুজিজা নং– ৩৪

সন্তরণের ভঙ্গিতে গ্রহ-নক্ষত্রের পরিভ্রমণ

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথীয় পরিভ্রমণের বর্ণনা দিতে যে আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা হল 'সাবাহা' (سبح)। আরবিতে তা এমন গতিকে নির্দেশ করে যা নিজে নিজে হয়ে থাকে। অধিকাংশ কুরআনের অনুবাদক তার অনুবাদ করেছেন সাঁতার কাটা (ইংরেজিতে Swiming)। সূর্য ও চন্দ্রের এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের গতির এই ধারণাটি সাম্প্রতিক মহাকাশ বিজ্ঞানের তথ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা অভাবনীয় যে, একজন আরবি ব্যক্তি শত শত বছর আগে, বিশ্বের সবচে পশ্চাৎপদ অংশে বসে বিশ্বস্রষ্টার কাছে থেকে কোনো আসমানি নির্দেশনা ছাড়া গ্রহ-নক্ষত্রের পরিভ্রমণের বর্ণনার ক্ষেত্রে 'سبح' -এর মত এমন একটি সুনির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহার করতে পারেন।

মুজিজা নং– ৩৫

সূর্য ও চন্দ্রের পাশাপাশি অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের পরিভ্রমণ

ইতোপূর্বে উল্লিখিত আয়াতসমূহে কুরআন মাজিদ বর্ণনা করেছে যে, সূর্য ও চন্দ্র পরিভ্রমণরত অবস্থায় রয়েছে। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, যদি এই পরিভ্রমণ চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হত তবে কুরআন মাজিদ তার বর্ণনা এই বলে দিত যে, 'উভয়েই ঘূর্ণায়মান'। পক্ষান্তরে, এক্ষেত্রে কুরআন মাজিদ যে আরবি শব্দ ব্যবহার করেছে তা হল 'কুল্লুন' (كل)। যার অর্থ, সকলেই ঘূর্ণায়মান।

পূর্বেকার তাফসিরবিদগণ এই 'কুল্লুন' শব্দের অর্থ পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন, মহাবিশ্বে সূর্য ও চন্দ্রের পাশে আরো কিছু গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে। এবং সেসব গ্রহ-উপগ্রহ পরিভ্রমণ অবস্থায় রয়েছে। কুরআন মাজিদ এই সত্যের স্বীকৃতি দিয়েছে বহু বছর পূর্বে। আরো লক্ষণীয় বিষয় হল, প্রত্যেক বস্তুই স্ব-স্ব কক্ষপথে সন্তরণ করে। এমনকি সাম্প্রতিক গবেষণায় এও জানা যায়, কেবল গ্রহ-নক্ষত্রগুলিই নয় বরং তাদের কক্ষপথগুলিও সন্তরণ করে। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত তিনি আর কে হতে পারেন যিনি এমন সুনির্দিষ্ট জ্ঞান কুরআন মাজিদে সরবরাহ করেছেন?

মুজিজা নং– ৩৬

অন্যান্য গ্রহের জন্য চন্দ্র ও সূর্য

তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। প্রত্যেকে (মহাকাশীয় বস্তুসমূহ) আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণশীল। (আম্বিয়া, ২১ : ৩৩)

তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা কর না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহকে সিজদা কর যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন। (ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৭)

তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ কিভাবে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন, একটির ওপর একটি এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন (উজ্জ্বল) প্রদীপরূপে। (নূহ, ৭১ : ১৫-১৬)

ইংরেজি ও বাংলা ব্যাকরণে দু'ধরনের সর্বনাম ও ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়– একবচন ও বহুবচন। পক্ষান্তরে আরবি ব্যাকরণে একটি তৃতীয় রূপের সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়, যা কেবল 'দুই' নির্দেশ করে। এই দ্বি-বচনের রূপটি বহুবচনের রূপ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। (বহুবচন) যা ব্যবহৃত হয় দুইয়ের অধিক সংখ্যা নির্দেশ করার জন্যে। যারা আরবি ভাষার সঙ্গে পরিচিত তারা স্বীকার করবেন যে, উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে সূর্য ও চন্দ্রের জন্য যে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়েছে তা দ্বিবচনের রূপ নয়, বরং বহুবচনের রূপ। কুরআন মাজিদ এভাবে ইঙ্গিত করে যে, মহাকাশে সূর্য ও চন্দ্রের সংখ্যা কেবল দু'টি নয়, বরং অনেক। মহাকাশ বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণা দেখিয়েছে যে, এমন অনেক গ্রহ রয়েছে যাদের আছে একাধিক চন্দ্র (উপগ্রহ)। এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, মহাকাশে আরো অনেক গ্রহজগত রয়েছে। এবং এ সকল জগতেও তাদের নিজস্ব সূর্য ও চন্দ্র রয়েছে। এটি কুরআন মাজিদের আরো একটি মুজিজা যে, তা সূর্য ও চন্দ্রের গতি বর্ণনার জন্যে সর্বনাম ও ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দ্বিবচনের শব্দ ব্যবহার করে নি। বরং বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছে। প্রকৃতির সাম্প্রতিক আবিষ্কার ও গবেষণা যার সাক্ষ্য বহন করে।

মুজিজা নং– ৩৭

পৃথিবীর বার্ষিক গতি

তুমি পর্বতমালাকে দেখে অবিচল মনে কর, অথচ এগুলি চলে মেঘমালার মত। এটা আল্লাহর কারিগরী। যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত। (নাহাল, ২৭ : ৮৮)

কুরআন মাজিদের এই আয়াতটি মেঘমালার মত পর্বতমালার গতির উল্লেখের মাধ্যমে বর্ণনা দেয় যে, পৃথিবী নিজেও ঘুরে। কথিত আছে, পৃথিবী তার বর্তমান রূপ ও অবস্থা লাভ করেছে আনুমানিক পাঁচ বিলিয়ন বছর পূর্বে। যখন মাহবিশ্বের বয়স ছিল ১০ বিলিয়ন বছর। এর ব্যাস ৮,০০০ মাইল এবং তা সূর্য থেকে ৯৩ মিলিয়ন বা ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। এখন এটা প্রমাণিত যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হয়। বিজ্ঞানীরা এই আবর্তনের গতিও হিসেব করেছেন। পৃথিবী চন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হয় ঘণ্টায় ৬,০০০ মাইল বেগে এবং সূর্যের চারদিকে একটি আবর্তন সমাপ্ত করতে সময় নেয় প্রায় ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা, ৪৬ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড। এবং বছরে বিভিন্ন ঋতুর পরিবর্তন ঘটায়। যখন কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হয়, তখন বিশ্বাস করা হত, সূর্যই ঘোরে, পৃথিবী স্থির। ষষ্ঠ শতাব্দীতে কোপানির্কাসই প্রথম বলেন, পৃথিবীও ঘোরে। অথচ কুরআন মাজিদে এই সত্য অবতীর্ণ হয়েছে বিজ্ঞানযুগের অনেক পূর্বে।

মুজিজা নং– ৩৮

পৃথিবীর আহ্নিক গতি

তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনুসরণ করে। (আরাফ, ০৭ : ৫১)

তিনিই (আল্লাহ) রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। নিশ্চয় যে কওম চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য এতে নিদর্শনাবলি রয়েছে। (রা'দ, ১৩ : ০৩)

আর রাত তাদের জন্য একটি নিদর্শন। আমি তা থেকে দিনকে সরিয়ে নেই, ফলে তখনই তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। (ইয়াসিন, ৩৬ : ৩৭)

তিনি রাতকে দিনের ওপর এবং দিনকে রাতের ওপর জড়িয়ে দিয়েছেন। (ফাতির, ৩৯ : ০৫)

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এখন জানেন, পৃথিবীর দু'ধরনের গতি রয়েছে। একটি হল সূর্যের চারদিকে তার বার্ষিক গতি, যা জলবায়ু ও ঋতুর পরিবর্তন ঘটায়। অন্যটি হল আপন অক্ষে তার আহ্নিক গতি, যা দিন-রাতের পবির্তন ঘটায়। কুরআন মাজিদ এই উভয় গতিকে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উল্লেখ করেছে। সুরা 'নাম্‌ল' এর ৮৮তম আয়াত, যা ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, পৃথিবীর বার্ষিক গতি নির্দেশ করে। উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ দিন-রাতের পরিবর্তনের বর্ণনা দেয়। এভাবে এই আয়াতগুলো পৃথিবীর তার অক্ষ বরাবর আহ্নিক গতির নির্দেশ করে। পৃথিবীর অক্ষ তার সমতল কক্ষপথের দিকে ২৩.৫ ডিগ্রি হেলানো। এই পরিবর্তনের ফলে যখন পৃথিবীর অর্ধেক অংশ সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে, অন্য অংশ থাকে অন্ধকারে। এটি ২৪ ঘন্টার আবর্তনে দিন-রাতের পরিবর্তন নিয়ে আসে। এমন বাস্তব ঘটনায়-যেমনটি কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে- তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা চিন্তা-ভাবনা করে। অতএব এই বাণীর আলোকে প্রত্যেকের চিন্তা-ভাবনা করে দেখা উচিত যে, কুরআন মাজিদ কি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সংকলিত, না সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

মুজিজা নং– ৩৯

নক্ষত্রসমূহের প্রকৃতি

আর আমি (আল্লাহ) নিকটবর্তী আসমানকে সুসজ্জিত করেছি 'মাসাবিহ' (প্রদীপমালা) দিয়ে। (ফুসসিলাত, ৪১ : ১২, মূলক, ৬৭ : ০৫)

কুরআন মাজিদ মানুষকে আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহে চিন্তা-ভাবনা করার দাওয়াত দেয়। উল্লিখিত আয়াতসমূহ নক্ষত্ররাজিকে একটি বিশেষ পারিভাষিক শব্দ 'মাসাবিহ'-এর মাধ্যমে নির্দেশ করছে। যার অর্থ 'প্রদীপসমূহ'। এ ক্ষেত্রে চিন্তা করে দেখা উচিত, এটা কি নক্ষত্ররাজির

কেবল এক বাহ্যিক বর্ণনা নাকি কুরআন মাজিদ আমাদেরকে নক্ষত্রসমূহের আনবিক ও রাসায়নিক প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে? মহাকাশ বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উন্নয়ন, বিশেষত বিগত দুই দশকের অগ্রগতি দেখিয়েছে যে, নক্ষত্রগুলিতে এক ধরনের জ্বালানি জ্বলে আলো ও তাপ বিকিরণ করে, যেমনটি হয়ে থাকে একটি প্রদীপে।

এটা এখন জ্ঞাত বিষয় যে, নক্ষত্রগুলো অসংখ্য অণুর সমন্বয়ে গঠিত। এই অণুর নিউক্লিয়াসের চারপাশে ইলেক্ট্রনগুলো আবর্তিত হয়। ফলে নক্ষত্রগুলির রয়েছে একটি নির্দিষ্ট Volume। আরও আছে বিচ্ছুরিত আলো ও শক্তি। একটি নক্ষত্রের মৃত্যু মানে তার সেই আলোর শক্তি নিঃশেষিত হওয়া, যা তার Volume নিয়ন্ত্রণ করে। মহাকাশে দুই ধরনের মহাকাশীয় অবস্থান রয়েছে। যাদের নাম ‘শুভ্র গহ্বর’ বা কাউসার এবং কৃষ্ণ গহ্বর। প্রথমটি অভাবনীয় পরিমাণ শক্তির উৎস। পরবর্তী অবস্থানটি হল সেই শূন্যস্থান যা নক্ষত্রের মৃত্যুর ফলে সৃষ্টি হয়। যখন কোনো নক্ষত্রের মৃত্যু হয় তখন তা তার মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে সংকুচিত হয়ে যায়। মৃত নক্ষত্রটি আয়তনে যত বড় হয়, তার মধ্যাকর্ষীয় সংকোচন ততই নিবিড় হয়, এমনকী তা তার নিউক্লিয় স্তরে গিয়েই ক্ষান্ত হয় না; বরং আরো সংকুচিত হয়ে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাকে বলা হয় Singularity। এটি একটি কৃষ্ণ গহ্বর তৈরি করে যা কোনোভাবেই দেখা যায় না। নক্ষত্রের আলো বিচ্ছুরণ এবং পতনের সমগ্র প্রক্রিয়া নির্ভর করে তার শক্তির মাত্রা বা Energy level-এর ওপর। এটিকে সেই কারণ বলে ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে, যার ফলে কুরআন মাজিদ এগুলিকে ‘প্রদীপসমূহ’ বলে আখ্যায়িত করেছে।

মুজিজা নং- ৪০

বিপরীত বস্তুর উপস্থিতি

> **পবিত্র ও মহান সে সত্তা যিনি সবকিছু জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবী যা উৎপন্ন করে তা থেকে, তাদের (মানুষের) নিজেদের মধ্য থেকে এবং সেসব কিছু থেকেও যা তারা জানে না।** (ইয়াসিন, ৩৬ : ৩৬)

বলার অপেক্ষা রাখে না, পৃথিবী বিভিন্ন খনিজ পদার্থ উৎপাদন করে। বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণা প্রমাণ করেছে, প্রত্যেক খনিজ পদার্থই হয়ত ধনাত্মক কিংবা ঋনাত্মক আধান (charge) বিশিষ্ট অতি পারমাণবিক কণিকা দ্বারা গঠিত। কুরআন মাজিদে এই সত্যটি অবতীর্ণ হয়েছে এই বলে, পৃথিবী থেকে উৎপাদিত সকল বস্তুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে। খনিজ পদার্থের পাশাপাশি এমনকি পানিও যা পৃথিবী উৎপাদন করে, তাও বিপরীতধর্মী যৌগমূল দ্বারা গঠিত। পানি গঠিত হয় দুটি বিপরীতধর্মী উপাদনা দ্বারা। একটি ধনাত্মক উপাদানবিশিষ্ট হাইড্রোজেন অনু এবং অপরটি ঋনাত্মক উপাদানবিশিষ্ট অক্সিজেন অনু।

অধিকন্তু পৃথিবী থেকে উৎপন্ন জোড়া জোড়া বস্তুসমূহ আরও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে সেসব সমজাতীয় জোড়া, যা তাদের দৈহিক ও রাসায়নিক ধর্মের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- ধাতু ও অধাতু। অনুরূপ বিপরীতধর্মী উপাদানবিশিষ্ট জোড়া যেমন, ধনাত্মক ও ঋনাত্মক উপাদানবিশিষ্ট আয়ন থেকে ধনাত্মক ও ঋনাত্মক বৈদ্যুতিক উপাদানসমূহ চৌম্বকীয় বিপরীতধর্মী জোড়া, যেমন- চুম্বকের উত্তরপ্রান্ত ও দক্ষিণপ্রান্ত, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি, তেমনিভাবে কেন্দ্রনির্গত শক্তির মাধ্যমে মধ্যাকর্ষণ ভারসাম্য ইত্যাদি।

মানবিক জোড়ার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে- পুরুষ ও মহিলার লিঙ্গভেদ, পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব প্রকাশক গুণ, যেমন- নিষ্ঠুরতা ও পরদুঃখ কাতরতা, সাহস ও ভয়, উদারতা ও কৃপণতা ইত্যাদি। অতঃপর যে কেউ সহজে উপসংহারে আসতে পারে যে, জোড়ার রহস্য পুরুষ ও মহিলা কিংবা বিপরীত বৈদ্যুতিক উপাদান ও বিপরীতধর্মী গুণ মানব জাতিসহ সব ধরনের প্রাকৃতিক বিষয় ও শক্তিসমূহের মধ্যে বিদ্যমান। এ কথা উপরোক্ত কুরআনি আয়াতে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখন আমরা নিজেদেরকে আরো একবার প্রশ্ন করি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মত একজন মানুষ যিনি না লিখতে পারতেন, না পড়তে। এমনকি যিনি নিজের নামটি পর্যন্ত স্বাক্ষর করতে পারতেন না, তিনি কি কুরআন মাজিদের গ্রন্থকার হতে পারেন? না তা এমন একটি গ্রন্থ যা সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে?

মুজিজা নং– ৪১

অতি পারমানবিক কণিকার উপস্থিতি

আর কাফিররা বলে, 'কিয়ামত আমাদের কাছে আসবে না'। বলুন, 'অবশ্যই আমার রবের কসম! যিনি অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত, তা তোমাদের কাছে আসবেই। আসমানসমূহে ও জমীনে অনু পরিমাণ কিংবা তার চেয়ে ছোট অথবা বড় কিছুই তার অগোচরে নেই। বরং সব কিছু সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে। (সাবা, ৩৪ : ০৩)

এই আয়াতে যে আরবি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হল, 'যাররাহ' (ذرة)। আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী ও মারমাডিউক পিকথাল ইংরেজিতে 'যাররাহ' শব্দের অনুবাদ করেছেন Atom (পরমাণু) শব্দ দ্বারা। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন 'যাররাহ' (পরমাণু) ছিল মানুষের জানা মতে সবচেয়ে ক্ষুদ্র কণিকা। এই আয়াতে কুরআন মাজিদ 'যাররাহ'র চেয়েও ক্ষুদ্রতর কণিকার উপস্থিতির কথা বর্ণনা করে।

পদার্থ বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণা দেখিয়েছে, পরমাণুকে আরও ক্ষুদ্রতর এককে বিভাজিত করা যেতে পারে। কুরআন মাজিদ এই বিষয়টির স্বীকৃতি দিয়েছে পদার্থ বিজ্ঞানীরা তা আবিষ্কার করার চৌদ্দশ' বছরেরও অধিককাল পূর্বে।

মুজিজা নং– ৪২

সমুদ্রের পানির মাঝখানে অন্তরায়

আল কুরআনের ১৬০ মুজিজা ও রহস্য

কে পৃথিবীকে করেছে আবাসযোগ্য এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদী-নালা। আর তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমাল এবং দুই সাগরের মাঝখানে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়। আল্লাহর সঙ্গে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। (নামাল, ২৭ : ৬১)

তিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেন, যারা পরস্পর মিলিত হয়। উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক আড়াল, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। অতএব (হে মানব ও দানব) তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? (রহমান, ৫৫ : ১৯-২১)

এই আয়াতগুলি পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছে ছিল এক রহস্য। সামুদ্রিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক গবেষণা ও আবিষ্কারের ভিত্তিতে আমরা এখন এই আয়াতগুলির ব্যাখ্যা দিতে পারি। উষ্ণ পানির স্রোতধারা বিশ্বের শীতল সাগরগুলোর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সাগরসমূহে এ ধরনের স্রোতের প্রবাহ সাধারণ। এ ধরনের স্রোত কেবল আরব উপদ্বীপের চারপাশেই সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, তা নয়; বরং ভারতীয় ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলসমূহেও। এ ধরনের স্রোতধারা সর্বপ্রথম আবিস্কৃত হয় ১৯৪২ সালে। বর্তমানে সেগুলিকে অত্যন্ত সুভেদী কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে চিহ্নিত করা গেছে। এটিও কুরআন মাজিদের অনন্য মুজিজা যে, তা এমন একটি রহস্যের বর্ণনা দিয়েছে, যা তৎকালে তথাকার কোনো আরব প্রত্যক্ষ করে নি, যেখানে বা যে সময়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেন।

কুরআন মাজিদের উপরে বর্ণিত আয়াতদ্বয় বলে, 'আল্লাহ তাআলা দু'টি সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন এবং সেখানে দুই সাগরের মাঝখানে রয়েছে একটি আড়াল।' বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন, পানির এই দুই স্রোতধারা তাদের লবণাক্ততা, ঘনত্ব ও উচ্চতার বিচারে ভিন্ন ভিন্ন। তারা এও আবিষ্কার করেছেন, যখন পানির বহিস্থ স্রোতধারা অন্তঃস্ত স্রোতধারার দিকে প্রবাহিত হয় কিংবা তার বিপরীত অবস্থা ঘটে, তখন তা তৎক্ষণাৎ অন্য স্রোতের পানি অনুসারে তার অবস্থা বদলে ফেলে। এভাবে সেখানে দুই ধরনের পানি স্বাধীনভাবে মিশে যায়, তথাপি উভয় প্রকৃতির পানি

তাদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলে। কুরআন মাজিদ এমন একটি জটিল রহস্য শনাক্ত করেছে, বিজ্ঞানীরা তা আবিষ্কার করার বহু শতাব্দী পূর্বে।

মুজিজা নং– ৪৩

বিচার দিবসে মহাশূন্যের সবকিছুর পরিসমাপ্তি

> **আর (যখন) শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। আসমানসমূহে (মহাশূন্যে) যারা আছে এবং পৃথিবীতে যারা আছে সকলে বেহুঁশ হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ইচ্ছে করেন। অতঃপর আবার যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখন তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।** (যুমার, ৩৯ : ৬৮)

যখন কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হয়েছিল তখন কেউ জানত না, মানুষ একদিন আকাশে উড়বে, এমনকি মহাকাশে স্টেশন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করবে। একজন নাস্তিক এ কথা বলে কুরআন মাজিদকে নিয়ে বিদ্রুপ করেছিল যে, যখন বিচার দিবস কায়েম হবে, পৃথিবীতে যারা আছে তারা মৃত্যু বরণ করবে; কিন্তু যারা মহাশূন্যে আছে তারা এই প্রলয় থেকে নিরাপদ থাকবে। কুরআন মাজিদ এই আয়াতে দু'টি বিষয়ের ভবিষ্যতবাণী করেছে। প্রথমত, এমন একদিন আসবে যেদিন মানুষ আকাশে উড়বে এবং মহাশূন্যে বসবাস করবে। দ্বিতীয়ত, যখন বিচার দিবস কায়েম হবে, যারা মহাশূন্যে থাকবে তারা মৃত্যু বরণ করবে, যারা পৃথিবী-পৃষ্ঠে থাকবে তাদের মতোই। আবারও আমরা কুরআন মাজিদের প্রতিটি শব্দে বিস্ময়কর জ্ঞানগভীরতা প্রত্যক্ষ করি।

অতিক্রান্ত পৃষ্ঠাগুলি প্রাকৃতিক রহস্যের বহু প্রত্যক্ষণ প্রদান করে। এই প্রত্যক্ষণগুলি মানব-জাতির পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছে রহস্য বলে বিবেচিত হত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চৌদ্দশ বছরের অগ্রগতি ও উন্নতি এই প্রত্যক্ষণগুলিকে এখন প্রকৃতির রহস্য নয়, বরং বাস্তব সত্য হিসেবে প্রমাণিত করেছে। স্মর্তব্য, এই প্রত্যক্ষণগুলি মানবজাতির কাছে প্রদত্ত হয়েছে একজন নিরক্ষর মানুষ তথা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

এর মাধ্যমে, যিনি লিখতে পড়তে জানতেন না। নাস্কিরা বলে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন মাজিদে এ সকল প্রত্যক্ষণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর তীব্র কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে। পক্ষান্তরে ইহুদি ও খৃস্টানরা অভিযোগ করে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব বিষয় বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old testament) ও নতুন নিয়ম (New testament) থেকে নকল করেছেন।

তবে বাস্তবতা হল এই প্রত্যক্ষণগুলি, এমনকি সেই সময়ের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট নয়, যখন কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হয়েছিল। অধিকন্তু এই প্রত্যক্ষণগুলো না পুরাতন নিয়মে বিদ্যমান, আর না নতুন নিয়মে। অতএব কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই জ্ঞানের উৎস কী? তিনি কি এ সকল প্রত্যক্ষণ তাঁর তীব্র চিন্তা ও কল্পনা-শক্তি ব্যবহার করে রচনা করেছিলেন, নাকি তা সর্বজ্ঞাতা ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল? তার যথার্থ উত্তর হল, আল্লাহ তাআলা এসব সত্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন।

'নিশ্চয় তোমাদের কাছে চাক্ষুষ নিদর্শনাবলি এসেছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। অতএব যে দেখবে (সত্য) তবে তা হবে তার নিজের (কল্যাণের) জন্যেই। আর যে অন্ধ সাজবে তবে তা (তার অনিষ্টতা) তার ওপরই (বর্তাবে)। আর বলুন, (হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি (এখানে) তোমাদের ওপর সংরক্ষক নই। (চাই তোমরা এই সত্যকে গ্রহণ কর কিংবা প্রত্যাখ্যান কর)।' (আনআম, ০৬ : ১০৪)

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাণী ও উদ্ভিদজগতে আবিষ্কার সংক্রান্ত মুজিজাসমূহ

কুরআন মাজিদ প্রাণী জগৎ ও উদ্ভিদ রাজ্যের এমন অসংখ্য বাস্তব তথ্য প্রদান করে, কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হবার প্রাক্কালে যে সম্পর্কে মানবজাতি ছিল অনবহিত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাম্প্রতিক উন্নতি ও গবেষণা এসব তথ্যের সত্যতা সুনিশ্চিত করেছে। কুরআন মাজিদ বলে,

> **'(হে মুহাম্মদ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি (কুরআন নাজিল হওয়ার) পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করতে সক্ষম ছিলেন না। আর না আপনি স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোনো কিতাব লিখতে সক্ষম ছিলেন। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই (কুরআন মাজিদ) সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত।'** (আনকাবুত, ২৯ : ৪৮)

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কুরআন মাজিদের এই ভাষ্যের ব্যাপারে কেউ কখনো সন্দেহ পোষণ করে নি। বিস্ময়করভাবে মুসলিম-অমুসলিম সকল ঐতিহাসিক স্বীকার করেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না পড়তে জানতেন, আর না লিখতে। এমতাবস্থায় আমাদের উচিত, প্রকৃতির রহস্য ও বিস্ময় সম্পর্কে তাঁর সুবিপুল ও যথার্থ জ্ঞানের উৎস খুঁজে বের করা। তিনি কি এসব জ্ঞান ব্যক্তিগত মেধা ও চিন্তা শক্তির মাধ্যমে অর্জন করেছেন? এমনটি হলে নিদেনপক্ষে কুরআন মাজিদের কিছু তথ্য হলেও প্রকৃতি সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার কথা, কিন্তু বাস্তবে তা

হয় নি। প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অতি-সাম্প্রতিক আবিষ্কারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কুরআন মাজিদে বর্ণিত তথ্যসমূহের সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে।

এমনকি প্রাণী জগত ও উদ্ভিদ রাজ্যের ক্ষুদ্রতম সদস্য যেমন ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের আলোচনা কুরআন মাজিদে রয়েছে। যখন কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হচ্ছিল তখন মানুষ এত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণের অস্তিত্ব কল্পনাও করতে পারত না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাম্প্রতিক অগ্রগতির ফলে মানুষ কেবল তা-ই বুঝতে পারে নি, বরং কুরআন মাজিদে বর্ণিত বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী সম্পর্কেও ধারণা লাভ করেছে। অতএব এসবের প্রেক্ষিতে এই উপসংহারে আসাই অধিক যুক্তিযুক্ত যে, কুরআন মাজিদ সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আসমানি গ্রন্থ। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে এমন শাশ্বত সত্য এ জন্যে রেখেছেন যাতে বিবেচক লোকেরা সেসব সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে এবং কুরআন মাজিদকে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আসমানি বার্তা হিসেবে গ্রহণ করে।

নিম্নে প্রাণী জগত ও উদ্ভিদরাজ্যে আবিষ্কার সংক্রান্ত কুরআন মাজিদের কিছু প্রকাশ্য মুজিজা তুলে ধরা হল :

মুজিজা নং– ৪৪

পানিতে জীবনের আদি উৎস

> **অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে আমি সকল প্রাণবান জিনিসকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?** (আম্বিয়া, ২১ : ৩০)
>
> **আর আল্লাহ প্রত্যেক জীবকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের কোনোটি পেটে ভর দিয়ে চলে, কোনোটি চলে দু'পায়ের ওপর, আবার কোনোটি চার পায়ের ওপর চলে। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর শক্তিমান। অবশ্যই**

আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে সরল পথ দেখান। (আন নূর, ২৪ : ৪৫-৪৬)

আর তিনিই (আল্লাহ) পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তাকে বংশগতি ও বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আর তোমার রব (প্রত্যেক বস্তুর ওপর) প্রভূত ক্ষমতাবান। (ফুরকান, ২৫ : ৫৪)

পানি থেকে জীবনের উদ্ভব হওয়ার তথ্যটি বর্তমানে এমন একটি মৌলিক সত্য বিষয় যা, আমরা নসিংকোচে মেনে স্বীকার করি। বিষয়টির অতি উজ্বল্য দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ আয়াতগুলি সম্পর্কে আমাদের অনুভূতিকে হয়ত প্রাণিত করবে না, বরং তা স্বাভাবিক বলে মনে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মভূমি আরব উপদ্বীপ নিরেট মরুভূমি। এমনকি সেখানে নেই কোনো নদী বা হ্রদ। এসব আয়াত এমন একটি রহস্যের বর্ণনা দেয় যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময় থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত আরব উপদ্বীপে অবর্তমান। তবু তা আমাদের সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

মুজিজা নং– ৪৫

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবনের অস্তিত্ব

আর চতুষ্পদ জন্তুগুলো তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাতে রয়েছে উষ্ণতার উপকরণ ও বিবিধ উপকার। আর তা থেকে তোমরা (গোস্ত) আহার কর। আর (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা, তোমাদের আরোহন ও শোভার জন্য এবং তিনি সৃষ্টি করেন (অন্য) এমন কিছু, যা তোমরা জান না। (নাহল, ১৬ : ৫-৮)

পবিত্র ও মহান সে সত্তা যিনি সকল জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন, জমিন যা উৎপন্ন করেছে তা থেকে, মানুষের নিজেদের মধ্য থেকে এবং সেসব থেকে যা তারা জানে না। (ইয়াসিন, ৩৬ : ৩৬)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় এমন আকারের জীবনের অস্তিত্ব নির্দেশ করে কুরআন অবতরণের প্রাক্কালে যা ছিল মানুষের অজানা। মাইক্রোসকোপ বা অনুবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কারের পর মানবচক্ষু নতুন আবিস্কৃত জীবনের স্বরূপের রহস্য যেমন, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছে। অথচ কুরআন মাজিদ তাদের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেছে মানুষ তাদের আবিষ্কার করার বহু পূর্বে।

মুজিজা নং– ৪৬

প্রাণীদের মধ্যে জাতি-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব

আর জমিনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণী এবং দু'ডানা দিয়ে ওঠে এমন প্রতিটি পাখি তোমাদের মত এক একটি উম্মত (জাতি)। আমি কোনো কিছু লিখতে ছাড়িনি। অতঃপর তাদেরকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে। (আনআম, ০৬ : ৩৮)

আমাদের মনে রাখা উচিত, আরব উপদ্বীপ, যা কি-না একটি মরুভূমি, তাতে নেই কোনো সমৃদ্ধ প্রাণী কিংবা পাখির আবাস। বলাবাহুল্য, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন প্রাণী ও পাখির জীবন পদ্ধতি পর্যবেক্ষণের খুব সামান্য সুযোগ পেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও কুরআন মাজিদ এমন একটি রহস্যের বর্ণনা দেয় যা সম্প্রতি প্রাণী ও পাখি বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হল প্রতিটি প্রাণী ও পাখি স্বতন্ত্র সমাজ ও গোত্রে বসবাস করে। আবার বলছি, আমাদের উচিত এ ধরনের জ্ঞানের উৎস খুঁজে বের করা, যা কুরআন মাজিদে অবতীর্ণ হয়েছে আজ থেকে চৌদ্দশ বছরের অধিককাল পূর্বে। এটা অচিন্তনীয় যে, কোনো মানুষ এমন বিষয়ে ধারণা করতে পারে যা সে জীবনে পর্যবেক্ষণ করে নি। এবং তার সেই ধারণা হবে সম্পূর্ণরূপে সঠিক। এভাবে এ থেকে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ তাআলাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই জ্ঞানের উৎস।

মুজিজা নং– ৪৭

অজানা জগতে বিপরীত জোড়ার অস্তিত্ব

পবিত্র ও মহান সে সত্তা যিনি সব কিছু জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন, জমিন যা উৎপন্ন করেছে তা থেকে, মানুষের নিজেদের মধ্য থেকে এবং সেসব থেকে যা তারা জানে না। (ইয়াসিন, ৩৬ : ৩৬)

কুরআন মাজিদ এই আয়াতে সব ধরনের জীবনের বিপরীত জোড়ার অস্তিত্ব ঘোষণা করে। এটি সেসব প্রজাতিসমূহকেও অন্তর্ভুক্ত করে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে যা ছিল মানুষের অজানা। বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণা ব্যাকটেরিয়া নামে পরিচিত একটি সামগ্রিক ক্ষুদ্র জীব-জগতের আবিষ্কার করেছে। এটি বিস্ময়কর ও লক্ষণীয় বিষয় যে, পুরো ব্যাকটেরিয়া জগত 'গ্রাম পজিটিভ' ও 'গ্রাম নেগেটিভ' (Gram positive and gram negative) নামে পরিচিত দু'টি বিপরীতধর্মী জোড়ায় বিভক্ত। অনুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope) আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা তা উদ্ঘাটন করার শত শত বছর আগে কুরআন মাজিদ এই তথ্য প্রদান করেছে।

বৃটিশ বিজ্ঞানী পল ডির্যাক (Paul Dirac) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি দেখান প্রত্যেক বস্তুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি ১৯৩৩ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কুরআন মাজিদ এই আবিষ্কারের ওপর নোবেল পুরস্কার প্রদানের শত শত বছর পূর্বেই তার বর্ণনা দিয়েছে।

মুজিজা নং– ৪৮

যৌন ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রজনন

আর তিনিই (আল্লাহ) যুগল সৃষ্টি করেন- পুরুষ ও নারী। একটি (শুক্র) বিন্দু থেকে যখন তা নিক্ষিপ্ত হয়। (নাজম, ৫৩ : ৪৫-৪৬)

সকল প্রাণীর মধ্যে যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে প্রজননের বিষয়টি এখন একটি প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার আগে প্রাণীদের যৌনক্রিয়ার (Fertilization) প্রক্রিয়া সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণাই ছিল না। আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর এই তথ্য অবতীর্ণ করেন মানুষ তা আবিষ্কার করার বহু আগে।

মুজিজা নং– ৪৯

দুধের উৎস

আর নিশ্চয় চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। আমি তোমাদেরকে পান করাই তার পেটের ভেতরের গোবর ও রক্তের মধ্যখান থেকে দুধ, যা খাঁটি ও স্বাচ্ছন্দকর পানকারীর জন্যে। (নাহল, ১৬ : ৬৬)

কুরআন এখানে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সেই জীববৃত্তীয় প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেয় যা অন্ত্রপ্রাচীরের স্তরে গোবর ও রক্তের নির্যাসকে একত্রে নিয়ে আসে এবং দুধ তৈরি করে। এটি স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম (হজম-প্রক্রিয়া) সম্পর্কিত শরীর বিজ্ঞানের আবিস্কৃত তথ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। যখন কুরআন অবতীর্ণ হয় তখন মানুষ এ ধরনের সূক্ষ্ম ও যথার্থ জ্ঞান সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত।

মুজিজা নং– ৫০

মধুর উৎস

আর তোমার রব মৌমাছিকে ইঙ্গিতে জানিয়েছেন, 'তুমি পাহাড়ে ও গাছে এবং তারা যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে নিবাস বানাও। অতঃপর তুমি প্রত্যেক ফল থেকে আহার কর এবং তুমি তোমার রবের সহজ পথে চল।' তার পেট থেকে এমন পানীয় বের হয় যার রং ভিন্ন, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য নিরাময়। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে সেই কওমের জন্য যারা চিন্তা করে। (নাহল, ১৬ : ৬৮-৬৯)

লক্ষণীয় যে, আরবি ভাষায় দুই প্রকার ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়। এক প্রকার পুংলিঙ্গের জন্য, অন্য প্রকার স্ত্রীলিঙ্গের জন্য। এই আয়াতে কুরআন মাজিদ স্ত্রীবাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছে। এভাবে কুরআন মাজিদ এ কথা পরিষ্কারভাবে বিবৃত করে যে, খাদ্য সংগ্রহ ও মধু তৈরির সঙ্গে স্ত্রী মৌমাছিই জড়িত।

আরো উল্লেখ্য যে, পুরুষ মৌমাছি ও স্ত্রী মৌমাছির মধ্যে পার্থক্য এত সূক্ষ্ম, কেবল একজন অভিজ্ঞ লোকই তা পার্থক্য করতে পারে। বলাবাহুল্য, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন দক্ষ পতঙ্গ বিজ্ঞানী ছিলেন না। তিনি পুরুষ মৌমাছি ও স্ত্রী মৌমাছির পার্থক্য নির্ণয়েও সক্ষম ছিলেন না। বহু শতাব্দী পর্যন্ত মৌমাছি সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল, স্ত্রী মৌমাছিরা ঘোরাফেরা করে তাদের বাসায় গিয়ে একটি 'রাজা মৌমাছির' কাছে কৈফিয়ত প্রদান করে। সাম্প্রতিক পতঙ্গ বিজ্ঞানের গবেষণায় দেখা গেছে, স্ত্রী মৌমাছিরা চারপাশে ঘোরাফেরা করে এসে বাসায় গিয়ে একটি 'রানী মৌমাছি'র কাছে কৈফিয়ত প্রদান করে। যা হোক, কুরআন মাজিদে এই তথ্য বর্ণিত হয়েছে চৌদ্দশ বছরেরও অধিককাল আগে।

মুজিজা নং– ৫১

শূকরের মাংসের বিপত্তি

তিনি (আল্লাহ) তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমান ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয় তার জন্যে কোনো পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (বাকারা, ০২ : ১৭৩)

কুরআন মাজিদ কেন শূকরের মাংস ব্যবহার নিষেধ করে তা বহু শতাব্দী পর্যন্ত একটি রহস্য হয়ে রয়েছে। সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গেছে, শূকরের মাংস মানুষের শরীরের জন্য অত্যধিক ক্ষতিকর। কিছুদিন পূর্বেও মনে করা হত শূকরের মাংসে Trichina Parasite (একপ্রকার পরজীবি জীবাণু)-ই মানুষের শরীরের জন্য একমাত্র বিপত্তি। বৈজ্ঞানিকরা বর্তমানে শূকরের মাংসের আরও অনেক ক্ষতিকর দিক আবিষ্কার করেছেন। সেসব গবেষণার কিছু নিম্নে তুলে ধরা হল :

১) শূকরের মাংসে `Sutoxin' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রোটিন রয়েছে, যা বিভিন্ন ধরনের এলার্জি সৃষ্টি করে। যেমন, হাঁপানি, খোস পাঁচড়া ও একজিমা ইত্যাদি।

২) শূকরের মাংসে প্রচুর পরিমাণে Muco polysaccharides (একপ্রকার শ্লেস্মা জাতীয় পদার্থ) রয়েছে। এগুলি সালফারে সমৃদ্ধ এবং গিঁটসমূহে ও শরীরের জোড়াগুলিতে ব্যথা-বেদনার সৃষ্টি করে।

৩) শূকরের মাংস রক্তের প্রবাহে চর্বিজাতীয় পদার্থের অনুপাত বাড়িয়ে দেয়। প্রাণী মাংসে দু'ধরনের চর্বি থাকে। একটি হল বাহ্যিক যা মাংসকে ঢেকে রাখে। অপরটি হল অভ্যন্তরীণ, যা থাকে মাংসপেশীর তন্তুসমূহে। নিম্নে সাধারণ মাংসের আভ্যন্তরীণ পেশীতে চর্বির পরিমাণ দেখানো হল :

বাছুরের মাংস– ১০%, ভেড়া– ২০% মেষশাবক– ২৩% শূকরের মাংস– ৩৫%।

রক্তে চর্বির উচ্চমাত্রা কতিপয় স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন, বার্ধক্য, জ্বরাগ্রস্ততা, প্যারালাইসিস ও হৃদযন্ত্র সম্বন্ধীয়

বিভিন্ন রোগ। শূকরের মাংসের উচ্চমাত্রার চর্বি মানব স্বাস্থের জন্য সর্বাধিক বিপজ্জনক।

৪) শূকরের মাংসের উচ্চমাত্রার চর্বির আরেকটি ক্ষতিকর দিক হল, তা ভিটামিন 'ই'র অতিরিক্ত ক্ষয়সাধন করে। ভিটামিন 'ই'র এই ক্ষয়সাধন বা ঘাটতি পরিণামে ভিটামিন 'এ'র ক্ষয় সাধন করে। এভাবে শূকরের মাংস শরীরের ভিটামিন 'ই' ও 'এ'র ক্ষয় সাধনের মাধ্যমে শরীরবৃত্তীয় কাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

৫) এও দেখা গেছে যে, শূকর নোংরা ও ঘৃণিত বস্তু ভোগ ও আহার করে থাকে। এজন্যে তার Lympatic system (লসিকা প্রণালী) সর্বদা সক্রিয় অবস্থায় থাকে। এটি albumens সহ বিভিন্ন ধরনের সংরক্ষণমূলক বস্তুতে পূর্ণ থাকে। শূকরের শরীরের এক অংশে albumens-এর উপস্থিতি শরীরের অন্য অংশে Immune response সৃষ্টি করে। শূকরের মাংস ভক্ষণের ফলে এভাবে বিভিন্ন প্রকার এলার্জিজনিত প্রতিক্রিয়া ও মানব দেহে লসিকা প্রণালীতে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

৬) শূকরের মাংসের কারণে অন্য একটি প্রাণঘাতি ব্যধি জন্ম নেয়, যা সঞ্চারিত হয় 'Trichina' নামক জীবাণুর মাধ্যমে। যদিও পশ্চিমাদের সাম্প্রতিক উৎকর্ষের ফলে এই জীবাণু দূর করা যেতে পারে তথাপি ধারণা করা হয় পৃথিবীতে প্রায় ৩০ মিলিয়ন এই 'Trichina victims' রয়েছে।

৭) অনেক মুসলিম কর্মী চিহ্নিত করেছে, শূকরই একমাত্র প্রাণী যে তার স্ত্রী সঙ্গীর সম্ভ্রমহানীর ব্যাপারে সজাগ নয় এবং তার জন্যে লড়াই করে না। এ এক অদ্ভুত সাজুয্য যে যেসব জাতি শূকরের মাংস ভক্ষণ করে তারাও একই ধরনের যৌনসংক্রান্ত মানসিকতা প্রদর্শন করে। এ থেকে বুঝা যায়, মানুষের ওপর শূকরের মাংসের একটি বিশেষ নৈতিক নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে।

বলাবাহুল্য, যখন কুরআন শূকরের মাংসকে হারাম ঘোষণা করে তখন এসব তথ্য মানুষের জানা ছিল না।

মুজিজা নং– ৫২

সকল বৃক্ষে বিপরীত লিঙ্গের অস্তিত্ব

আর তিনিই (আল্লাহ) যিনি ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন ও তাতে পাহাড়-পর্বত ও প্রবাহমান নদ-নদী স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকার ফলের মধ্যে দু'দু প্রকার সৃষ্টি করে রেখেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা চিন্তা করে। (রা'দ, ১৩ : ০৩)

তিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যা করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার যুগল উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। (প্রত্যেকটি অপরটি থেকে স্বতন্ত্র।) (ত্বাহা, ২০ : ৫৩)

হে মানব সকল, যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও তবে (ভেবে দেখ-) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্যে। আর আমি একটি নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই। এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে পতিত ও

নিষ্প্রাণ দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন তা (প্রাণের প্রতি) আলোড়িত ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুন্দর (উদ্ভিদরাজি) জোড়ায় জোড়ায় উৎপন্ন হয়। (হজ, ২২ : ০৫)

তিনি কোনো খুঁটি ব্যতীত আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন যা তোমরা দেখ। তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্ব প্রকার জন্তু। আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছি। অতঃপর তাতে উদ্গত করেছি সর্ব প্রকার কল্যাণকর প্রজাতির (উদ্ভিদের) জোড়াসমূহ। (লুকমান, ৩১ : ১০)

পবিত্র ও মহান সে সত্তা যিনি সকল জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন, জমিন যা উৎপন্ন করেছে তা থেকে, মানুষের নিজেদের মধ্য থেকে এবং সেসব থেকে যা তারা জানে না। (ইয়াসিন, ৩৬ : ৩৬)

এসব আয়াত যা অবতীর্ণ হয়েছে চৌদ্দশ বছরেরও অধিককাল পূর্বে, উদ্ভিদরাজিতে লিঙ্গের উপস্থিতি পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা তা আবিষ্কার করেছেন ১০০ বছর পূর্বে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো দক্ষ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ছিলেন না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর এ তথ্য অবতীর্ণ করেছিলেন। অতএব সেসব লোক যারা বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার গুণে বিভূষিত তারা এসব বিষয়ের ওপর চিন্তা-ভাবনা করে কুরআন মাজিদকে মানব জাতির জন্যে আসমানি নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

মুজিজা নং– ৫৩

বায়ুর মাধ্যমে পরাগায়ন

আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি। অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি। এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুত তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার নেই। (হিজর, ১৫ : ২২)

বায়ু, ফুলের পরাগরেণু বিস্তারের একটি কার্যকরী মাধ্যম। তার মাধ্যমে গাছের পরাগায়ন সংঘটিত হয়। আর এটি উদ্ভিদবিদ্যার সাম্প্রতিক গবেষণার আবিষ্কৃত একটি বিষয়। যা হোক, আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টি তাঁর কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন আধুনিক উদ্ভিদবিজ্ঞান তা আবিষ্কার করার বহু পূর্বে।

মুজিজা নং– ৫৪

উদ্ভিদ থেকে অক্সিজেন উৎপাদন

যিনি সবুজ বৃক্ষ থেকে তোমাদের জন্য আগুন উৎপন্ন করেন। তখন তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও। (ইয়াসিন, ৩৬ : ৮০)

চৌদ্দশ বছর পূর্বে জ্বলনের প্রক্রিয়া জানতে পারা মানুষের জন্য ছিল অসম্ভব। তার বহু শতাব্দী পর আবিষ্কৃত হয় যে, দাহ্য পদার্থে কার্বনের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ার ফলেই জ্বলন প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়। কুরআন মাজিদ এই রহস্য উদঘাটন করেছে চৌদ্দশ বছর পূর্বে। পবিত্র আয়াতটি গাছের মধ্যে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেয়। গাছের সবুজ উপাদান হল ক্লোরোফিল। এখন এটা অজানা নয় যে, ক্লোরোফিল বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বনডাই-অক্সাইড শুষে নেয় এবং পানির সহায়তায় তাকে কার্বোহাইড্রেডে রূপান্তরিত করে। ফলস্বরূপ অক্সিজেন নির্গত হয়। বস্তুত গাছের সবুজ অংশ বা ক্লোরোফিলই হল প্রধান এজেন্ট যা প্রকৃতিতে অক্সিজেন উৎপাদন ও তার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। বলা বাহুল্য, অক্সিজেন ছাড়া কোনো আগুন জ্বলতে পারে না। পাশাপাশি ক্লোরোফিল যে কার্বোহাইড্রেড উৎপাদন করে তা মৌলিক কার্বন উপাদানের যোগান দেয়- যা সব ধরনের দাহ্য ক্রিয়ার দ্বিতীয় উপাদানের ভূমিকা পালন করে। এটি হুবহু তা-ই যা এই আয়াত

বর্ণনা দেয়- যে আগুন তোমরা প্রজ্বলিত কর তা উৎপন্ন হয় সবুজ বৃক্ষ থেকে।

বিগত পৃষ্ঠাগুলিতে কুরআন মাজিদের সেসব আয়াত পেশ করা হয়েছে যেগুলি প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ আয়াতগুলি আলোচিত হয়েছে কিছু বিশেষ শিরোনামে, যেমন- 'সকল প্রকার জীবনের আদি উৎস পানি', 'প্রাণীদের মধ্যে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব', 'জৈবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণীদের প্রজনন', 'দুধের উৎস', 'মধুর উৎস', 'সবধরনের উদ্ভিদে বিপরীত লিঙ্গের উপস্থিতি', বায়ুর মাধ্যমে উদ্ভিদের পরাগায়ন', ইত্যাদি। বহু শতাব্দী পর্যন্ত মানুষ কুরআন মাজিদের এই আয়াতগুলি পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারে নি এবং এগুলিকে সাধারণভাবে কুরআন মাজিদের রহস্য বলে গ্রহণ করেছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাম্প্রতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি মানুষকে এই আয়াতগুলি ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম করেছে, তা আল্লাহ তাআলার নিরঙ্কুশ জ্ঞান ও ইচ্ছার সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। বাস্তবতা হল এই আয়াতগুলি কুরআন মাজিদে বিদ্যমান ছিল মানুষ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তা অনুধাবন ও ব্যাখ্যার ক্ষমতা অর্জন করার বহু পূর্বে- যা কুরআনের বিস্ময়কর প্রকৃতিকে আরো বেশি সুনিশ্চিত করে। এ কথা অবশ্যম্ভাবী যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যার কাছে না ছিল আবিষ্কার সংক্রান্ত কোনো জ্ঞান, না ছিল এসব তথ্য উদঘাটনের উপায়-উপকরণ, তিনি কুরআন মাজিদে এ সকল আয়াত সন্নিবেশ করতে পারেন না। সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলাই এ ধরনের আয়াত কুরআন মাজিদে সন্নিবেশিত করেছেন। যাতে বুদ্ধিমান ও বিবেচক লোকেরা তাঁর এই কিতাবকে তাঁর আসমানি নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এবং এর নির্দেশনাসমূহ মেনে চলে।

আর বলুন (হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুশরিক-পৌত্তলিক প্রমুখকে) সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতিবাক্য আল্লাহর জন্য। তিনি (আল্লাহ) সত্বরই তাঁর নিদর্শনসমূহ (যা আছে তোমাদের মধ্যে এবং বিশ্ব পরিমণ্ডলে) তোমাদের দেখাবেন। অতঃপর তোমরা তা চিনতে পারবে এবং (মনে রেখ) তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আপনার পালনকর্তা অসতর্ক নন। (নামাল, ২৭ : ৯৩)

যদি আমি (আল্লাহ) এই কুরআন পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে পেতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তাআলার ভয়ে বিদীর্ণ

হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (হাশর, ৫৯ : ২১)

৬ষ্ঠ অধ্যায়

মানব সত্তায় আবিষ্কার সংক্রান্ত মুজিজা

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসমানি অহি হওয়ার কারণে কুরআন মাজিদ সর্বযুগের মানুষের জন্য সর্বাধিক নিখুঁত, অধিক সার্বজনীন ও সর্বাপেক্ষা প্রাগ্রসর জ্ঞান ধারণ করে। এটা স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সকল পর্যায়ের মানবিক জ্ঞান থেকে শ্রেষ্ঠ ও সমুন্নত মর্যাদা রাখে। প্রত্যেক যুগের মানুষই প্রকৃতিতে নতুন যত তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে, পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে তা পূর্ব থেকেই কুরআন মাজিদে বিদ্যমান। আমাদের মনে রাখতে হবে, কুরআন মাজিদ কোনো বিজ্ঞান গ্রন্থ নয়, আবার কোনো রহস্য গ্রন্থও নয়। প্রকৃতির রহস্যসমূহের সমাধান দেয়া এর উদ্দেশ্য নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হল মানব জাতির জন্য অনুপ্রেরণা, দিক-নির্দেশনা ও সমস্যাসমূহের সমাধানের উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করা।

মানবিক জীববিজ্ঞান, যেমন- শরীর বিদ্যা, ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, ভ্রূণবিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক গবেষণায় মানব-শরীর সম্পর্কিত অসংখ্য তথ্য আবিস্কৃত হয়েছে। এসব আবিষ্কারের কোনোটিই একটি সাধারণ

আয়াতের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক নয়। বিস্ময়করভাবে এসব আবিষ্কার কুরআন মাজিদের প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। অধিকন্তু কুরআন মাজিদ এসব তথ্য বর্ণনার জন্যে যেসকল পরিভাষা ব্যবহার করেছে সেগুলি সেসব পরিভাষা থেকে অধিক বেশি সুনির্দিষ্ট ও যথার্থ যা বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেছেন। আরও লক্ষণীয় বিষয় হল, বিজ্ঞানীরা অনেক সময় একই তথ্য বর্ণনার জন্য বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করে থাকেন। এভাবে এই পরিভাষাগুলো মানুষের জ্ঞান সমৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে। কুরআন মাজিদের এটিও একটি মুজিজা যে, কুরআন মাজিদ যেসব পরিভাষা ব্যবহার করেছে তা সার্বজনীন এবং সকল মানবিক ঘটনার অধিক যথার্থ ও সর্বগ্রাহ্য বর্ণনা ধারন করে। এই বাস্তবতার পক্ষে একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত হল, কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 'কিথ ম্যুর' (keith Moore) রচিত The text book of human embryology (মানবিক ভ্রূণতত্ত্বের পাঠ্যপুস্তক)। তিনি এর পরবর্তী সংস্করণে কুরআন মাজিদের পরিভাষা অনুসারে তার পাঠ্যের পরিভাষায় পরিবর্তন সাধন করেছেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না, পূর্বেকার মুসলমানরা এসব পরিভাষা ও আয়াতসমূহকে কুরআন মাজিদের রহস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পাশাপাশি প্রত্যেক পরবর্তী মুসলিম প্রজন্ম এসব পরিভাষা ও আয়াতের কিছু কিছু অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। এভাবে কুরআন মাজিদের রহস্যসমূহ জ্ঞানের বাস্তবতায় পরিবর্তিত হচ্ছে। আর এসবই পূর্ববর্তী চৌদ্দশ শতাব্দীর যাচৎ আল কুরআনের জীবন্ত মুজিজা হয়ে চলে আসছে। আগত কিছু আয়াত মানবদেহ সম্পর্কিত কুরআনি মুজিজার সাক্ষ্য বহন করে।

মুজিজা নং– ৫৫

অধিক উচ্চতায় শ্বাস-প্রশ্বাস

> **অতঃপর আল্লাহ তাআলা যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী**

> **করতে চান তার বক্ষকে সংকীর্ণ-অত্যধিক সংকীর্ণ- করে দেন। যেন সে সবেগে আকাশে (অধিক উচ্চতায়) আরোহণ করছে।** (আনআম, ০৬ : ১২৫)

বায়ু চাপ সংক্রান্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে আমরা এখন এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। এটি বর্তমানে একটি সাধারণ জ্ঞান যে, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অধিক উচ্চতায় বায়ু চাপ তুলনামূলক কম। পৃথিবী একটি বায়ু চাদর দ্বারা পরিবেষ্টিত। মানুষের ফুসফুস সক্রিয় হয় একটি তারতম্যপূর্ণ চাপের কারণে। অর্থাৎ ফুসফুসের আভ্যন্তরীণ চাপ ও বাহ্যিক চাপের একটি ভিন্নতার কারণে। যখন এই ভিন্নতার মাত্রা হ্রাস পায়, যেমন, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতায় গেলে, তখন শ্বাস নেয়া অধিক কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। যার ফলে কুরআন মাজিদে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, বক্ষ সংকোচন অনুভব হয়। যেহেতু আরব উপদ্বীপে কোনো সুউচ্চ পর্বত নেই, তাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা সংক্রান্ত এই অভিজ্ঞতা কখনো লাভ করেন নি, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। কুরআন মাজিদ এই রহস্যের বর্ণনা দেয় যদিও, না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আর না যারা তার আশপাশে বসবাস করেছে এ বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করার পর্যায়ে ছিলেন।

মুজিজা নং– ৫৬

আঙ্গুল ছাপের বিশেষত্ব

> **মানুষ কি মনে করে যে, আমি (আল্লাহ) তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না? কেবল এই নয়, আমি তার আঙ্গুলের ডগা (আঙ্গুলের ছাপ) পর্যন্ত সন্নিবেশিত করতে সক্ষম।** (কিয়ামা, ০৩ : ০৪)

১৮৮০ সালে ইংল্যান্ডে স্যার ফ্রান্সিস গোল্ট আবিষ্কার করেন, পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তি পাওয়া যাবে না যার আঙ্গুলে ছাপ অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে হুবহু মিলে যাবে। তখন থেকেই দুস্কৃতকারীদের শনাক্ত করার ক্ষেত্রে আঙ্গুলের ছাপ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হিসেবে সমাদৃত হয়ে

আসছে। এ-কারণেই বিভিন্ন দেশ যেমন, রাশিয়া তার দেশের সকল নাগরিকের আঙ্গুলের ছাপ সংরক্ষণ করে থাকে। দুই ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপের পার্থক্য এতই আপেক্ষিক ও সূক্ষ্ম যে, কেবল অভিজ্ঞ ব্যক্তিই উপযুক্ত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে তা শনাক্ত করতে পারে। এটি কুরআন মাজিদের অপর এক মুজিজা যে তা এই বাস্তবতার বর্ণনা দিয়েছে মানুষ তা ধারণা করারও বহু আগে।

মুজিজা-৫৭

চামড়ায় সংবেদনশীল স্নায়ুকোষের অস্তিত্ব

> **এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আজাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী।** (নিসা, ০৪ : ৫৬)

এই আয়াত বলে, আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের অধিবাসীদের চামড়া পাল্টে দেবেন যেন তারা বারবার আগুনের শাস্তি আস্বাদন করতে পারে। আর এ থেকে বুঝা যায়, শাস্তি আস্বাদন ও অনুভব চামড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মানব শরীর বিশ্লেষকরা সম্প্রতি দেখিয়েছেন, ব্যথার অনুভূতি গ্রাহক (স্নায়ু) চামড়ার সঙ্গেই সন্নিবেশিত। ফলে আংশিক চামড়া পুড়ে যাওয়া বেশি যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে, যেহেতু গভীর চামড়ার গ্রাহকসমূহ (স্নায়ুসমূহ) তখনো অক্ষত থাকে। পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ চামড়া পুড়ে যাওয়াটা যন্ত্রণাহীন হয়ে থাকে। কেননা তা গ্রাহক স্নায়ুগুলোকেও ধ্বংস করে দেয়। এটি কুরআন মাজিদের একটি সমুজ্জ্বল মুজিজা যে, তা চামড়া সংক্রান্ত এত সূক্ষ্ম শরীর তত্ত্বেরও বর্ণনা দেয়। যখন তা বলে,

'তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আজাব আস্বাদন করতে থাকে।'

থাইল্যান্ড চিয়াংমাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর 'তাগাতাত তাজাসেন' (Tagatat Tajasen) প্রথম দিকে একথা বিশ্বাস করতেন না যে, কুরআন মাজিদে এ বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তীতে তিনি কুরআন মাজিদের এই আয়াতটি যাচাই করেন। তিনি কুরআন মাজিদের বৈজ্ঞানিক যথার্থতা দেখে এত বেশি প্রভাবিত হন যে, সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত অষ্টম মেডিকেল কনফারেন্সের একটি সাধারণ অধিবেশনে তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন।

মুজিজা-৫৮

সংবেদনশীল স্নায়ু ও অন্ত্র

খোদাভীরুদের যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হল, তাতে আছে নির্মল পানির নহরসমূহ, দুধের নহরসমূহ, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তাতে তাদের জন্য আছে রকমারী ফলমূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহেযগাররা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদের পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, অতঃপর তা তাদের নাড়ি-ভুঁড়ি (ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে) কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে? (মুহাম্মদ, ৪৭ : ১৫)

অধ্যাপক কিথ ম্যুর তার পাঠ্য বই 'The Developing Human'- এ এই আয়াতের ব্যাখ্যা দেন এভাবে, 'অন্ত্র বা নাড়ি-ভুঁড়ি কর্তনের মাধ্যমে আজাব দেওয়াও আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা অন্ত্রের মধ্যে কোনো সংবেদন বা অনুভূতি নেই। অন্ত্রে উত্তাপগ্রাহী স্নায়ু নেই। এভাবে তা কেবল ফুটন্ত পানিই নয় যা এই আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। এটাও জ্ঞাত বিষয় যে, যদি অন্ত্র ছিদ্র হয়ে যায়, তবে অন্ত্রস্থ পদার্থসমূহ উচ্চ সংবেদনশীল (Peritoneal) গহ্বরের ভেতর দিয়ে নির্গত হবে। তখন

Peritoneal গহ্বরে বিদ্যমান দৈহিক স্নায়ুগুলো উদ্দীপ্ত হবে। এটি মানব শরীরে তীব্রতর ব্যাথার অনুভূতি সঞ্চার করবে। এ কারণে কুরআন মাজিদ বলে, ফুটন্ত পানি তাদের অন্ত্র বিদীর্ণ করে দিবে। একথা বলাবাহুল্য যে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সময়কালে মানব-শরীর সম্পর্কে এমন সুনির্দিষ্ট জ্ঞান অর্জনে সক্ষম ছিলেন না।

মুজিজা-৫৯

রজঃস্রাব চক্র

আল্লাহ্ জানেন প্রত্যেক নারী যা বহন করে (গর্ভধারণ করে) এবং গর্ভাশয় কি পরিমাণ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত হয়। এবং তার কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে। (রা'দ, ১৩ : ০৮)

রজঃস্রাব হল, প্রতি মাসে একবার একজন মহিলা থেকে রক্ত ও টিস্যুর নির্গমন। কেবল একজন শরীরবিদ্যা বিশারদ কিংবা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞই বলতে পারে, একজন মহিলার জরায়ুগ্রন্থিতে কী ঘটে থাকে। তারা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে, uterus undergoes এর endometrial স্তর প্রতি মাসচক্রে পরিবর্তিত হয়, যা রজঃস্রাব বা ঋতুচক্রের জন্য দায়ী। ঋতুচক্রের শুরুতে এর পুরুত্ব থাকে ০.৫ মিলিমিটার।

ডিম্বাশয়ে সংগুপ্ত হরমোনের প্রতিক্রিয়ার ফলে endometrial বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ৫-৬ মিলিমিটারের পুরুত্বে পৌঁছে যায়। যখন এটি তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যায় অথচ গর্ভ সঞ্চারিত না হয়, তখন basal layer ত্যাগ করতে পুরো endometrium ঝরে যায়। endometrium- এর পুরুত্বে সংকোচন ও সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া রজঃস্রাবের রক্তপাতের সঙ্গে সংগঠিত হয়। এটি হুবহু তা-ই যা কুরআন মাজিদ বর্ণিত আয়াতে 'গর্ভাশয়ের সংকোচন ও সম্প্রসারণ' করার মাধ্যমে বর্ণনা দিয়েছে। আল্লাহ

তাআলা ব্যাতীত আর কে কুরআন মাজিদে এমন বিস্ময়কর তথ্য সংস্থাপন করতে পারেন?

মুজিজা : ৬০

মানব অণ্ডকোষ গঠনের স্থান

> **অতএব মানুষের চিন্তা করে দেখা উচিত, তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে দ্রুতবেগে নির্গত পানি থেকে। যা বের হয় মেরুদণ্ড ও বুকের হাড়ের মধ্য থেকে। নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। যেদিন গোপন বিষয় প্রকাশ করা হবে।** (তারিক, ৮৬ : ০৫-০৯)

কুরআন মাজিদের পূর্বেকার ভাষ্যকারগণ এসব আয়াতের বিষয়বস্তু পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারেন নি। এখন এটি ভালভাবে জ্ঞাত যে, gonad বা প্রজননগ্রন্থী সেখানেই প্রকাশ পায় যেখানে Loins (কোমরের সর্বনিম্নাংশ) পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

এটি এখন ভালভাবে জ্ঞাত যে, ভ্রূণ বেড়ে ওঠার সময় যেখানে কোমর (Loins) তৈরি হয় সেখানেই প্রজননগ্রন্থী (gonads) তৈরি হয়। ভ্রূণের মধ্যে Genital ridges নামক অংশটি চার সপ্তাহ বয়সে (ভ্রূণের) মধ্য লাইনের দুইদিকে Mesonephros ও dorsal mesentery-এর মাঝখানে তৈরি হয়। সপ্তম কিংবা অষ্টম সপ্তাহে প্রজননগ্রন্থী স্ত্রী কিংবা পুংলিঙ্গে বিভক্ত হয়। প্রজননগ্রন্থী তখন ক্রমাগত নিচের দিকে নামতে থাকে। স্ত্রী প্রজননগ্রন্থী তথা ovaries (ডিম্বাশয়) কোমরের ভেতরেই থেমে

যায়। পক্ষান্তরে পুং প্রজননগ্রন্থী আগ পর্যন্ত আরও নিচের দিকে নামতে থাকে; অবশেষে তা Inguinal canal দিয়ে শরীরের বাইরে এসে অণ্ড থলিতে প্রবেশ করে। যা হোক, মূত্র উৎপাদন পদ্ধতি, রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি, লসিক নিঃসরণ পদ্ধতি, এমনকি যা পূর্ণ বয়স্ক মানুষের শরীরে বিদ্যমান থাকে কুরআন মাজিদে উল্লিখিত দু'টি স্থান (মেরুদণ্ড ও পাঁজর)-কে সংযুক্ত করে। অধিকন্তু, অণ্ডকোষের রক্তনালী (ধমনি) abdominal orta নামক পেটের ভেতরের সর্ববৃহৎ রক্তনালী, যা দ্বিতীয় lumber vertebra এর সমান্তরালে অবস্থিত থেকে উৎপন্ন হয়। আবার ডানদিকের দূষিত রক্তগুলো শিরা দিয়ে পেটের অন্তঃস্থ বৃহৎ শিরা-'interior vena cava'য় গিয়ে পতিত হয়। অন্যদিকে বাম দিকের অণ্ডকোষ থেকে দূষিত রক্তগুলো বাম পাশের কিডনি হয়ে পূর্বে উল্লিখিত শিরায় গিয়ে পতিত হয়। উপরোক্ত স্থানগুলো কুরআন মাজিদে উল্লিখিত স্থান নির্দেশ করে। ভ্রূণ বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিককালে এই সূক্ষ্ম উপাত্তগুলো আবিষ্কার করেছেন, যেগুলো হাজার বছর আগে কুরআন মাজিদে উল্লিখিত হয়েছে। (শেষ প্যারাটি অনুবাদে সাহায্য করেছেন ডা. আবুল মঞ্জুর (রাসেল) এমবিবিএস, এফআরসিএস (প্রশিক্ষণরত) মিডফোর্ট, ঢাকা)

মুজিজা : ৬১

লিঙ্গ নির্ধারণে পুরুষের ভূমিকা

> **আর তিনিই (আল্লাহ) সৃষ্টি করেন- পুরুষ ও নারী। শুক্রবিন্দু থেকে যখন তা নিক্ষিপ্ত হয়।** (নাজম, ৫৩ : ৪৫-৪৬)
>
> **অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তা থেকে সৃষ্টি করেন উভয় লিঙ্গ, পুরুষ ও নারী। তিনি (আল্লাহ) কি মৃতদের জীবিত করতে সক্ষম নন?** (কিয়ামাহ, ৭৫ : ৩৯-৪০)

এই আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যে, নবজাত শিশুর লিঙ্গ নির্ধারিত হয় পুরুষের মাধ্যমে। এটি সাধারণ জ্ঞাত বিষয় যে, শুক্রবিন্দু হল সেই তরল পদার্থ যা যৌনক্রিয়ার সময় পুরুষ থেকে দ্রুতবেগে নির্গত হয়।

কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে এমন প্রকৃতির বীর্যপাত হয় না। পুরুষের শুক্রাণু X কিংবা Yক্রোমোজম বহন করে। পক্ষান্তরে মহিলাদের ডিম্বাণু দু'টি অভিন্ন XX ক্রোমোজম বহন করে। যদি পুরুষের শুক্রাণুর X ক্রোমোজমের সঙ্গে মহিলা X ক্রোমোজমের মিলন ঘটে তবে তা একজোড়া 'XX'ক্রোমোজম গঠন করে, যা পরিণতিতে একটি মেয়ে শিশুর আকৃতি তৈরি করে। পক্ষান্তরে যদি পুরুষের শুক্রাণুর Yক্রোমোজমের সঙ্গে মহিলার ডিম্বানুর X ক্রোমোজমের মিলন ঘটে তবে তা একজোড়া XY ক্রোমোজমের আকৃতি তৈরি করে। অবশেষে যা একটি পুরুষ শিশুর আকৃতি তৈরি কর। অতএব নবজাত শিশুর লিঙ্গ সর্বদা পুরুষের শুক্রাণু দ্বারা নির্ধারিত হয়। কুরআন মাজিদ এই বিষয়টিকে সবেগে নির্গত পানি (Ejaculation) কথার দ্বারা ব্যক্ত করেছে, যা কেবল পুরুষের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে।

মুজিজা : ৬২

শ্রবণেন্দ্রীয়ের রহস্য

> **বল, আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদের রিযক দেন? অথবা কে তোমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক?** (ইউনুস, ১০ : ৩১)
>
> **আর যে বিষয় তোমার জানা নাই তার অনুসরণ কর না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।** (ইসরা, ১৭ : ৩৬)
>
> **আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে, আমি তাকে পরীক্ষা করব, ফলে আমি তাকে বানিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন।** (ইনসান, ৭৬ : ০২)

উল্লেখ্য যে, এসব আয়াত ও অন্যান্য আয়াতে যেখানেই কুরআন মাজিদে শ্রবণ, দর্শন ও অন্তকরণের উল্লেখ উল্লেখ হয়েছে, শ্রবণেন্দীয়কে অন্যান্য ইন্দ্রীয়ের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একটি জ্ঞাত বিষয় যে, মানুষের জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় শ্রবণ ইন্দ্রীয়ের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। একজন শিশু অন্ধ হয়ে জন্ম নিলে তাকে অনেক

বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু অল্প আয়াসেই সে বিভিন্ন বিষয়ে জানতে পারে। পক্ষান্তরে, যে শিশু বধির হয়ে জন্ম নেয়, যে কোনো বস্তু সম্পর্কে জানতে তার অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। কুরআন মাজিদ এভাবে অন্যান্য ইন্দ্রীয়ের ওপর শ্রবণেন্দ্রীয়ের গুরুত্ব তুলে ধরেছে। অধিকন্তু আরো উল্লেখ থাকে যে, ভ্রূণে শ্রবণেন্দ্রীয় বিকশিত হয় গর্ভধারণের কেবল বাইশদিনের মধ্যেই এবং গর্ভধারণের চতুর্থ মাসে তা পুরোপুরি কাজ করতে শুরু করে। তখন ভ্রূণ মায়ের পাকস্থলীর গুড়গুড় শব্দ শুনতে পায় এবং সে শব্দও শুনতে পায় যা সে (মা) আহার ও পান করার সময় সৃষ্টি করে। এমন কি মায়ের চারপাশের শব্দও ভ্রূণটি শুনতে পায়। এভাবে শ্রবণেন্দ্রীয় বিকশিত হয় এবং জীবনের অন্যান্য ইন্দ্রীয়ের অনেক আগেই একজন নবজাতকের মধ্যে তা কাজ করতে শুরু করে। কুরআন মাজিদ মানুষের অন্যান্য অঙ্গের পূর্বে শ্রবণেন্দ্রীয়ের কথা উল্লেখ করার পেছনে এটিকে একটি কারণ বলা যেতে পারে। রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাতও এই বিষয়টিকে সমর্থন করে। তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নত আমাদেরকে শিক্ষা দেয়, যখনই কোনো নতুন শিশু জন্মগ্রহণ করে আমরা যেন তার উভয় কানে আজান ও ইকামাতের বাক্যগুলি বলে শুনাই।

এটি অত্যন্ত লক্ষণীয় বিষয় যে, কুরআন মাজিদ শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে সর্বদা এক বচনের শব্দ (সামআ) ব্যবহার করেছে, পক্ষান্তরে দর্শন ইন্দ্রিয়ের জন্যে বহুবচনের শব্দ (বাসারা) ব্যবহার করেছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, ব্রেইনে যে ভিজুয়েল সেন্টার (দর্শন কেন্দ্র) রয়েছে যাকে Occipital lobe বলা হয়, তা দুইটি সমজাতীয় অংশে বিভক্ত। পক্ষান্তরে, হিয়ারিং সেন্টার (শ্রবণ কেন্দ্র) হচ্ছে একটি। কুরআন মাজিদের এ ধরনের সুনির্দিষ্ট শব্দ চয়ন তার অন্য একটি মুজিজা।

মুজিজা : ৬৩

মানব অঙ্গ বিকাশের ক্রমধারা

> **আপনি বলুন, (হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তোমরা আমাকে বলতো দেখি, যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রবণ ও**

> **দৃষ্টিসমূহ কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহে মোহর এঁটে দেন, কে আছে ইলাহ, আল্লাহ ছাড়া, যে তোমাদের এগুলো নিয়ে আসবে? দেখ আমি কিভাবে বিভিন্নরূপে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করি, তারপরও তারা এড়িয়ে চলে।** (আনআম, ০৬ : ৪৬)

> **আর আল্লাহ তোমাদেরকে বের করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমতাবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন শ্রবণশক্তি, চক্ষু ও অন্তর। যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর।** (নাহল, ১৬ : ৭৮)

আর তিনিই তোমাদের জন্য কান, চোখসমূহ ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা কমই (আল্লাহর) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (মুমিনুন, ২৩ : ৭৮)

এই আয়াতগুলি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের কথা বলে, যা আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য যে, কুরআন মাজিদ এসব অঙ্গ বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বদা একটি ক্রমধারা অনুসরণ করে। প্রথমে তা শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের কথা বলে, অতঃপর দর্শন ইন্দ্রিয়, তারপর অনুভূতি ও বোধশক্তি। একজন সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে তাতে কোনো তাৎপর্য ধরা নাও পড়তে পারে। একজন ভ্রূণতত্ত্ববিদ ডা. কিথ মুর এই ক্রমধারাটি লক্ষ্য করেন। ইসলামিক মেডিকেল এসোসিয়েশনের সাময়িকীতে একটি প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন, ভ্রূণগত বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম শ্রবণেন্দ্রীয়ের অভ্যন্তরীণ Primordia (প্রাথমিক উপাদান) দৃষ্টিগোচর হয়, তারপর দর্শন ইন্দ্রীয়ের Primordia অতঃপর ব্রেইনের Primordia, অনুভূতি ও বোধশক্তির কেন্দ্র। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাদেরকে এমন শাশ্বত ও চিরন্তন জ্ঞান ও বিস্ময়কর গ্রন্থ দান করেছেন।

মুজিজা : ৬৪

মিথ্যা বলার সঙ্গে কপালের সম্পর্ক

কখনো নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি তাকে নাসিয়া (কপালের সম্মুখভাগের চুল) ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাব, মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠ কপাল। (আলাক, ৯৬ : ১৫-১৬)

এই আয়াতগুলিতে মক্কায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘোর শত্রু আবু জেহেলের কথা বলা হয়েছে। কুরআন মাজিদ বলে, সে মিথ্যা বলত এবং তাকে এমর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তাকে 'নাসিয়া' ধরে নিয়ে যাওয়া হবে, যার অর্থ হল কপাল। চলুন আমরা মিথ্যা ও কপালের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা করি।

মানুষের মাথার খুলির সম্মুখভাগ Cerebrum (মস্তিষ্কের যে ভাগ স্বেচ্ছাচালিত পেশীর আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করে)- এর সম্মুখপূর্ব অঞ্চল নিয়ে গঠিত। ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা বিশারদ ও শরীয়ততত্ত্ববিদগণ বলেন, পরিকল্পনার প্ররোচনা ও দূরদৃষ্টি এবং প্রাথমিক আলোড়নের ঘটনা সংঘটিত হয় সম্মুখপূর্ব Cerebrum-এর সম্মুখস্ত (উপরের অংশের) লবের পেছনের অংশে। ডা. শিলি রড তার Essentials of Anatomy and Physiology (Mosby Year book inc,p,112.st Louis 1966) নামক গ্রন্থে লিখেন, পরিকল্পনার প্ররোচনা ও দৃরদৃষ্টি এবং প্রাথমিক গতি সঞ্চারিত হয় সম্মুখস্ত লবের পেছনের অংশে, সম্মুখপূর্ব অঞ্চলে। প্ররোচনার ক্ষেত্রে জড়িত থাকার কারণে সম্মুখপূর্ব অঞ্চলকে আগ্রাসনের কার্যকরী কেন্দ্র বলেও বিবেচনা করা হয়।

এ থেকে প্রতীয়মান হয়, যখন একজন লোক সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তখন কপালকে মিথ্যাবাদী ও পাপিষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করা অধিক উপযুক্ত। কুরআন মাজিদ এটিকে নির্দেশ করে মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠ 'নাসিয়া' বলে। প্রফেসর কিথ মুর-এর মতে, বিজ্ঞানীরা কেবল বিগত ষাট বছরেই এ বিষয়টি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। অথচ আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন শত শত বছর পূর্বে।

এ অধ্যায়ে বর্ণিত মুজিজাসমূহ এ কথার আরো অধিক সাক্ষ্য বহন করে যে, কুরআন মাজিদ সর্বজ্ঞাতা সৃষ্টিকর্তা, বিশ্ববাসী ও মানব জাতির রিজিকদাতা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আসমানি গ্রন্থ। না মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আর না সে যুগের মানুষের

এই জ্ঞান কিংবা এমন সুযোগ ছিল যে, তারা কুরআন মাজিদে বর্ণিত মানব জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করবে। বস্তুত কুরআন মাজিদে মানব জীব-বিজ্ঞান সংক্রান্ত যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান রয়েছে তা মানুষ কেবল সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে। এভাবে এটি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি জীবন্ত মুজিজা যে, তাআলা আল্লাহ্ তার মাধ্যমে এমন একটি গ্রন্থ, কুরআন মাজিদ মানব জাতিকে দান করেছেন। যাতে মানবিক এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় যেমন, অধিক উচ্চতার শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হওয়া, আঙ্গুলের ছাপের বিশেষত্ব, চামড়ায় সংবেদনশীল স্নায়ুর উপস্থিতি, পাকস্থলীতে সংবেদনশীল স্নায়ুর অনুপস্থিতি, মানববীর্যের গঠন, পুরুষ কর্তৃক লিঙ্গ নির্ধারণ এবং শ্রবণেন্দ্রীয়ের বিশেষত্ব ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। বিবেচক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই কুরআন মাজিদকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নির্দেশনা গ্রন্থ বলে স্বীকার করবে, গ্রহণ করবে এবং এর আদেশের সামনে মাথা নত করবে।

'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমরা মানুষ হয়ে এখানে-সেখানে ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মাঝে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে, কওমের জন্য যারা চিন্তা করে। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও তোমাদের বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা ও তার অনুগ্রহ থেকে তোমাদের (জীবিকা) অন্বেষণ। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা শোনে। আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদেরকে ভয় ও ভরসা স্বরূপ বিদ্যুৎ দেখান, আর আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা জমিনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্য যারা অনুধাবন করে। (রুম, ৩০ : ২০-২৪)

সপ্তম অধ্যায়

মানব ভ্রুণবিদ্যার ক্ষেত্রে আবিষ্কার সংক্রান্ত মুজিজাসমূহ

মানব ভ্রুণবিদ্যা একটি চমৎকার আধুনিক বিজ্ঞান। ১৯৪০ খৃস্টাব্দে ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের পর এটি প্রাণ-বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই আবিষ্কারের পূর্বে মানব ভ্রুণ বিকাশের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব ছিল না। ভ্রুণের আকৃতির ক্ষুদ্রতাই ছিল তার কারণ। কুরআন মাজিদ-যা মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের ১,০০০ বছরেরও অধিককাল পূর্বে এবং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের ১৪০০ বছরেরও অধিককাল পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে- তাতে মানব ভ্রুণ বিকাশের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে প্রথম সচরাচর বর্ণনা পাওয়া যায়। এটি গর্ভধারণ থেকে নিয়ে মানব ভ্রুণের বিকাশের বিভিন্ন স্তর, পূর্ণ গর্ভধারণ, এমনকি সন্তান জন্মদান পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ের সর্বাপেক্ষা যথাযথ ও সঠিক

বর্ণনা প্রদান করে। অধিকন্তু কুরআন মাজিদ ভ্রুণ বিকাশের বিভিন্ন স্তরকে বর্ণনার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিভাষা ব্যবহার করেছে।

ভ্রুণবিদ্যার আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, এই ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কুরআনি পরিভাষাই সর্বাপেক্ষা যথার্থ ও সার্বজনীন বর্ণনা এবং তা ভ্রুণ বিকাশের প্রতিটি ধাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিকাশধর্মী উপাত্তসমূহেরও বর্ণনা প্রদান করে। যেমনটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ ভ্রুণবিজ্ঞানী কিথ মুর মানব ভ্রুণবিজ্ঞানের ওপর রচিত তার বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে বইয়ের পরিভাষাগুলিকে কুরআন মাজিদে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলির অনুসরণে পরিবর্তন করে নেন। তিনি এই সুমহান গ্রন্থের ব্যবহৃত পরিভাষা ও ক্রমবিকাশের স্তরগুলোর ক্রমধারার ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন বর্ণনা পদ্ধতির প্রস্তাব করেন।

আরও উল্লেখ্য যে, কুরআন মাজিদ কেবল ভ্রুণ বিকাশের ধারা ও সঠিক ক্রমেরই বর্ণনা দেয় না, বরং তা ভ্রুণ বিকাশের বিভিন্ন স্তরের আপেক্ষিক সময়ও নির্দেশ করে। কুরআন মাজিদ এ ক্ষেত্রে দু'টি বিশেষ অব্যয় ব্যবহার করে 'ফা'- যা আশু পরিবর্তন নির্দেশ করে এবং 'ছুম্মা'- যা বিলম্বিত পরিবর্তন নির্দেশ করে। এভাবে কুরআন মাজিদ এই বিষয় নির্দেশ করে যে, ভ্রুণবিকাশের ক্ষেত্রে দু'ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। এসব পরিবর্তনের কিছু তাৎক্ষণিক এবং অন্যগুলি হয় সময় সাপেক্ষে। এটি এমন একটি বিষয় যা আধুনিক ভ্রুণবিজ্ঞানীগণ ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে অল্প কয়েক বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষে মানব ভ্রুণ বিকাশের পরিবর্তনের সামান্যতম জ্ঞান অর্জনেরও কোনো উপায় ছিল না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বর্তমানেই বা কয়জনের এই জ্ঞান আছে? একথা পরিষ্কার যে, সুস্পষ্ট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এই জ্ঞান এসেছে সর্বজ্ঞ- জ্ঞানময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে।

মুজিজা : ৬৫

মানুষের উৎস

সে (মানুষ) কি মায়ের গর্ভে বীর্যের শুক্রবিন্দু ছিল না, যা স্খলিত হয়? (কিয়ামাহ, ৭৫ : ৩৭)

বহু বছর পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ছিল, রজঃস্রাবের রক্তই হল মানব জীবনের উৎস। এমনকি মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের পরও অনেক বিজ্ঞানীর মধ্যে এই ধারণা প্রবল ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, রজঃস্রাবের রক্তে পূর্ণ গঠিত ভ্রূণ বিদ্যমান রয়েছে এবং একটি শিশুর জন্মের ক্ষেত্রে পুরুষের বীর্যের এছাড়া কোনো ভূমিকা নেই যে, তা রজঃস্রাবের রক্তকে গাঢ় হতে সহযোগিতা করে। কুরআন মাজিদ এই আয়াতে পূর্বের বিজ্ঞানীদের বিশ্বাসের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। পাশাপাশি তা মানুষের উৎস সম্পর্কে এই মর্মে যথাযথ ও সঠিক তথ্য প্রদান করে যে, মানুষের সৃষ্টি হয় শুক্র বিন্দু থেকে।

মুজিজা : ৬৬

গর্ভধারণের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার ভূমিকা

হে মানুষ, আমি (আল্লাহ) তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি। (হুজুরাত, ৪৯ : ১৩)

আর তিনি (আল্লাহ) আর তিনিই যুগল সৃষ্টি করেন- পুরুষ ও নারী। (মিশ্রিত) শুক্রবিন্দু থেকে যখন তা নিক্ষিপ্ত হয়। (নাজম, ৫৩ : ৪৫-৪৬)

পূর্বেকার একদল বিজ্ঞানীর বিশ্বাস ছিল, পুরুষের নিঃসৃত বীর্য কিংবা স্ত্রীদের রজঃস্রাব একটি নবজাত শিশুর ভ্রূণ গঠনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে না। তাদের ধারণা ছিল, পুরুষের বীর্যে একটি পূর্ণ আকৃত্রির মানুষের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে এবং মানুষের বিকাশ তার একটি সাধারণ মৌলিক আকৃতি বড় হওয়া থেকে অধিক নয়, যা গর্ভধারণের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রাক্কালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অন্যরা- যেমনটি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে- বিশ্বাস করতেন, একটি নবজাত শিশুর গঠনে কেবল মহিলারই ভূমিকা রয়েছে এবং পুরুষের

বীর্য তার বিকাশের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা পালন করে না। বিজ্ঞানী লিউয়েন হুক ১৭৭৩ সালে সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৭৭৫ সালে বিজ্ঞানী স্প্যালাঞ্জানি (Spallanzani) প্রমাণ করেন, পুরুষের শুক্রাণু এবং মহিলার ডিম্বানু উভয়টিই একটি নবজাত শিশুর গঠনে সমান ভূমিকা রাখে। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, কুরআন মাজিদ এই তথ্যটি উল্লেখ করেছে বহু শতাব্দী পূর্বে।

মুজিজা : ৬৭

মানব ভ্রূণের পর্যায়সমূহ

তোমাদের কী হল, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের পরোয়া করছ না? অথচ তিনি তোমাদেরকে নানা স্তরে সৃষ্টি করেছেন। (নুহ, ৭১ : ১৩-১৪)

তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে; এক সৃষ্টির (পর্যায়ের) পর আরেক সৃষ্টি (পর্যায়)। (যুমার, ৩৯ : ০৬)

একদা জানা ছিল, একজন মানুষ বিকশিত হয় পুরুষের শুক্রাণু ও নারীর ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার মাধ্যমে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল, একটি সাধারণ জাইগোট কোষ বহুকোষে, সেখান থেকে বহু অঙ্গে এবং তা থেকে বহুতন্ত্র সম্বলিত একজন পরিপূর্ণ মানুষে রূপান্তরিত হওয়া প্রসঙ্গে। যদিও পূর্বেকার বিজ্ঞানীদের মধ্যে নবজাত শিশুর আদি উৎস সম্পর্কে মতের ভিন্নতা রয়েছে, তাদের এই সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে, পুরুষের শুক্রাণু কিংবা মহিলার ডিম্বাণুতে একটি পূর্ণ আকৃতির মানুষ বিদ্যমান রয়েছে। অধিকন্তু তারা এই ধারণাও পোষণ করত যে, একটি মানব ভ্রূণের বৃদ্ধি কেবল তার মূল আকৃতির পরিমাণ বাড়ার এক অভিন্ন প্রক্রিয়া। অনেক বিজ্ঞানীর মধ্যে এই ধারণা প্রবল ছিল। পক্ষান্তরে, কুরআন মাজিদ সুস্পষ্টভাবে এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, মানবভ্রূণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কিছু পরম্পরাগত

পর্যায়ে, যা বর্তমানে ভ্রুণতত্ত্ববিদদের মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত সত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। উল্লেখ্য যে, ভ্রুণ বিকাশের এই পর্যায়ক্রমিক স্তরসমূহের ধারণা সর্বপ্রথম প্রদান করেন Wolf (উলফ) ১৭৫৯ সালে। যা হোক ১৯৪০ সাল পর্যন্ত মানব ভ্রুণ বিকাশের সুনির্দিষ্ট স্তরসমূহ নির্ধারিত হয় নি। কেবল সাম্প্রতিক সময়েই ভ্রুণবিজ্ঞানীগণ ভ্রুণ বিকাশের বিভিন্ন স্তর ও ধাপ নির্ণয় করেছেন। এটি কুরআন মাজিদের একটি সুস্পষ্ট মুজিজা যে, ভ্রুণবিজ্ঞানীগণ ধারণা করারও বহুশত বছর পূর্ব থেকে কুরআন মাজিদে এই তথ্য বিদ্যমান রয়েছে।

মুজিজা : ৬৮

তিনটি আবরণ দ্বারা ভ্রুণের আচ্ছাদন

তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন তোমাদের মাতৃগর্ভে; বিভিন্ন স্তরে একেরপর এক, তিন অন্ধকারের (আবরণের) মধ্যে। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব ও পালনকর্তা। (যুমার ৩৯ : ০৬)

পূর্বেকার ভাষ্যকারগণ 'অন্ধকারের তিন আচ্ছাদন'-এর ব্যাখ্যা করেছেন– উদরের বেষ্টনী, জরায়ুর দেয়াল ও ভ্রুণের চারপাশে বেষ্টিত ঝিল্লি। ভ্রুণবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, এই তিনটি স্তরের প্রত্যেকটি পরবর্তীতে তিনটি পৃথক পৃথক স্তর গঠন করে। উদরের আচ্ছাদন তিনটি স্তর দ্বারা গঠিত : বহিঃস্থ তির্যক মাংসপেশীর আস্তরণ, আভ্যন্তরীণ তির্যক মাংসপেশীর আস্তরণ ও আড়াআড়ি মাংসপেশীসমূহ। অনুরূপভাবে জরায়ুর দেয়াল তিনটি স্তর দ্বারা গঠিত : Epimetrium, Myometrium ও Endometrium। Myometrium ও পরবর্তীতে তিনস্তরের মাংসপেশী দ্বারা গঠিত হয় : Longitudinal স্তর, আটটি মাংসপেশী সমেত তারপরবর্তী একটি Interwoven স্তর, অতঃপর একটি বৃত্তাকার মাংসপেশীর স্তর। অধিকন্তু যে কোষ ভ্রুণকে বেষ্টন করে থাকে তাও তিন স্তরে গঠিত। যথা : Amnion, Chorion ও Decidion।

ভ্রুণবিজ্ঞানের কোনো কোনো বইতে বলা হয়েছে, ভ্রুণ চারটি ঝিল্লি দ্বারা পরিবেষ্টিত। তারা Yolk cell ঝিল্লিকে ভ্রুণের চতুর্থ স্তর বলে গণ্য করেন। যা হোক, Yolk cell ঝিল্লির পুষ্টিসংক্রান্ত কোনো কাজ নেই এবং অবশেষে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভ্রুণের চারপাশে অবশেষে তিনটি ঝিল্লীই অবশিষ্ট থাকে। সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিজীবের রিজিকদাতা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কার কাছে মানবভ্রুণ বেষ্টিত আস্তরণের মত এমন জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞান থাকতে পারে?

মুজিজা : ৬৯

ভ্রুণ বিকাশের তিনটি প্রধান পর্যায়

> **আর অবশ্যই আমি (আল্লাহ) মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর (ছুম্মা) আমি তাকে শুক্ররূপে (নুতফা) সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। তারপর (ছুম্মা) আমি 'নুতফা' কে 'আলাকা'য় (রক্তপিণ্ড) পরিণত করি (খালাকনা)। অতঃপর (ফা) আমি আলাকাকে 'মুদগা'য় (গোশতপিণ্ডে) পরিণত করি। অতঃপর (ফা) মুদগাকে 'ইযামে' (হাড়ে) পরিণত করি। অতঃপর (ফা) 'ইযাম' কে 'লাহম' (মাংসপেশী) দ্বারা আবৃত করি। তারপর (ছুম্মা) আমি 'আনশা'নাহু' (তাকে গড়ে তুলি) অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়!** (মুনিনুন, ২৩ : ১২-১৪)

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতে কুরআন মাজিদ দু'টি ভিন্ন সংযোজক অব্যয় তথা 'ফা' ও 'ছুম্মা' ব্যবহার করেছে। অধিকাংশ অনুবাদের ক্ষেত্রে উভয়টির একই অর্থ করা হয়েছে। অথচ পূর্বে যেমনটি উল্লেখিত হয়েছে 'ফা' অব্যয়টি অব্যবহিত পরে অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে 'ছুম্মা' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয় বিলম্বিত পরম্পরা বুঝানোর জন্য। কুরআন মাজিদ উপরোক্ত

আয়াতে 'ছুম্মা' অব্যয়টি কেবল তিনবার ব্যবহার করেছে। যা নির্দেশ করে, ভ্রূণের বিকাশের ক্ষেত্রে তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায় রয়েছে। ভ্রুণবিজ্ঞানীগণ ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে এই বিষয়টি আবিষ্কার করেছেন কেবল কয়েক বছর পূর্বে। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর বহু শতাব্দী পূর্বে এমন সূক্ষ্ম ও সুনির্দিষ্ট তথ্য অবতীর্ণ করতে পারেন?

কুরআন মাজিদ ভ্রুণ বিকাশের স্তরগুলিকে নির্দেশ করার জন্য তিনটি সুনির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহার করেছে। সেগুলি নিম্নে তুলে ধরা হল :

১. 'নুতফা' : এটি বিকাশের প্রথম ধাপকে নির্দেশ করে এবং এই ধাপটি পুরুষ ও নারীর বীর্য মিলন থেকে মায়ের জরায়ুতে জাইগোট সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত পুরো বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। এ ধাপে আন্তকোষীয় জাইগোট বিভাজিত হওয়া শুরু করে এবং একটি অধিকতর জটিল রূপ ধারণ করে।

২. 'খালাক্বনা বা তাখলিক : এটি ভ্রূণ বিকাশের দ্বিতীয় ধাপ। এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির স্তর। যা শুরু হয় তৃতীয় সপ্তাহ থেকে এবং শেষ হয় গর্ভধারণের অষ্টম সপ্তাহে। এই ধাপে কোষ বিভাজন আরো ত্বরান্বিত হয় এবং মানব অঙ্গসমূহ ও বিভিন্ন তন্ত্রের পার্থক্য পরিষ্কার হয়।

৩. 'আনশা'না বা নাশআ : এটি ভ্রূণবিকাশের তৃতীয় ও সর্বশেষ স্তর। এই ধাপে দ্রুত কোষ বিভাজন, পৃথকীকরণ ও বৃদ্ধি সাধন একটি সুনির্দিষ্ট মানব আকৃতি গঠন করে, যাকে বলা হয় ভ্রূণ। ধাপটি শুরু হয় গর্ভধারণের নবম সপ্তাহ থেকে এবং শিশু ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

এসব ধাপের প্রত্যেকটি অঙ্গসংস্থান ও শরীরতাত্ত্বিক বিভিন্ন পরিবর্তনের একটি জটিল প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয়। এই পরিবর্তনগুলি হয় দ্রুত, কিন্তু একটি থেকে অপরটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কুরআন মাজিদ এসব উপধাপকে সুনির্দিষ্ট শব্দে 'ফা' সংযোজক অব্যয় সহকারে বর্ণনা দিয়েছে, যা দ্রুত ও তাৎক্ষণিক পরিবর্তন নির্দেশ করে। আগত পৃষ্ঠাগুলি এ কথা পরিষ্কার করে দিবে যে, ভ্রূণবিকাশের এসব উপধাপ বর্ণনার ক্ষেত্রে কুরআন

মাজিদের শব্দসমূহ অধিক ব্যাপক ও যথোপযুক্ত। এভাবে কুরআন মাজিদের প্রতিটি পরিভাষাই একথা ঘোষণা করে যে, মানব ভ্রূণবিদ্যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি জীবন্ত মুজিজা এবং স্বয়ং কুরআন মাজিদের জন্যেও তা মুজিজা।

বিকাশের 'নুতফা' পর্যায়

'নুতফা' পর্যায়টি নিম্নলিখিত ধাপ বা উপপর্যায়সমূহে বিভক্ত :

মুজিজা : ৭০

কুরআনি পরিভাষা 'আল মাউদ্ দাফিক্ব'

আভিধানিকভাবে 'আল মাউদ্ দাফিক্ব' কথাটির অর্থ, প্রবলবেগে নির্গমনকারী কিংবা স্বেচ্ছা নির্গমনকারী তরল পদার্থ বা এমন একটি ফোটা যা নির্গত হয়েছে। অন্যকথায়, তা এমন তরল পদার্থ নির্গমনকে নির্দেশ করে যা স্বেচ্ছায় নিষ্ক্রান্ত হয়, যা নিজে নিজে চলৎক্ষম। মাইক্রোস্কোপ ব্যবহারে দেখা গেছে, কেবল শুক্রাণুই নয় বরং ডিম্বাণুও চলৎক্ষমতা প্রদর্শন করে। পরিপক্ক শুক্রাণু একটি স্বাধীনভাবে সন্তরণকারী কার্যকরী অঙ্কুর কোষ, যাতে একটি মাথা ও একটি লেজ রয়েছে। লেজ শুক্রাণুতে গতি সঞ্চার করে এবং এটিকে ডিম্বাণুর দিকে গমনে সাহায্য করে।

Fimbrac আঙ্গুল সদৃশ প্রক্ষেপণ যা Infundibulum-এর অংশ, ডিম্বনালীর ফানেল আকৃতির প্রান্ত। সিলিয়া তথা Fimbrac-এর ওপর সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণিক চাবুক একই সময়ে ডিম্বকোষকে Infundibulum-এর দিকে

চলনে সহযোগিতা করে। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উভয়ের প্রদর্শিত নড়াচড়া ব্যতিরেকে নিষিক্তকরণ সংগঠিত হওয়া সম্ভব নয়। কুরআন মাজিদের শব্দ 'আল মাউদ্ দাফিক্ব' এভাবে দ্রুতবেগে নির্গমন, স্বেচ্ছানির্গমন, এবং এই উপধাপের চলাচল সংক্রান্ত ঘটনাবলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

মুজিজা : ৭১

কুরআন মাজিদের শব্দ 'সুলালা'

তারপর তিনি (আল্লাহ) তার (মানুষের) বংশধর সৃষ্টি করেছেন 'সুলালা' (তুচ্ছ পানির নির্যাস) থেকে। (সাজদাহ, ৩২ : ০৮)

আর আমি অবশ্যই মানুষকে 'সুলালা' (মাটির নির্যাস) থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি (আল্লাহ) নুতফারূপে সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। (মুমিনুন, ২৩ : ১২-১৩)

আরবি শব্দ 'সুলালা'র তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে। এর অর্থ একটি তরলের সাধারণ নির্যাস, স্বল্প পরিমাণ তরল ও একটি মৎস্য সদৃশ কাঠামো। উল্লেখ্য যে, মানুষের শুক্রাণু একটি লম্বা আকৃতির মাছের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। অধিকন্তু প্রত্যেক বীর্যপাতের সময় ৩০০ থেকে ৪০০ মিলিয়ন শুক্রাণু নির্গত হয়। যা থেকে কেবল ২০০টি শুক্রাণু ৫ মিনিটের মধ্যে নিষিক্তকরণ অঞ্চলে পৌঁছে যায়। সেসব থেকে কেবল একটি শুক্রাণুকেই ডিম্বাণুর সঙ্গে নিষিক্তকরণের জন্য নিংড়ে নেওয়া হয়। অধিকন্তু শুক্রাণুগুলো সামান্য পরিমাণ তরলের রূপ ধারণ করে, যা ৩.৫ থেকে ৫.০ মিলিমিটারের বেশি নয়। অতএব কারণে কুরআনের 'সুলালা' শব্দটি কেবল যথার্থ বর্ণনাই প্রদান করে না, বরং এই উপধাপের অঙ্গসংস্থান এবং শরীরতাত্ত্বিক গঠনকেও নির্দেশ করে। আরও উল্লেখ্য যে, কুরআন মাজিদ এই ধাপে কেবল পুরুষের বীর্য সম্পর্কে নির্দেশ করে। আর তাও ভ্রূণবিদ্যার সাম্প্রতিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

মুজিজা : ৭২

কুরআন মাজিদের পারিভাষিক শব্দ 'নুতফা'

মানুষ ধ্বংস হোক, সে কতই না অকৃতজ্ঞ! তিনি (আল্লাহ) তাকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? 'নুতফা' (শুক্রবিন্দু) থেকে তিনি (আল্লাহ) তাকে সৃষ্টি করেছেন। (আবাসা, ৮০ : ১৭-১৯)

এই আয়াতগুলো আমাদেরকে মানুষের প্রাথমিক উপাদান সম্পর্কে তথ্যের যোগান দেয় যে, 'নুতফা'ই হল একটি নবজাত শিশু সৃষ্টির মূল উপাদান। আরবি শব্দ 'নুতফা'-এর অর্থ হল, একটি ফোঁটা কিংবা অল্প পরিমাণ তরল। বর্তমানে এই বিষয়টি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, 'নুতফা' হল পুরুষের শুক্রাণু ও মহিলার ডিম্বাণুর সমন্বয়ে গঠিত স্বল্প পরিমাণ তরল এবং এই তরলটিই নবগঠিত মানবদেহের মূল উপাদান।

মুজিজা : ৭৩

কুরআন মাজিদের পরিভাষা 'নুতফাতুন আমশায'

আমি (আল্লাহ) মানুষকে সৃষ্টি করেছি 'নুতফাতুন আমশায' (মিশ্র শুক্রবিন্দু) থেকে, আমি তাকে পরীক্ষা করব। (ইনসান, ৭৬ : ০২)

ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, 'নুতফা' হল একটি ফোঁটা। পক্ষান্তরে 'আমশায' শব্দের অর্থ হল, একটি মিশ্রণ। অতএব এই শব্দটি পুরুষ ও মহিলার বীর্যপাতের উপাদানগত মিশ্রণকে নির্দেশ করে। ভ্রূণবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক জ্ঞান অনুসারে সাধারণত এই মিশ্রণ সংগঠিত হয় ডিম্বনালীর উপরের এক তৃতীয় অংশে এবং খুব কমই জরায়ুর অভ্যন্তরে। তা পরে জাইগোট সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য, 'নুতফা' শব্দটি একটি একবচন বিশেষ্য। পক্ষান্তরে 'আমশায' হল বিশেষণ, যা বহুবচনের শব্দ নির্দেশ করে। এভাবে 'নুতফাতুন আমশায' শব্দদ্বয় দু'টি তরল উপাদানের মিশ্রণ এবং

ভ্রূণবিকাশের এই উপপর্যায়ে একটি জাইগোটের গঠনকে যথাযথভাবে বর্ণনা করে।

মুজিজা : ৭৪

কুরআন মাজিদের পরিভাষা 'কারারিম মাকিন'

> **তারপর আমি তাকে 'নুতফা' রূপে 'কারারিম মাকিন' (সুরক্ষিত আধার)-এ স্থাপন করেছি।** (মুমিনুন, ২৩ : ১৩)

আরবি শব্দ 'ক্বারার'-এর অর্থ অবস্থান। আর 'মাকিন' শব্দের অর্থ সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত। ভ্রূণবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক জ্ঞানের ভিত্তিতে, 'কারার' শব্দটি জরায়ুর সঙ্গে একটি বিকাশমান ভ্রূণের সম্পর্ককে নির্দেশ করে এবং 'মাকিন' শব্দটি মায়ের শরীরের সঙ্গে জরায়ুর সম্পর্ক নির্দেশ করে। নিষিক্ত হওয়ার সাত থেকে নয় দিন পর Blastocyst জরায়ুর দিকে সরে আসে এবং তার দেয়ালের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়ে যায়। এটিই সেই স্থান যেখানে অধিকতর কোষ বিভাজন এবং পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়। এটি খুবই জরুরি যে, Blastocyst জরায়ুর একটি নির্দিষ্ট স্থানে পূর্ণরূপে

স্থাপিত হবে এবং সেই স্থানও ভালভাবে সংরক্ষিত হবে। নতুবা তা স্খলিত হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, যেমনটি হয়ে থাকে উদরস্থিত কিংবা tubal গর্ভধারণের ক্ষেত্রে। এতদুভয় ধারণাই কুরআন মাজিদের শব্দ 'কারারিম মাকিন'-এর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

মুজিজা : ৭৫

কুরআন মাজিদের পরিভাষা 'কাদ্দারাহু'

> **মানুষ ধ্বংস হোক, সে কতই না অকৃতজ্ঞ! তিনি (আল্লাহ) তাকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? 'নুতফা' থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ('ফা') তিনি 'কাদ্দারাহু' (তাকে সুগঠিত করেছেন)।** (আবাসা, ৮০ : ১৭-১৯)

একটি নতুন মানব দেহ সৃষ্টির সূচনা হয় একটি জাইগোট গঠনের মাধ্যমে। এটি ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম ও প্রায় ৮মিলিয়ন ভিন্ন ভিন্ন জিন দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক ক্রোমোজমেরই নির্দিষ্ট সেটের জিন রয়েছে, যা নবজাতকের সুপ্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ বহন করে। পুরুষ ও মহিলার জিন বিনিময় যা, পারস্পরিক alleles pair নামে পরিচিত। প্রতিটি জিনেরই একটি পরিমাণগত কিংবা গুণগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যখন জিনের পারস্পরিক জোড়া বিনিময় হয় তখন নবজাতকের বৈশিষ্ট্য গঠন হয়। যদি জিনের মধ্যে কোনো গুণগত বৈশিষ্ট্য থাকে, প্রবল বৈশিষ্ট্যটি দুর্বল বৈশিষ্ট্যটিকে পরাস্ত করে এবং কেবল প্রবল বৈশিষ্ট্যই নবজাতকের দেহে দেখা যায়। যদি জিনটির কোনো পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য থাকে, পুরুষ ও মহিলার জিন পরস্পর মিশ্রিত হয়ে মধ্যবর্তী চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে। এভাবে কার্যক্রমের একটি জটিল প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়, যা নবজাতকের মধ্যে সকল প্রকার চরিত্রবৈশিষ্ট্য গঠন ও প্রকাশ ঘটায়। উল্লেখ্য যে, ভ্রূণতত্ত্ববিদরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত একটি প্রজনন পরিকল্পনার ধারণার বর্ণনা দিতে পারে নি।

এটি কুরআন মাজিদের একটি মুজিজা যে, তা এই ঘটনা বর্ণনার জন্যে 'কাদ্দারাহ' শব্দ ব্যবহার করেছে। 'কাদ্দারাহ' শব্দটি মূল শব্দ 'কাদারা' থেকে উদ্ভুত। যার অর্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন বা কার্যক্রম বিন্যস্ত করা। কুরআন মাজিদ এভাবে জিনের প্রকাশ ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য গঠনের বিষয় বহুপূর্বে সপ্তম শতাব্দীতে সুদৃঢ়ভাবে বর্ণনা করেছে। পক্ষান্তরে ভ্রূণবিশারদরা তা আবিষ্কার করেছে বিংশ শতাব্দীতে। আরো উল্লেখ্য যে, এই গঠন-প্রক্রিয়া হয় খুব দ্রুত এবং তা allelic জিন বহনকারী বিনিময়কৃত ক্রোমোজমগুলির পাশাপাশি অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হয়। কুরআন মাজিদ 'ফা' অব্যয় ব্যবহারের মাধ্যমে এই বিষয়টির যথাযথ বর্ণনা প্রদান করেছে, যা অব্যবহিত পরম্পরাগত পরিবর্তন নির্দেশ করে।

মুজিজা : ৭৬

কুরআনি পরিভাষা 'হারছ'

> **তোমাদের স্ত্রী তোমাদের 'হারছ' (শস্যক্ষেত্র)। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে গমন কর, যখন এবং যেভাবে চাও।** (বাকারা, ০২ : ২২৩)

এই আয়াতগুলি মানব বিকাশের বৈজ্ঞানিক সত্যকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করে; কিভাবে একটি জীবনের বীজ একজন পরিপূর্ণ মানুষরূপে বিকশিত হয়। উপরে বর্ণিত উপ-পর্যায়গুলি শেষ হওয়ার পর জাইগোটটি জরায়ু নালী থেকে জরায়ুতে স্থানান্তরিত হয় এবং তা জরায়ুর দেওয়াল স্থাপিত হয়, যেমনটি বীজ মাটির ভেতর বপন করা হয়। এটিই 'নুতফা'র সর্বশেষ পর্যায়। কুরআন মাজিদ 'হারছ' শব্দ দ্বারা এটিকে নির্দেশ করে। আভিধানিক অর্থে 'হারছ' শব্দটি মাটি চাষ করা বুঝায়। এখানে তার সঙ্গে সাদৃশ্য হল,

জরায়ুর দেওয়াল মাটিসদৃশ। আর জাইগোট সেই বীজের মত যা তাতে বপন করা হয়েছে। অধিকন্তু বীজ যেমনটি মাটি থেকে পুষ্টি আহরণ করে এবং একটি চারাগাছে পরিণত হয়, তেমনিভাবে জাইগোট জরায়ুর ভেতর দিয়ে পুষ্টি আহরণ করে এবং একজন মানুষের আকৃতি লাভ করে।

বিকাশের 'তাখলিক' পর্যায় :

এটি মানব ভ্রূণ বিকাশের দ্বিতীয় প্রধান পর্যায়। বিভিন্ন অঙ্গে ও তন্ত্রে কোষের বিভাজন ও পৃথকীকরণ এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এটি আরম্ভ হয় তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম থেকে এবং অব্যাহত থাকে অষ্টম সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত। ইতোপূর্বে উল্লিখিত আয়াতসমূহ (সুরা ২৩ : ১২-১৪) অনুসারে এই পর্যায়টি নিম্নলিখিত উপপর্যায়সমূহ নিয়ে গঠিত : 'আলাকা', 'মুদগা', 'ইযাম' ও 'লাহম'। নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে দেখা যাবে, কুরআন মাজিদের এ সকল পরিভাষা সাম্প্রতিক আবিস্কৃত মানব ভ্রূণবিকাশের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। প্রতিটি শব্দই অত্যন্ত যথার্থ ও ব্যাপক ভঙ্গিতে ভ্রূণবিজ্ঞানের এক একটি সুনির্দিষ্ট উপধাপকে নির্দেশ করে। আর তা ভ্রূণবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক জ্ঞানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। এভাবে প্রতিটি শব্দই কুরআন মাজিদের একেকটি মুজিজা তুলে ধরে।

মুজিজা : ৭৭

'আলাকা' উপপর্যায়

> **আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর (ছুম্মা) আমি তাকে শুক্ররূপে (নুতফা) সংরক্ষিত আধারে (জরায়ুতে) স্থাপন করেছি। পরবর্তীতে (ছুম্মা) নুতফাকে আমি 'আলাকা'য় (রক্তপিণ্ডে) পরিণত করি।** (মুমিনুন, ২৩ : ১২-১৪)

এই পর্ব শুরু হয় ১৫ তম দিনে এবং শেষ হয় ২৩/২৪তম দিনে। আরবি ভাষায় 'আলাকা' শব্দের তিনটি অর্থ রয়েছে। তা এমন এক বস্তুকে নির্দেশ করে, যা কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত কিংবা কিছুর সঙ্গে ঝুলানো। তার আরেক অর্থ জোঁক, যা পানিতে বাস করে এবং অন্যান্য প্রাণীর রক্ত চোষে জীবন ধারণ করে। তার অন্য একটি অর্থ, একটি ঘন রক্তপিণ্ড।

ভ্রূণতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন মাজিদের শব্দ 'আলাকা' এই ধাপের ভ্রূণবিকাশের অঙ্গসংস্থান সংক্রান্ত স্তরকে যথাযথভাবে পরিব্যপ্ত করে। কুরআন মাজিদে 'আলাকা' শব্দটি নিম্নলিখিত আরো চারটি স্থানে উল্লিখিত হয়েছে :

> **হে মানুষ, যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দেহে থাক তবে নিশ্চয় জেনে রেখো, আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্র থেকে, তারপর 'আলাকা' থেকে।** (হজ, ২২ : ০৫)
>
> **তিনিই (আল্লাহ) তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তারপর শুক্রবিন্দু থেকে তারপর 'আলাকা' থেকে।** (গাফির, ৪০ : ৬৭)
>
> **মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনকি ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি বীর্যের শুক্রবিন্দু ছিল না, যা স্খলিত হয়? অতঃপর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন।** (কিয়ামা ৭৫ : ৩৬-৩৮)
>
> **পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাকা' থেকে।** (আলাক, ৯৬ : ০১-০২)

আধুনিক ভ্রূণবিজ্ঞান অনুসারে, 'নুতফা' খুব দ্রুত একটি blastocyte- এ পরিণত হয় এবং তা নিজেকে একটি বৃন্তের সহযোগিতায় জরায়ুর বহিঃত্বকে প্রতিস্থাপিত করে, যা পরবর্তীতে umbilical cord-এ রূপান্ত রিত হয়। এই প্রতিস্থাপন শুরু হয় ৬ষ্ঠ দিনে এবং দশ দিনের মধ্যে তা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। প্রতিস্থাপনের এই প্রক্রিয়া 'আলাকা'-এর প্রথম অর্থকে নির্দেশ করে, অর্থাৎ কোনো কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত কিংবা কোনো কিছুতে ঝুলন্ত। ভ্রূণ তখন তার গোলাকৃতি হারিয়ে ফেলে। এটি দীর্ঘায়িত হয় এবং

জোঁকের আকৃতি ধারণ করে। একই সময়ে তা মায়ের রক্ত থেকে তার পুষ্টি আহরণ করতে শুরু করে। অধিকন্তু তা পরবর্তীতে amniotic fluid দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, ঠিক যেমনটি জোঁক পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। কুরআন মাজিদের শব্দ 'আলাকা'- বিকাশের এই ধাপকে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। 'আলাকা'-এর তৃতীয় অর্থ তথা রক্তপিণ্ডও ভ্রূণের বাহ্যিক আকৃতির সঙ্গে যথাযথভাবে প্রযোজ্য হয়। অতএব 'আলাকা' শব্দটি ভ্রূণবিকাশের দ্বিতীয় প্রধান পর্যায় 'তাখলিক'-এর প্রথম উপধাপ বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিক সার্বজনীন ও যথার্থ অভিব্যক্তি।

মুজিজা : ৭৮

'মুদগা' উপ-পর্যায়

> **হে মানুষ, যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দেহে থাক তবে নিশ্চয়ই জেনে রাখ, আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর 'নুতফা' থেকে, তারপর 'আলাকা' থেকে। পরবর্তীতে 'মুদগা মুখাল্লাকা' (পূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট গোশত) থেকে এবং 'গায়রি মুখাল্লাকা' (অপূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট গোশত) থেকে তোমাদের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করার নিমিত্তে।** (হজ, ২২ : ০৫)

'আলাকা' উপপর্যায় শেষ হয় ২৪-২৫ দিনের মধ্যে। অতঃপর ভ্রূণটি ২৬-২৭ তম দিনে মুদগাতে পরিবর্তিত হয়। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'মুদগা' শব্দের কতিপয় অর্থ রয়েছে। প্রথম অর্থ, 'দাঁতে চর্বনকৃত কোনো বস্তু'। দ্বিতীয় একটি অর্থ, 'একটি ছোট পদার্থ'। তৃতীয় অর্থ 'একটি ছোট গোশতের টুকরা'। ইউসুফ আলী তার তাফসিরে 'মুদগা' শব্দের তরজমা করেছেন, গোশতের টুকরা। পক্ষান্তরে, মুহাম্মদ আসাদ, মরিস বুকাইলি প্রমুখ তার একটি উন্নততর অনুবাদ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ 'একটি চর্বিত টুকরা'।

ভ্রূণবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণায় এই স্তরের ভ্রূণের পরিবর্তনকে কুরআন মাজিদের শব্দ 'মুদগা'র মাধ্যমে বর্ণনা করার যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে।

যেহেতু একটি ভ্রূণ জরায়ু থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে, তাই তার বৃদ্ধি ঘটে একটি দ্রুত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এর কোষগুলো একটি গুটি সদৃশ আকৃতি ধারণ করে এবং মনে হয় তা এমন একটি বস্তু যাতে দাঁতের ছাপ রয়েছে। পরবর্তীতে ভ্রূণটি তার অবস্থান পরিবর্তন করে তার ভরকেন্দ্র পরিবর্তিত হওয়ার কারণে। যা দেখতে চর্বিত টুকরার মত। এ সকল পরিবর্তন 'মুদগা'র প্রথম অর্থের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।

এই ধাপে একটি ভ্রুণ থাকে খুবই ছোট। দৈর্ঘ্যে আনুমানিক ১ সেন্টিমিটার। উল্লেখ্য যে, 'আলাকা'র উল্লিখিত পূর্ববর্তী পর্যায়ে তা একটি 'মর্সেল'-এর সমান আকৃতি লাভ করে না, কেননা তা দৈর্ঘ্যে ৩.৫ মিলিমিটারের বেশি নয়। এটি 'মুদগা'-এর দ্বিতীয় অর্থ তথা একটি ছোট বস্তুকণিকা'-এর সঙ্গে সঙ্গতি রাখে।

'মুদগা'-এর তৃতীয় অর্থ অর্থাৎ, মর্সেল সদৃশ এক টুকরো গোশত- তা এই স্তরের ভ্রূণের আকৃতি প্রকৃতির বিচারে প্রযোজ্য। এ কারণে এ স্তরের জন্য কুরআন মাজিদ ব্যবহৃত পরিভাষা 'মুদগা' শব্দটি ভ্রূণতত্ত্ববিদদের ব্যবহৃত পরিভাষা somite থেকেও অধিক বেশি যথার্থ ও ব্যাপক। এ শব্দটি একটি ভ্রূণের বহিঃস্থ অবস্থার যেমন যথার্থ বর্ণনা প্রদান করে তেমনি এই ধাপের অন্তঃস্থ বিকাশেরও বর্ণনা দেয়। স্মর্তব্য যে, এমনকি বিগত কয়েক বছর পূর্বেও এ বিষয়গুলি মানুষের জানা ছিল না। কুরআন মাজিদ কেবল এই পরিবর্তনগুলির পর্যায়ক্রমই বর্ণনা করে নি; বরং এই পরিবর্তনগুলির ধরন এবং আকৃতিরও বর্ণনা দিয়েছে। নিঃসন্দেহে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই জ্ঞানের উৎস সর্বজ্ঞাতা ও জ্ঞানময় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আসমানি প্রত্যাদেশ বা ওহি।

মুজিজা : ৭৯

'ইযাম' উপ-পর্যায়

> **অতঃপর (ছুম্মা) 'নুতফা'কে আমি (আল্লাহ) 'আলাকা'য় পরিণত করি। তারপর (ফা) 'আলাকা'কে 'মুদগা'য় রূপান্তরিত করি। তারপর (ফা) 'মুদগা'কে 'ইযাম'-এ (হাড়, মেরুদণ্ড, কঙ্কাল ইত্যাদিতে) পরিণত করি। তারপর (ফা) হাড়কে গোশত দিয়ে আবৃত করি।** (মুমিনুন, ২৩ : ১৪)

'মুদগা' পর্যায়ে ৬ষ্ঠ সপ্তাহ পর্যন্ত ভ্রুণের বিকাশ অব্যাহত থাকে। এ পর্যায়ে কোনো স্পষ্ট মানবাকৃতি দেখা যায় না। পঞ্চম সপ্তাহের সূচনা থেকে কোমলাস্থি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই আয়াত পরিষ্কারভাবে বলে, 'ইযাম'-এর পর্যায় শুরু হয় 'মুদগা' পর্যায়ের পরে। অধিকন্তু 'ফা' অব্যয়টি নির্দেশ করে যে, এই গঠন প্রক্রিয়া অনতিবিলম্বে দ্রুত সম্পাদিত হয়ে থাকে। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, কুরআন মাজিদের সকল তথ্যই ভ্রুণবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিস্কৃত অধিকাংশ তথ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

মুজিজা : ৮০

কুরআন মাজিদের পরিভাষা 'সাওয়াকা'

> **হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে ধোঁকা দিয়েছে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (ফা) তিনি 'সাউওয়াকা' (তোমাকে মসৃণ ও সোজা করেছেন)। অতঃপর (ফা) তোমাকে সুসামঞ্জস্য করেছেন।** (ইনফিতার, ৮২ : ০৬-০৭)

অঙ্গসংস্থান (Organogenesis) সম্পন্ন হয় 'ইযাম' ধাপে। অতঃপর ভ্রূণের সাধারণীকৃত কোষগুলো পৃথক হতে শুরু করে এবং কার্যকরী মাংসপেশী ও অস্থিসম্পর্কীয় দল গঠন করে। এটি এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে,

শুরুতে ভ্রুণ থাকে ‘C’ আকৃতির। অতঃপর তা সপ্তম সপ্তাহে সোজা ও দীর্ঘায়িত হয় এবং বাহ্যত একটি খুব মসৃণ ও খুব সোজা আকৃতি ধারণা করে। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, কুরআন মাজিদ এমন একটি সূক্ষ্ম কিন্তু সুস্পষ্ট ভ্রুণবিকাশের স্তরকে ‘সাওয়াকা’ শব্দ ব্যবহার করে উল্লেখ করেছে। যার অর্থ মসৃণ কিংবা সোজা।

মুজিজা : ৮১

‘লাহম’ উপ-পর্যায়

> **অতঃপর (ছুম্মা) ‘নুতফা’কে আমি (আল্লাহ) ‘আলাকা’য় পরিণত করি। তারপর (ফা) ‘আলাকা’কে ‘মুদগা’য় রূপান্তরিত করি। তারপর (ফা) ‘মুদগা’কে ‘ইযাম’-এ (হাড়, মেরুদণ্ড, কঙ্কাল ইত্যাদিতে) পরিণত করি। তারপর (ফা) হাড়কে গোশত দিয়ে আবৃত করি।** (মুমিনুন, ২৩ : ১৪)

এখানে কুরআন মাজিদ সুস্পষ্টভাবে বলে, ভ্রূণগত হাড় গঠিত হয় ‘মুদগা’ পর্যায়ের পরে। অতঃপর মাংসপেশী দ্বারা আবৃত হয়। এটি পরবর্তীতে ভ্রূণকে জরায়ুর অভ্যন্তরে নড়াচড়ায় সাহায্য করে। এই ধাপ শুরু হয় সপ্তম সপ্তাহের সমাপ্তির পর এবং অষ্টম সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। ভ্রূণবিকাশের দ্বিতীয় প্রধান পর্যায় অর্থাৎ, ‘তাখলিক’-এই ধাপের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। যা শেষ হয় ভ্রূণ বিকাশের অষ্টম সপ্তাহের সমাপ্তির মাধ্যমে। এরপরে ভ্রূণ তৃতীয় এবং সর্বশেষ পর্যায় তথা ‘নাশআ’ বা বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করে। এ কারণে কুরআন মাজিদ এ ক্ষেত্রে ‘ছুম্মা’ সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করেছে, যা ‘তাখলিক’ ও ‘নাশআ’- ভ্রূণ বিকাশের এই দুই প্রধান পর্যায়ের মাঝখানে একটি সময়ের ব্যবধান নির্দেশ করে।

মুজিজা : ৮২

নবজাতকের লিঙ্গ নির্ধারণ

> **অতঃপর (ছুম্মা) সে (নবজাতক) আলাকায় পরিণত হয়। তারপর (ফা) আল্লাহ তাকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেন এবং সুবিন্যস্ত করেন। অতঃপর (ফা) তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন দুই ধরনের লিঙ্গ-পুরুষ ও মহিলা।** (কিয়ামা ৭৫ : ৩৮-৩৯)

প্রফেসর কিথ মুর তার ভ্রূণতত্ত্বের পাঠ্যবই ‘The Developing Human, 1912, P.272’ -এর মধ্যে এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করেন এভাবে : ভ্রূণতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সপ্তম সপ্তাহ পর্যন্ত নবজাতকের লিঙ্গের অঙ্গসংস্থানগত লক্ষণ দেখা যায় না, যখন পুরুষের অণ্ডকোষ এবং মহিলার ডিম্বকোষ গঠিত হয়। যৌন অঙ্গসমূহের বিকাশ শুরু হয় চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রথম দিকে। এটি উপরোল্লিখিত কুরআন মাজিদের বর্ণনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ যে, যৌনাঙ্গের বিকাশ শুরু হয় হাড় ও মাংসপেশী গঠিত হওয়ার পর।

‘নাশআ’ বা বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়

মুজিজা : ৮৩

‘নাশআ’ পর্যায়

> **...অতঃপর (ছুম্মা) আমি আনশা’নাহু (তাকে গড়ে তুলি) ‘খালকান আখারা’ (অন্য এক সৃষ্টি রূপে)। অতএব, সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়।** (মুমিনুন, ২৩ : ২১)

‘নাশআ’ বা চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হয় নবম সপ্তাহে এবং গর্ভধারণের শেষ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এ পর্যায়ে ভ্রুণ মানব আকৃতি প্রদর্শন করে। ভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে ‘নাশআ’ শব্দের কতিপয় অর্থ রয়েছে। যথা : আরম্ভ করা, জন্মানো, বৃদ্ধি করা, উঠা ইত্যাদি। বস্তুত ভ্রুণ এর সবকটি পরিবর্তনের ভেতর দিয়েই অতিবাহিত হয়। প্রথম অর্থ, আরম্ভ করা– তা বিভিন্ন শারীরিক অঙ্গ ও তন্ত্রের ক্রিয়াতৎপরতা শুরু করার বর্ণনা দেয়। দ্বিতীয় অর্থ তথা জন্মানো– তা বিভিন্ন অঙ্গের দ্রুত বিকাশের প্রতি নির্দেশ করে। তৃতীয় অর্থ তথা বৃদ্ধি করা– তা ভ্রুণের আকৃতি ও ওজন বৃদ্ধির বর্ণনা দেয়। অতএব, কুরআন মাজিদের শব্দ ‘নাশআ’ এ সকল পরিবর্তন বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিক উপযুক্ত ও সার্বজনীন।

মুজিজা : ৮৪

কুরআন মাজিদের পরিভাষা ‘খালকান আখার’

> **‘....... অতঃপর (ছুম্মা) আমি (আল্লাহ) আনশা’নাহু (তাকে গড়ে তুলি) খালকান আখার (অন্য এক সৃষ্টিরূপে)। অতএব, সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়।** (মুমিনুন, ২৩ : ২৪)

Fetal কোষসমূহের দ্রুত বৃদ্ধি ও বিকাশ ভ্রুণের বৃদ্ধি ঘটায়, যা তখন একটি সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করে। এই নতুন রূপটিই উপরোল্লিখিত আয়াতে ‘খালকান আখার’ (অন্যসৃষ্টি) শব্দে ব্যক্ত হয়েছে। এই নতুন রূপটি

এখন সম্পূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তন্ত্রসমূহ নিয়ে গঠিত, আর তা একটি মানব আকৃতির রূপ লাভ করে।

স্মর্তব্য যে, পূর্বের বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, পুরুষের শুক্রাণুতে কিংবা মহিলার ডিম্বাণুতে একটি পূর্ণ আকৃতি বিশিষ্ট মানব-কায়া বিদ্যমান রয়েছে। কুরআন মাজিদ চৌদ্দশ বছরেরও অধিককাল পূর্বে বর্ণনা করেছে, একজন মানব শিশুর অঙ্গসংস্থানগত রূপ গঠনের সূচনা প্রাথমিকভাবে দৃষ্টিগোচর হয় ভ্রুণবিকাশের সর্বশেষ ধাপে এসে। ভ্রূণবিজ্ঞানীরা কেবল সম্প্রতিই ইলেক্ট্রন অনুবিক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তা আবিষ্কার করেছে।

মুজিজা : ৮৫

প্রসব বেদনা ও সন্তান প্রসব

> **মানুষ ধ্বংস হোক, সে কতই না অকৃতজ্ঞ! তিনি (আল্লাহ) তাকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? একটি 'নুতফা; থেকে তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে সুগঠিত করেছেন। পরবর্তীতে (ছুম্মা) তিনি তার পথ সহজ করে দিয়েছেন।** (আবাসা, ৮০ : ১৭-২০)

ভ্রূণ পূর্ণরূপে গঠিত হয় ষষ্ঠ মাসের শেষ দিকে। অতঃপর তা জরায়ুর উত্তাপের মধ্যে একটি সময়কাল অতিবাহিত করে। সকল দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তন্ত্রসমূহ এই সময় বিকশিত হয়। জরায়ু এ সময় তাকে বৃদ্ধির জন্যে পুষ্টি যোগায় এবং তা তাকে দ্রুত বড় করে তোলে। প্রসব পর্যন্ত এই ধাপ অব্যাহত থাকে, যখন ভ্রূণটি মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে। সাধারণত প্রসবের পথটি খুব সরু থাকে এবং বাহ্যত মনে হয় তা দিয়ে সন্তান প্রসব হওয়া খুব কষ্টসাধ্য হবে। যা হোক, প্রসবের সময় মায়ের শরীরে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক, শরীরতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে। এসব পরিবর্তন প্রসবের রাস্তা দিয়ে সন্তান নির্গমন ও তার নড়াচড়াকে মসৃণ ও নিষ্কন্টক করে তোলে। এসব পরিবর্তনের কতেক হল :

প্রসবের পথ প্রশস্ত হওয়ার জন্যে Pelvis joints (নিম্ন ঔদরিক গিঁটসমূহ) শিথিল হয়, প্রসবের রাস্তা আরও প্রসারিত হতে সহযোগিতার জন্য মাংসপেশীগুলি শিথিল হয়ে যায়। Amniotic তরল পদার্থ, যা ইতোপূর্বে ভ্রুণের চারপাশে ছিল তা প্রসবের পথকে পিচ্ছিল করে দেয়। আর ভ্রূণের মাথার খুলির হাড় ভ্রূণটিকে মায়ের গর্ভাশয় থেকে পৃথিবীতে আসতে আরো সহায়তা করে। কুরআন মাজিদ এই পুরো প্রক্রিয়াকেই এই আয়াত দ্বারা ব্যক্ত করেছে –'...তিনি তার পথ সহজ করে দিয়েছেন।'

বিগত আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়েছে যে, কুরআন মাজিদ গর্ভধারণের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া, পরিণত হওয়া ও প্রসবের পর্যায় পর্যন্ত মানব ভ্রূণবিকাশের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে। প্রথম. তা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির বর্ণনা দেয়। দ্বিতীয়. তা এ সকল ঘটনার ক্রমপরম্পরারও বর্ণনা প্রদান করে, যা ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে আবিস্কৃত কালুনুক্রমিক বিন্যাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। তৃতীয়. তা এ সকল পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সময়েরও বর্ণনা দেয়। সংঘটিত পরিবর্তন বা ঘটনাটি কি দ্রুত সংঘটিত হয়? না এর জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন এই পার্থক্য নির্দেশ করে। চতুর্থ. এটি এসব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক উপযুক্ত ও সার্বজনীন শব্দ ব্যবহার করে। প্রত্যেক শব্দই একটি নির্দিষ্ট ধাপের বর্ণনা দেয়, যার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সূচনা ও সমাপ্তি রয়েছে এবং যার আছে অঙ্গ-সংস্থানগত বা শরীরতত্ত্ব সম্পর্কিত বিশেষ স্বকীয়তা। ভ্রূণতত্ত্বের ওপর সাম্প্রতিক গবেষণাসমূহ কুরআন

মাজিদের এ সকল বর্ণনার সত্যতাকে প্রত্যয়ন করে। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা সেই মহিমান্বিত আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর প্রিয় রাসুলের ওপর এমন মুজিজাপূর্ণ ওহি অবতীর্ণ করেছেন, যা তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সম্পর্কিত এমন বিস্ময়পূর্ণ তথ্য ধারণ করে। সেই সুমহান আল্লাহ তাআলার প্রতি অজস্র কৃতজ্ঞতা যিনি তাঁর গ্রন্থে এমন সমুজ্জ্বল মুজিজাসমূহ গচ্ছিত রেখেছেন, যাতে মানবজাতির কাছে তাঁর সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ হিসেবে কুরআন মাজিদের ন্যায্যতার প্রশ্নে কোনোরূপ সন্দেহ না থাকে।

'হে লোক সকল, যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও তবে (ভেবে দেখ) আমি (আল্লাহ) তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি, পরবর্তীতে (ছুম্মা) বীর্য (নুতফা) থেকে, পরবর্তীতে (ছুম্মা) আলাকা (জমাট রক্ত) থেকে। এরপর (ছুম্মা) পূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণ আকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে। তোমাদের কাছে (আমার ক্ষমতাকে) প্রকাশ করার জন্য। আর আমি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই। এরপর (ছুম্মা) আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপরে (আমি তোমাদেরকে প্রতিপালন করি) যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পন কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান না থাকে। .... আর নিশ্চয় কিয়ামত (বিচার দিবস) অবশ্যম্ভাবী। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কবরে যারা আছে, তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। (হজ, ২২ : ০৫-০৭)

অষ্টম অধ্যায়

কুরআন মাজিদের রহস্য সংক্রান্ত মুজিজাসমূহ

কুরআন মাজিদের একটি অনন্য দিক হল, তা এমন অসংখ্য আয়াত ধারণ করে কার্যকারণ, যুক্তি কিংবা সাধারণ বোধের মাধ্যমে যেগুলির ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। কুরআন মাজিদ এমন কিছু ঘটনা বা বিষয়ের বর্ণনা দেয়, আরব

উপদ্বীপ কিংবা আরব সমাজের শারীরিক কিংবা পরিবেশগত অবস্থার সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই, যেখানে কুরআন মাজিদ সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়।

এটাও স্মর্তব্য যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রাপ্ত বয়সে কেবল একবারই দীর্ঘ সফর করেছেন, মক্কা থেকে সিরিয়ায়। কুরআন মাজিদে বর্ণিত ঘটনাগুলি না মক্কা থেকে সিরিয়া যাবার পথে দৃষ্টিগোচর হয়, আর না তা সিরিয়ায় দেখা যায়। অধিকন্তু, কুরআন মাজিদে এমন কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা ও সেসবের নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে কুরআন অবতরণের প্রাক্কালে আরব-সমাজ যে সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ বেখবর। তবে কুরআন মাজিদ এসব ঘটনার এমন যথার্থ ও সবিস্তার বিবরণ প্রদান করে, মনে হবে যেন তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষকৃত। তাছাড়া কুরআন মাজিদের প্রতিটি বর্ণনাই বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির সাম্প্রতিক গবেষণার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। এভাবে এসব বর্ণনা কুরআন মাজিদের রহস্য, যা কেবল আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুজিজা বলেই ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। নিম্নে কুরআন মাজিদের কিছু রহস্য তুলে ধরা হল :

মুজিজা-৮৬

সাগর তরঙ্গ

অথবা (অবিশ্বাসীদের অবস্থা) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ, যার ওপর আছে ঘন কালো মেঘ। অন্ধকার, একের ওপর এক। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না তার কোনো জ্যোতিই নেই। (নূর, ২৪ : ৪০)

উল্লেখ্য যে, মক্কা ও মদিনা, যেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনের পুরো সময়ই অতিবাহিত করেছেন, তা সমুদ্রের নিকটবর্তী ছিল না। অধিকন্তু তিনি তার পুরো জীবদ্দশায় কখনো সমুদ্র যাত্রা করেন নি। তথাপি সমুদ্র তরঙ্গ সম্পর্কে তাঁর এই বর্ণনা বাস্তবতার অধিক নিকটবর্তী।

গ্রে মিলার (Gray Miller) তাঁর The Amazing Quran' নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত ছোট ঘটনাটি বর্ণনা করেন, 'একজন মুসলিম এক সমুদ্র-বণিককে কুরআন মাজিদের একটি কপি দেয়। লোকটি ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানত না। যখন সে কুরআন মাজিদ পাঠ শেষ করল, সে তার মুসলমান বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল, 'এই লোক, (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি একজন নাবিক ছিলেন? যখন তাকে বলা হল, তিনি সবসময় একটি মরুময় এলাকায় বসবাস করতেন এবং সম্ভবত সমগ্র জীবনে তিনি একবারের জন্যও সমুদ্র দেখেন নি। তখন লোকটি সেখানেই কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। সে স্বীকার করল, কুরআন মাজিদের এই বর্ণনা কেবল তিনিই দিতে পারেন যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে সামুদ্রিক ঝড় প্রত্যক্ষ করেছেন। অথচ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো তা প্রত্যক্ষ করেন নি।

আরও লক্ষনীয়, এই আয়াতটি একটি গভীর সমুদ্রের অবস্থা বর্ণনা করে, যাতে রয়েছে বড় বড় ঢেউ, অন্য বড় বড় ঢেউয়ের উপর, একটির ওপর অন্যটি। মানুষ এই বিষয়টি দেখতে পেয়েছে সাবমেরিন আবিষ্কারের পর। সর্বপ্রথম নিউক্লিয়ার সাবমেরিন আবিষ্কৃত হয় ১৯৫৪ সালে। তখনই সর্বপ্রথম গভীর সমুদ্রের তরঙ্গ-রহস্য অবলোকন করা সম্ভব হয়। তখনই জানা যায়, সমুদ্রের উপরিভাগের নিচে যে পানি রয়েছে তা স্থির ও শান্ত নয়। সাগরের নিম্নদেশেও ঢেউ আবিস্কৃত হয়, যাকে বর্তমানে গভীর সমুদ্রস্রোত নামে অভিহিত করা হয়। যেগুলি একটির ওপর অপরটি প্রবাহিত হয়। প্রায়ই সেগুলি এত উন্মত্ত হয় যে, সাগরের তলদেশের মাটি একস্থান থেকে অন্যস্থানে সরিয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ব্যাতীত আর কে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সমুদ্র তলদেশের এই তথ্য দান করেছেন?

মুজিজা-৮৭

নদী ও সমুদ্রের পানির মিশ্রণ

তিনিই সমান্তরালে দুই পানির ধারা প্রবাহিত করেছেন। একটি সুস্বাদু ও মিষ্ট আর অপরটি লবণাক্ত ও বিস্বাদযুক্ত। আর তিনি উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়, একটি দুর্ভেদ্য অন্তরায়। (ফুরকান, ২৫ : ৫৩)

এই আয়াতের একটি ব্যাখ্যা হল, কুরআন মাজিদ এখানে সাগরের পানির সঙ্গে নদীর পানির মিশ্রণের বিবরণ দিচ্ছে। উভয় প্রকারের পানি দেখতে একই; কিন্তু নদীর পানি সুমিষ্ট ও সুস্বাদু এবং সমুদ্রের পানি লবণাক্ত ও বিস্বাদ। তাছাড়া কোনো মানুষই এই দুই ধরনের পানির স্রোতের মাঝে এমন সূক্ষ্ম বিভেদরেখা টানতে সক্ষম নয়।

আমাদের আরও স্মরণ রাখতে হবে, পুরো আরব উপদ্বীপে কোনো নদী বলতে নেই। ফলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এমন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করার কোনো ধরনের সুযোগ ঘটে নি। বলাবাহুল্য, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কোনো বিষয়ে যথাযথ ধারণা বা কল্পনা করতে পারেন না, যা তিনি তার পুরো জীবনে কখনো প্রত্যক্ষ করেন নি। এই আয়াতটি কুরআন মাজিদ প্রকৃতিগতভাবে আসমানি গ্রন্থ হওয়ার এক অনন্য স্মারক।

কুরআন মাজিদের উপরোক্ত আয়াত বলে, 'আল্লাহ তাআলা দুইটি সমুদ্রকে সমান্তরালে প্রবাহিত করেছেন....এবং উভয়ের মাঝখানে একটি অন্তরায় রয়েছে।' বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন, উভয় প্রকারের পানির স্রোতের মধ্যে লবণাক্ততা, ঘনত্ব, ও তাপমাত্রার তারতম্য রয়েছে। তারা এও আবিষ্কার করেছেন, যখন পানি উপরের স্রোত থেকে নিচের স্রোতে প্রবেশ করে কিংবা বিপরীতক্রমে প্রবাহিত হয়, তখন তৎক্ষণাৎ তার অবস্থা অন্য স্রোতের পানির অনুসরণে বদলে যায়। এভাবে সেখানে দু'ধরনের পানি স্বাধীনভাবে মিশে যায়; কিন্তু উভয়ে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখে।

বিজ্ঞানীরা তা আবিষ্কারের শত শত বছর পূর্বে কুরআন মাজিদ এমন একটি জটিল বিষয় শনাক্ত করেছে।

মুজিজা-৮৮

লুত সম্প্রদায়ের আজাব

> **যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লুতের কাছে আগমন করল, তখন তাদের কারণে তিনি বিষণ্ন হয়ে পড়লেন এবং তার মন তাদের (রক্ষার) ব্যাপারে সংকীর্ণ হয়ে গেল। তারা বলল, ভয় করবেন না এবং দুঃখ করবেন না। আমরা আপনাকে এবং আপনার পরিবার বর্গকে রক্ষা করবই। আপনার স্ত্রী ব্যাতীত, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের ওপর আকাশ থেকে আজাব নাজিল করব তাদের পাপাচারের কারণে। আমি (আল্লাহ) তাতে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি। (আনকাবুত, ২৯ : ৩৩-৩৫)**

এই আয়াতসমূহে লুত আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায়ের ওপর নাজিলকৃত আযাবের উল্লেখ রয়েছে। তারা সমকামিতার মত জঘণ্য অপরাধে অভ্যস্ত ছিল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের জনপদকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেন।

আয়াতগুলিতে স্পষ্ট নিদর্শন বলতে ‘সাদুম’ ও ‘গোমরাহ’ সম্প্রদায়ের জনপদগুলির ধ্বংসাবশেষকে বুঝানো হয়েছে, যা সম্প্রতি মৃত সাগরের কাছে আবিস্কৃত হয়েছে। ভৌগলিকরা দেখতে পেয়েছেন, অঞ্চলটি প্রচুর পরিমাণে গন্ধকে ভর্তি। ফলে সমগ্র অঞ্চলটিতে প্রাণী বা উদ্ভিদ কোনো ধরনের জীবনের অস্তিত্ব নেই। পুরো এলাকা সর্বাঙ্গীন ধ্বংসের একটি নিদর্শন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এভাবে এটি সকল যুগের মানুষের জন্য আল্লাহর শাস্তির একটি উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে আছে। বলাবাহুল্য, নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো অঞ্চলটি পরিদর্শন করেন নি। জনপদগুলির ধ্বংসের তথ্য জানার মতো তার কোনো মাধ্যম ছিল।

মুজিজা-৮৯

সাদুম ও গোমরাহ সম্প্রদায়ের জনপদ

> **আপনার প্রাণের কসম (হে নবী,) নিশ্চয় তারা (লুত সম্প্রদায়) আপন নেশায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরপাক খাচ্ছিল। অতঃপর সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে একটি বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করল। অতঃপর আমি (আল্লাহ) তাদের (সাদুম গোত্রের) জনপদগুলিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের ওপর বর্ষণ করলাম পোড়ামাটির পাথর। নিশ্চয় এতে পর্যবেক্ষণকারীদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। আর নিশ্চয় তা (জনপদগুলি) রাজপথের পাশেই বিদ্যমান। নিশ্চয় এতে ঈমানদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। (হিজর, ১৫ : ৭২-৭৭)**

এই আয়াতগুলিতে কুরআন মাজিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদগুলির অধিক সুনিশ্চিত অবস্থানস্থলের নির্দেশনা প্রদান করে। এতে বর্ণিত হয়েছে সেগুলি রাজপথের পাশে অবস্থিত।

ভৌগলিকরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে, জনপদগুলি মৃত সাগরের দক্ষিণ পূর্বে, মক্কা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত একটি রাজপথের পাশে অবস্থিত। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যার ভূগোল সম্পর্কে তেমন কোনো জ্ঞান ছিল না, তথাপি এই আয়াতগুলি এমন এক বাস্তবতার কথা বলে যা কেবল সাম্প্রতিক ভূগোল বিশারদদের দ্বারাই আবিস্কৃত হয়েছে।

মুজিজা-৯০

‘আইকা’র অধিবাসী

অতঃপর ভূমিকম্প তাদের (অসতর্ক অবস্থায়) পাকড়াও করল। তারপর তারা তাদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। সেসব লোক যারা শুয়াইব আলাইহিস সালাম-কে মিথ্যাবাদী বলেছিল, মনে হয় যেন তারা সেখানে বসবাসই করেনি। যারা শুয়াইবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল তারাই ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। (আরাফ, ০৭ : ৯১-৯২)

আর নিশ্চয় আইকার অধিবাসীরা ছিল যালিম। অতএব আমি (আল্লাহ) তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম। আর এ (জনপদ) দু'টি উন্মুক্ত রাস্তার পাশেই বিদ্যমান। (হিজর, ১৫ : ৭৮-৭৯)

'আইকা' ছিল সেই সম্প্রদায় যেখানে নবী শুয়াইব আ. প্রেরিত হয়েছিলেন। ভৌগলিকরা সম্প্রতি এই জনপদ আবিষ্কার করেছেন সৌদি আরবের তাবুক শহরের সন্নিকটে। এখনও যে কেউ (এই ধ্বংসস্তুপ প্রত্যক্ষ করে) কুরআন মাজিদের এই আয়াতের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করতে পারে। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না ছিলেন একজন ভৌগলিক, না ছিলেন কোনো পর্যটক। এটি অধিক সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর এই তথ্য অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর যা তিনি কুরআন মাজিদের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন।

মুজিজা-৯১

হিজরের অধিবাসী

আর ছামুদের নিকট (আমি প্রেরণ করেছি) তাদের ভাই সালিহকে। সে বলল, 'হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। (আরাফ, ০৭ : ৭৩)

যারা অহংকার করেছিল তারা বলল, নিশ্চয় তোমরা যার প্রতি ঈমান এনেছ, আমরা তাকে অস্বীকার করি। ফলে ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল। তাই সকালে তারা তাদের গৃহে উপুড় হয়ে মরে রইল। (আরাফ, ০৭ : ৭৬-৭৮)

আর অবশ্যই হিজরের অধিবাসীরা (সালেহের কওম) রাসুলদেরকে অস্বীকার করেছে। আর আমি তাদেরকে আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম, তবে তারা তা থেকে বিমুখ হয়েছে। আর তারা পাহাড় কেটে বাড়ি বানাত, নিরাপদ ভেবে। কিন্তু অবশেষে ভোরের প্রাক্কালে এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করল। আর তারা যা উপার্জন করত তা তাদের কোনো কাজে আসল না। (হিজর, ১৫ : ৮০-৮৪)

ঐতিহাসিকরা বলেন, 'হিজর' ছিল ছামুদ সম্প্রদায়ের লোকদের প্রধান শহর। ধারণা করা হয়, তারা ছিল হযরত নুহ আ.-এর পঞ্চম অধঃস্তন বংশধর, যার ধ্বংসাবশেষ সম্প্রতি আবিস্কৃত হয়েছে আধুনিক শহর 'আল-উলা'র সন্নিকটে, যা সৌদি আরবের মদিনা থেকে তাবুক যাওয়ার পথে অবস্থিত। অষ্টম শতাব্দীর মহান পরিব্রাজক ইবনে বতুতা এই এলাকাটি ভ্রমণ করেন এবং লিখেন, 'আমি লাল পর্বতসমূহে খোদাই করা ছামুদ সম্প্রদায়ের লোকদের ভবনগুলি দেখেছি। সেগুলির চিত্রকর্মগুলি এতই উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন সেগুলি অতি সম্প্রতি সেখানে স্থাপন করা হয়েছে। এবং সেখানকার অধিবাসীদের জরাজীর্ণ অস্থিসমূহ এখনও তাদের ধ্বংসাবশেষে বিদ্যমান। এটি কুরআন মাজিদের একটি মুজিজা, যে কেউ এটির সত্যতা আজও স্বচক্ষে আবলোকন করতে পারে।

মুজিজা-৯২

'ইরাম' শহর

তুমি কি দেখনি তোমার রব কিরূপ আচরণ করেছেন আদ জাতির সঙ্গে? ইরাম (গোত্রের) সঙ্গে, যারা ছিল সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী? যাদের মত সৃষ্টির করা হয় নি কোনো দেশে? (ফজর, ৮৯ : ০৬-০৮)

কুরআন মাজিদের ভাষ্যকারগণ বলেন, 'আদ ইরাম' হল আদ জাতির প্রথম দিককার একটি গোত্র, যারা 'আদে উলা' বা পূর্ববর্তী আদ নামে পরিচিত। পূর্বেকার আরব ঐতিহাসিকদের কাছে তারা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সর্বপ্রথম কুরআন মাজিদই তাদেরকে উল্লেখ করেছে, এভাবে- 'আদ জাতি, যারা বসবাস করে ইরাম শহরে।'

National Geography পত্রিকার ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় একটি প্রাচীন শহর 'মলবা', যা ১৯৭৩ সনে সিরিয়ায় খননকার্যের মাধ্যমে আবিস্কৃত হয়েছে, তার ব্যাপারে একটি মজাদার বিবরণ দিয়েছে। শহরটি প্রায় তেতাল্লিশ শত বছরের প্রাচীন। ম্যাগাজিনটি আরও লিখেছে, শহরটিতে একটি লাইব্রেরি ছিল। তাতে পাশ্ববর্তী শহরগুলির একটি তালিকা ছিল, যাদের সঙ্গে এলবার অধিবাসীরা বাণিজ্য করত। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হল, সেই শহরগুলির তালিকায় 'ইরাম' নামক একটি শহরের নামও লিপিবদ্ধ ছিল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এমন একটি শহর সম্পর্কে জানতে পারেন যা ছিল তেতাল্লিশ শত বছরের পুরনো এবং যা অতি সম্প্রতি ১৯৭৩ সালে ভূতত্ত্ববিদদের মাধ্যমে আবিস্কৃত হয়েছে? আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কে তাঁকে এই জ্ঞান দান করেছেন?

মুজিজা-৯৩

আদ সম্প্রদায়ের অধিবাসী

> **আর স্মরণ কর আদ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের (হুদের) কথা, যখন সে আহকাফের স্বীয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল। আর এমন সতর্ককারী তার পূর্বে এবং পরেও গত হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের ওপর এক ভয়াবহ দিনের আজাবের আশংকা করছি।' তারা বলল, 'তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের থেকে নিবৃত করতে আমাদের নিকট এসেছ? তুমি যদি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও তাহলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো।'**

> **অতঃপর যখন তারা তাদের উপত্যকার দিকে মেঘমালা দেখল তখন তারা বলল, 'এ মেঘমালা আমাদেরকে বৃষ্টি দিবে।' (হুদ আ. বলল,) বরং এটি তা-ই যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। এ এক ঝড়, যাতে যন্ত্রণাদায়ক আজাব রয়েছে। ফলে তারা এমন (ধ্বংস) হয়ে গেল যে, তাদের আবাসস্থল ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এভাবেই আমি অপরাধী কওমকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।** (আহকাফ, ৪৬ : ২১-২২, ২৪-২৫)

কুরআন মাজিদের ভাষ্যকাররা বলেন, 'আদ সম্প্রদায়ের একটি অংশ প্রথম আজাব ও ধ্বংস থেকে বেঁচে গিয়েছিল এবং অন্যান্য শহরে বসতি স্থাপন করেছিল। তাদেরকে 'আদে উখরা' বা পরবর্তী আদ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। তারাও তাদের নবীদের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল এবং পূর্ববর্তী আদ জাতির ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

একটি আমেরিকান মুসলিম সাময়িকী ' The message' এর ১৯৯২ সালের মার্চ সংখ্যায় রিপোর্ট করা হয়, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার ভূতত্ত্ববিশারদদের একটি টিম সম্প্রতি আদ সম্প্রদায়ের শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছে। যারা ছিল ছামুদ সম্প্রদায়ের সমসাময়িক। কুরআন মাজিদ চব্বিশটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছে। বিশ্বের সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কেবল কুরআন মাজিদই এই শহর ও তার অধিবাসী সম্পর্কে কথা বলেছে। বাইবেলের পুরাতন ও নতুন সমাচার (Old and New Testaments) এদের সম্পর্কে নিরব। না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আর না যারা তার চারপাশে বসবাস করত তাদের কেউ কখনো মরুভূমির প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত সেই দূরবর্তী এলাকা সফর করেছিল। এমনকি যদি কেউ এই অঞ্চলটি সফর করেও থাকে, তবু সে এই শহর সম্পর্কে জানতে পারত না। কেননা, তা গভীর বালির নিচে চাপা পড়ে ছিল।

ইহুদি, খৃস্টান ও নাস্তিকরা বলে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই কুরআন মাজিদের রচয়িতা। যাহোক, কেউ এ কথার ব্যাখ্যা দিতে পারে না যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অভাবিত জ্ঞান কিভাবে লাভ করেছিলেন? বাস্তব কথা হল, আল্লাহ তাআলাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর এই জ্ঞান নাজিল করেছিলেন, তাঁর শাশ্বত আসমানি বার্তার উজ্জ্বল প্রমাণ স্বরূপ।

মুজিজা-৯৪

গুহাবাসী লোকেরা (আসহাবে কাহফ)

> **তুমি কি মনে করেছ যে, গুহা ও রকিমের অধিবাসীরা ছিল আমার আয়াতসমূহের এক বিস্ময়? যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল, অতঃপর বলল, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমত দিন এবং আমাদের জন্য আমাদের কর্মকাণ্ড সঠিক করে দিন।' ফলে আমি গুহায় তাদের কান বন্ধ করে দিলাম অনেক বছরের জন্য।**
>
> **বিতর্ককারীরা বলবে, 'তারা ছিল তিনজন, চতুর্থ হল তাদের কুকুর।' আর কতক বলবে, 'তারা ছিল পাঁচজন, ষষ্ঠ হল তাদের কুকুর।' এসবই অজানা বিষয়ে অনুমান করে। আর কেউ কেউ বলবে, 'তারা ছিল সাতজন; অষ্টম হল তাদের কুকুর**। (কাহফ, ১৮ : ০৯,১২,২২)

কুরআন মাজিদের টিকাকারদের মতে, এই আয়াতে একদল যুবকের কথা উল্লিখিত হয়েছে, যারা এক রোমান রাজার উৎপীড়ন থেকে নিজেদের ঈমান ও জীবন রক্ষার জন্য পাহাড়ের একটি গর্তে আশ্রয় নিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে গুহার ভেতর প্রায় তিনশ বছর ঘুমিয়ে রেখেছিলেন। যখন তারা ঘুম থেকে জাগ্রত হল, তাদের একজন সাথীকে একটি মুদ্রা দিয়ে খাবার কিনে আনার জন্য পাঠাল। যখন সে শহরে প্রবেশ করল, দেখতে পেল পুরো শহর সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে। দোকানী এত প্রাচীন মুদ্রা দেখে হতবিহ্বল হয়ে গেল। সে মনে করল, এই যুবক কোনো ধরনের ধনভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছে এবং সে এই মুদ্রার উৎস সম্পর্কে জানতে চাইল। যুবকটি এমন বিপত্তির মুখে পড়ে আরও অধিক বিস্মিত হল।

বিষয়টি শেষ পর্যন্ত রাজ দরবার পর্যন্ত গড়াল। রাজা যুবকটির কাহিনী শুনে বিস্মিত হলেন। অতঃপর তার সভাসদদের সঙ্গে নিয়ে সেই গুহার কাছে গেলেন এবং যুবকদেরকে তাদের জন্য দুআ করতে বললেন। পরবর্তীতে তারা সেই একই গুহার মধ্যেই বসবাস করতে লাগল এবং মৃত্যু বরণ করল। 'গিবন' তার 'রোমান সম্রাজ্যের উত্থান-পতন' (অধ্যায় ৩৩) নামক গ্রন্থে এই ঘটনার আরও কিছু বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তার মতে, এই ঘটনাটি সংঘটিত হয় রোম সম্রাট 'ডিসাস' এর রাজত্বকালে ২৪৯-২৫১ খৃস্টাব্দে। যুবকরা অতঃপর জাগ্রত হয়েছিল রোমান সম্রাট থিউডুসাস এর রাজত্বকালে। যার শাসনকাল ছিল ৪০৭ থেকে ৪৫০ খৃস্টাব্দ।

কিছুদিন পূর্বে আমি জর্ডানে এক স্থান ভ্রমণ করি, যাকে অধিকাংশ লোক আসহাবে কাহফের গুহা বলে ধারণা করে থাকে। এটি রাজধানী শহর আম্মানের বহিরপার্শ্বে অবস্থিত। পুরো এলাকাটি খুব এবড়ো-থেবড়ো, পিঙ্গলবর্ণ পাহাড়ময়। একটি পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ে আছে একটি সুপ্ত গুহা, যার রয়েছে একটি বড় কক্ষ। আমি কক্ষটিতে প্রবেশ করলাম। পাথরে খোদিত সাতটি গর্ত দেখতে পেলাম। প্রতিটি গর্তের ভেতর একটি করে প্রকোষ্ঠ, যাতে একেকটি মানব কঙ্কাল। সেখানে অন্য একটি গর্ত আছে, যাতে আছে কুকুরের কঙ্কাল।

স্মর্তব্য, এসব লোকের ব্যাপারে ন্যূনতম জ্ঞান অর্জন কিংবা জানার জন্য মুহাম্মদ সা.-এর কাছে কোনো মাধ্যম কিংবা উৎস ছিল না এবং বাস্তবতা হল, তা এখনো মাটির নিচে একটি গুহায় চাপা পড়ে আছে। এটি কুরআনের মুজিজা যে, তা ঐতিহাসিকদের বর্ণনা বা নৃবিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের শত শত বছর পূর্বের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে।

মুজিজা-৯৫

গুহাবাসীদের কর্ণকুহর বন্ধ করে দেয়া

ফলে আমি (আল্লাহ) গুহায় তাদের কান (শ্রবণশক্তি) বন্ধ করে দিলাম বহু বছরের জন্য (যাতে তারা গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হয়)। (কাহফ ১৮ : ১১)

এই আয়াতে সেসব যুবকের কথা উল্লেখিত হয়েছে যারা গুহার ভেতর ঘুমিয়ে ছিল তিনশত বছর। লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয় যে, এই আয়াতে কুরআন মাজিদ শ্রবণ ব্যতীত সেসব যুবকের অন্য কোনো শরীরবৃত্তের বর্ণনা দেয় নি। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে, সকল সংবেদনশীল অঙ্গের মধ্যে কেবল কানই, এমন কি, ঘুমের মধ্যেও সক্রিয় থাকে। এ কারণেই ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার জন্য আমাদের শাব্দিক সংকেত প্রয়োজন হয়। যেহেতু, আল্লাহ তাআলা এসব লোককে দীর্ঘদিনের জন্য নিদ্রিত রাখতে ইচ্ছা করলেন, তিনি তাদের শ্রবণেন্দ্রীয়কেও বন্ধ করে দিলেন। নিশ্চিতভাবে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দশ বছর পূর্বে ঘুমের শরীরবৃত্তীয় বিদ্যা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।

মুজিজা-৯৬

গুহাবাসীদের পার্শ্ব পরিবর্তন

তুমি তাদের মনে করতে জাগ্রত, অথচ তারা ছিল ঘুমন্ত। আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাচ্ছি ডানে ও বামে এবং তাদের কুকুরটি আঙিনায় তার সামনের দু'পা বাড়িয়ে আছে। (কাহফ, ১৮ : ১৮)

এই আয়াতটি গুহার যুবকদের ঘুমানোর ধরন সম্পর্কিত। এই আয়াত বলে, যদিও তারা তিনশ বছরের অধিককাল ঘুমিয়েছিল, আল্লাহ তাআলা তাদের

ডানে ও বামে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতেন। এই আয়াতটি এভাবে সেসব লোকদের জন্য একটি বিশেষ স্বাস্থ্য-নিয়মের নির্দেশনা দেয় যারা দীর্ঘ সময়ের জন্য বিছানায় শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়। এ ধরনের লোকদের উপদেশ দেয়া হয়েছে বিছানায় তাদের অবস্থান নিয়ত পরিবর্তন করতে। অন্যথায় পরিণামে তারা বিভিন্ন স্বাস্থ্য-সমস্যায় পতিত হবে। যেমন- রক্ত সঞ্চালনজনিত জটিলতা, ত্বকের পঁচন, শরীরের নিম্নাংশে রক্তের চাপ ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কে এসব যুবকের ঘুমানোর ধরন বর্ণনার ক্ষেত্রে এমন যথার্থ ভাষা ব্যবহার করতে পারেন?

মুজিজা-৯৭

ইউসুফ ও মুসা আ.-এর বৃত্তান্ত

কুরআন মাজিদ নবী ইউসুফ আ. ও নবী মুসা আ. এর বিরুদ্ধাচারণের বৃত্তান্ত সমকালীন রাজা-বাদশাহদের আলোচনাসহ সবিস্তারে বর্ণনা দিয়েছে। এটি অধিক লক্ষণীয় বিষয় যে, ইউসুফ আ. ও তাঁর সমকালীন বাদশাহর আলোচনা প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদ সর্বদা 'রাজা' শব্দটি ব্যবহার করেছে। পক্ষান্তরে যখন মুসা আ. ও তাঁর সমকালীন রাজা প্রসঙ্গে আলোচনা এসেছে সেক্ষেত্রে কুরআন সর্বদা 'ফেরাউন' শব্দ ব্যবহার করেছে। ইহুদি ঐতিহাসিকগণ অনুরূপভাবে বাইবেলের পুরাতন ও নতুন সমাচার এমন সুনির্দিষ্ট পার্থক্য দেখায় নি। উভয়ের বর্ণনাতেই আছে, উভয় নবীই ফেরাউনের সঙ্গে মুকাবিলা করেন।

সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকরা এই নবীদ্বয়ের সময়কাল নির্দিষ্ট করেছে। ধারণা করা হয়, ইউসুফ আ. জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯০৬ খৃস্টপূর্বে। মিশর সে সময় শাসন করত 'হায়কস' নামক এক রাজা, ফেরাউন নয়। 'আপফিস' নামক 'হায়কস' রাজা ১৮৯০ খৃস্টপূর্বাব্দে হযরত ইউসুফ আ. কে কারারুদ্ধ করেন। মিশরের ইতিহাসে 'ফেরাউন' নাম আসে অনেক পরে। বর্ণিত আছে, মুসা আ. কে যে ফেরাউন লালন-পালন করে সে ছিল 'দ্বিতীয়

রামজিস'। সে মিশর শাসন করে ১২৯২ থেকে ১২২৫ খৃ.পূর্বাব্দ পর্যন্ত। যে ফেরাউন মুসা আ.-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল সে ছিল মাইনপথ (Minepath)। সে 'দ্বিতীয় রামজিস'-এর জীবদ্দশাতেই মিশরের রাজমুকুট ধারণ করে। অধিকন্তু বর্ণিত আছে, মুসা আ. মৃত্যুবরণ করেন ১২৭২ খৃস্টপূর্বাব্দে। এই তারিখসমূহের ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিকরা সম্প্রতি একথা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, ইউসুফ আ. ফেরাউনের মুকাবিলা করেন নি।

একথা স্মর্তব্য যে, না পুরাতন সমাচার, না নতুন সমাচার, আর না পূর্বের ইহুদি ঐতিহাসিকরা এ বিষয়টি সনাক্ত করতে পেরেছিল। পক্ষান্তরে, কুরআন মাজিদ এই সত্যটি চিহ্নিত করেছে। তা হযরত ইউসুফ আ.-এর আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বদা 'রাজা' শব্দ ব্যবহার করেছে এবং মুসা আ. এর আলোচনা করার সময় তার বিপরীতে সর্বদা 'ফেরাউন' শব্দ ব্যবহার করেছে। তিনি আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কে হতে পারেন, যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এমন সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করেছেন?

মুজিজা : ৯৮

রোমানদের পরাজয়ের এলাকা

> **আলিফ, লাম, মীম। রোমান সাম্রাজ্য পরাজিত হয়েছে। একটি নিম্নতম স্থানে। তারা অচিরেই বিজয় লাভ করবে, তাদের পরাজয়ের পর।** (রুম, ৩০ : ১-৩)

এই আয়াতে যে আরবি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হল আদনাল-আরদ (أدنى الأرض)। 'আরদ' শব্দের অর্থ ভূমি এবং 'আদনা' শব্দটির দু'টি অর্থ

রয়েছে- একটি হল, নিকটবর্তী এবং অন্যটি নিম্ন। এই আয়াত সেই যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করে যা সংঘটিত হয় রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে। হিজরতের দ্বিতীয় বছরে (মোতাবেক ৬২৪ খৃস্টাব্দে)। সকল আরব, মুসলিম-অমুসলিম সকলে এই যুদ্ধ সম্পর্কে সজাগ ছিল এবং এও জানত যে, তা সংগঠিত হয় জর্ডানের বর্তমান মৃত সাগরের সন্নিকটে একটি নির্দিষ্ট স্থানে। কুরআন মাজিদের পূর্ববর্তী ভাষ্যকারগণ 'আদনা' শব্দের কেবল প্রথম অর্থ ব্যবহার করে এই আয়াতের ব্যাখ্যা দেন এবং বলেন, এই যুদ্ধ সংগঠিত হয় আরব উপদ্বীপের সন্নিকটবর্তী একটি স্থানে। সাম্প্রতিক সময়ের একদল মুসলিম বিজ্ঞানী জানতে চাইলেন, 'আদনা' শব্দের অন্য অর্থ 'নিম্নভূমি' এর সঙ্গে এই আয়াতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না? তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন সুপ্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ পলমারকে পৃথিবীর সবচেয়ে নিম্নতম ভূমি চিহ্নিত করতে বললেন। উল্লেখ্য যে, প্রফেসর পলমার ছিলেন সেই কমিটির সভাপতি যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Geology Society-র শত বার্ষিকী উৎসবের আয়োজন করে। প্রফেসর পলমার বলেন, পৃথিবীতে বহু সংখ্যক নিম্নভূমি রয়েছে। তখন তাকে বলা হল, পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্থানটি চিহ্নিত করতে। তিনি জর্ডানের মৃত সাগরের সন্নিকটে একটি বিশেষ স্থানের দিকে নির্দেশ করলেন। তখন মুসলিম বিজ্ঞানীরা তাকে কুরআন মাজিদের এই আয়াতটি দেখালেন এবং তাকে এও জানালেন যে, এটি হচ্ছে হুবহু সেই স্থান যেখানে যুদ্ধটি সংগঠিত হয়। প্রফেসর পলমার বললেন, তিনি জানেন না, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময়কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কি অবস্থা ছিল। তবে এটি পরিষ্কার যে, কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসমানি আলো।

মুজিজা : ৯৯

লোহার রহস্য

> **নিশ্চয় আমি আমার রাসুলদেরকে পাঠিয়েছি স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এবং তাদের সঙ্গে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড নাজিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি আরও নাজিল করেছি**

লোহা, তাতে প্রচণ্ড (রণ) শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে। আর যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন, কে না দেখেও তাঁকে এবং তাঁর রাসুলদেরকে সাহায্য করে। অবশ্যই আল্লাহ মহা শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (হাদিদ, ৫৭ : ২৫)

লক্ষণীয় বিষয় যে, কুরআন মাজিদ পৃথিবীতে লোহার অবতরণ বুঝাতে 'নাযালা' (نزل) শব্দটি ব্যবহার করেছে। নৃতত্ত্ববিদরা এখন স্বীকার করে যে, আমাদের সৌর জগতের পুরো শক্তি এক পরমাণু লোহা উৎপাদনের জন্যও যথেষ্ট নয়। অধিকন্তু তারা বলে, পৃথিবীর উপরিভাগে এক পরমাণু পরিমাণ লোহা উৎপাদন করার জন্যে আমাদের সৌর জগতের চারগুণ শক্তির প্রয়োজন হবে। এভাবে নৃতত্ত্ববিদরা এই উপসংহারে পৌঁছে যে, লোহা একটি অতি জাগতিক বস্তু, যা পৃথিবীতে এসেছে অন্য কোনো গ্রহ থেকে। Chemical Education নামক আমেরিকান এক সাময়িকীতে ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এবং New Scientists -এর ১৩ জানুয়ারি ১৯৯০ সংখ্যায় বলা হয়েছে : লোহার পরমাণু কণিকাসমূহ সাধ্যাতীত দৃঢ়ভাবে ঘনীভূত। লোহা হল সর্বাধিক ভারী পদার্থ যা মানসম্মত পারমাণবিক প্রজ্বলনের মাধ্যমে একটি নক্ষত্রে তৈরি হয়েছে। এতে রয়েছে সর্বাধিক সুদৃঢ় নিউক্লিয়াস। লোহাকে সংশ্লেষণ করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা পৃথিবীতে সুলভ নয়। তাই, পৃথিবীতে যে লোহা পাওয়া যায় নিঃসন্দেহে তা বাইরের মহাকাশে সংশ্লেষিত।

'নাযালা' শব্দটি পূর্বেকার ভাষ্যকারদের কাছে ছিল কুরআন মাজিদের এক রহস্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উৎকর্ষতা কুরআন মাজিদের এই রহস্যকে বিজ্ঞানের একটি বাস্তব সত্যে রূপান্তরিত করেছে। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কার এমন সুনিশ্চিত জ্ঞান থাকতে পারে, যা মানব জ্ঞানের সকল স্তরকে অতিক্রম করে ও ছাপিয়ে যায়।

মুজিজা : ১০০

সাগরের অভ্যন্তরের অন্ধকারাচ্ছন্নতা

অথবা (অবিশ্বাসীদের অবস্থা) গভীর সমুদ্রের ঘনীভূত অন্ধকারের মত, যাকে আচ্ছন্ন করে ঢেউয়ের উপরে ঢেউ, তার উপরে মেঘমালা। অনেক অন্ধকার, এক স্তরের ওপর আরেক স্তর। কেউ হাত বের করলে আদৌ তা দেখতে পায় না। (নূর, ২৪ : ৪০)

মানুষ, বিশেষতঃ যারা সমুদ্রে মুক্তা সংগ্রহ করে, সাধারণত সমুদ্রের ২০ থেকে ৩০ মিটার পর্যন্ত গভীরে ডুব দেয়, যেখানে তারা সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পায়। যা হোক, সাবমেরিন পর্যন্ত সমুদ্রে ৫০ মিটারের গভীরে যেতে পারে নি যে, মানুষ সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকার সম্পর্কে জানতে পারবে। এটি কুরআন মাজিদের একটি মুজিজা, তা কেবল সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকার সম্পর্কেই বর্ণনা দেয় নি; বরং তার অন্ধকারের অবস্থা সম্পর্কেও বর্ণনা দিয়েছে। বলেছে, 'অন্ধকার' এক স্তরের ওপর আরেক স্তর'। অন্ধকারের এই অবস্থা সম্পর্কে বর্তমানে সমুদ্র বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

বিজ্ঞানীরা বর্তমানে এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, সমুদ্রের ওপর যে আলো পতিত হয় তা সমুদ্রের তরঙ্গের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। এভাবে তার একটি অংশ সমুদ্রে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হয়। সমুদ্রে নিয়ত গতিশীল তরঙ্গমালার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এই তরঙ্গগুলি স্তরে স্তরে একটির ওপর আরেকটি সঞ্চালিত হয়। এ কারণে তরঙ্গের গতি ও গভীরতার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্তরের তরঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার আলো প্রতিফলিত হয়। ফলে, সাগরে যে আলো প্রবেশ করে তা গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পেতে থাকে এবং অবশেষে তলদেশ পর্যন্ত কোনো আলোই পৌঁছতে পারে না। এই ব্যাপারটি কুরআন মাজিদের উপরোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ যে, 'অন্ধকারের স্তরসমূহ একটির ওপর আরেকটি।'

এই আয়াতের অপর একটি ব্যাখ্যা আলোর প্রতিসরণের রহস্যের মধ্যে নিহিত। সমুদ্রের পানিতে আলো প্রবেশ করার পর তা তার অঙ্গীভূত সাত বর্ণে বিভক্ত হয়। সমুদ্র বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এ কথা প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, সমুদ্রের গভীর অংশ একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণ বা নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো

শুষে নেয়। তারা সম্প্রতি দেখিয়েছেন, লাল বর্ণই সর্বপ্রথম ৩০ মিটার গভীর পর্যন্ত শোষিত হয়। অন্য কথায়, যদি কোনো ডুবুরী আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং এই গভীরতার মধ্যে তার শরীর থেকে রক্ত বের হয় সে তা দেখতে পায় না। দ্বিতীয় যে রং শোষিত হয় তা হল কমলা। পরে হলুদ বর্ণ, যা শোষিত হয় ৫০ মিটার পর্যন্ত। এরপরে সবুজ ও বেগুনী বর্ণ ১০০ মিটার গভীর পর্যন্ত শোষিত হয় এবং সর্বশেষ যে বর্ণ শোষিত হয় তা হল নীল, যা ২০০ মিটার পর্যন্ত প্রবেশ করে। এভাবেই সাগরের তলদেশ ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে যায় এবং এই অন্ধকারাচ্ছন্নতা বিরাজ করে বিশেষ স্তরসমূহে, একটির পর অন্যটি। এটা শুরু হয় ৩০ মিটার গভীরতা থেকে এবং পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে বিভিন্ন বর্ণ স্তরে ২০০ মিটারের গভীরতা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে, এরপরে বিরাজ করে পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্নতা। সমুদ্র সম্পর্কে সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত এই তথ্য কুরআন মাজিদের উপরে বর্ণিত আয়াতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

মুজিজা : ১০১

ফসলহীন উপত্যকা

‘হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমি আমার কিছু বংশধরকে ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের (মক্কার কাবা শরিফের) নিকট বসতি স্থাপন করালাম। (ইবরাহিম, ১৪ : ৩৭)

এটি সেই বিবৃতি যা আল্লাহর নবী ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আজ থেকে চার হাজার বছরেরও আগে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে

দিয়েছিলেন। এই আয়াতে উপত্যকা বলতে বুঝানো হয়েছে মক্কা নগরী এবং বলা হয়েছে, এটি এমন একটি উপত্যকা যেখানে চাষাবাদ হয় না। আরব উপদ্বীপের ভূভাগে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যে কেউ এখন দেখতে পাবে কিছু পানির ড্যাম, পানি সেচের জন্য প্রচুর পানির কূপ এবং বহু চারণভূমি ও খামারবাড়ি। এটি লক্ষণীয় বিষয়, এই চার হাজার বছরের দীর্ঘ সময়েও এই উপত্যকার ভূমিতে তার চারপাশে কোনো পরিবর্তন আসে নি। মক্কা এখনও অনাবাদী ভূমি হিসেবে রয়ে গেছে।

মুজিজা : ১০২

মেঘ সৃষ্টি ও বৃষ্টি বর্ষণ

তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ মেঘমালাকে পরিচালিত করেন, তারপর তিনি সেগুলোকে একত্রে জুড়ে দেন, তারপর সেগুলো স্তুপীকৃত করেন, তারপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে বৃষ্টি বের হয়। আর তিনি আকাশস্থিত পাহাড় (সদৃশ্য) মেঘমালা থেকে শিলা বর্ষণ করেন, (অথবা মহসিন খানের অনুবাদ মতে : আকাশে শিলার পর্বতমালা রয়েছে)। অতঃপর তা দ্বারা যাকে ইচ্ছে আঘাত করেন। আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা সরিয়ে দেন। এর বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। (নূর ২৪ : ৪৩)

আল্লাহ, যিনি বাতাস প্রেরণ করেন ফলে তা মেঘমালাকে ধাওয়া করে, অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেন, ফলে তুমি দেখতে পাও, তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বারিধারা। অতঃপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের ওপর ইচ্ছা বারি বর্ষণ করেন, তখন তারা হয় আনন্দিত। (রূম, ৩০ : ৪৮)

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মত একজন বেদুঈন আরব একটি মরুময় অঞ্চলে থেকে মেঘ সৃষ্টি, বৃষ্টিপাত, বিদ্যুতের ঝলকানি এসব

ঘটনা খুব কমই প্রত্যক্ষ করেছেন। আল্লাহ তাআলা মেঘের গঠন ও বৃষ্টিপাত সম্পর্কিত এসব তথ্য তাঁর কাছে নাজিল না করলে তিনি এসবের এমন প্রাণবন্ত বর্ণনা দিতে পারতেন না। আবহাওয়াবিদগণ মেঘের গঠন ও বৃষ্টিপাত সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পেয়েছেন।

বাতাস মেঘমালাকে ধাবিত করে যাতে সেগুলি ঘনীভূত হতে শুরু করে। অতঃপর মেঘগুলি পরস্পর জুড়ে যায় এবং বড় মেঘ তৈরি করে এবং লম্বভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে মনে হয় যেন সেগুলি স্তুপিকৃত। নবগঠিত মেঘের ওপর অংশে পানির ফোঁটা পুঞ্জিভূত হতে শুরু করে এবং যখন তা খুব ভারী হয়ে যায়, তখন পৃথিবীতে বৃষ্টির আকারে নেমে আসে।

আমাদের উচিত, এই তথ্যটিকে উপরিউক্ত কুরআনের আয়াতের সঙ্গে তুলনা করা এবং এতে যে কেউ এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, কেবল আল্লাহ তাআলাই কুরআন মাজিদের এই তথ্যের উৎস।

মুজিজা : ১০৩

পরিবহনের আধুনিক বাহনসমূহ

> **আর (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা, তোমাদের আরোহন ও শোভার জন্য এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন কিছু, যা তোমরা জান না।** (নাহল, ১৬ : ৮)

এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন মানুষের কোনো ধারণাই ছিল না যে, ভবিষ্যতে এসব প্রাণী ব্যতীত পরিবহনের জন্য অন্য কিছু ব্যবহৃত হতে

পারে। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে ইরশাদ করেছেন, 'তিনি সৃষ্টি করেছেন (অন্যান্য) এমন কিছু যা তোমরা জান না।' বস্তুতঃ, ইতিহাস বলে, মানুষ পরিবহন ও যোগাযোগের জন্য পর্যায়ক্রমে নতুন নতুন উপায় আবিষ্কার করেছে। যে কোনো যুগের দিকে তাকালে দেখা যায়, পরিবহনের কিছু মাধ্যম মানুষের সর্বদা অজ্ঞাত ছিল। এভাবে এই আয়াতটি প্রত্যেক যুগের মানুষের জন্যই সত্য।

মুজিজা : ১০৪

মেরু অঞ্চলে দিনের দৈর্ঘ্য

> **অবশেষে যখন সূর্যোদয়ের স্থানে এসে পৌঁছল তখন সে দেখতে পেল, তা এমন এক জাতির ওপর উদিত হচ্ছে যাদের জন্য আমি সূর্যের বিপরীতে কোনো আড়ালের ব্যবস্থা করি নি।** (কাহফ, ১৮ : ৯০)

এই আয়াত এমন একজন রাজার বিজয় অভিযানের বর্ণনা দেয় যাকে কুরআন মাজিদ 'যুল-কারনাইন' বলে অভিহিত করেছে। এই আয়াত বলে, তিনি এমন এক স্থানে গমন করেন যেখানে তিনি সূর্যকে উদিত হওয়ার অবস্থায় দেখতে পান এবং সেই স্থানের লোকদের সূর্যের বিপরীতে কোনো আড়ালের ব্যবস্থা ছিল না। আমরা এখন জানতে পারি, এটি হল মেরু অঞ্চলের সূর্যের অবস্থা যেখানে তা ছয় মাসের জন্য অস্ত যায় না। অধিকন্তু, সূর্য সর্বদা নিম্নে উদিত হওয়ার অবস্থায় থাকে, যেমনটি কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে। না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আর না কোনো আরবি ব্যক্তির এই সূর্যোদয়ের অবস্থা সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা ছিল। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কে, কুরআন মাজিদে এই তথ্য সন্নিবেশিত করতে পারেন?

মুজিজা : ১০৫

বৃষ্টির চক্রাবর্তন

> **শপথ আসমানের, যা প্রদান করে আবর্তিত বৃষ্টি। শপথ পৃথিবীর, যা বিদীর্ণ হয় (বৃষ্টির কল্যাণে)। নিশ্চয় এটা (কুরআন মাজিদ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) ফয়সালাকারী বাণী। আর তা উপহাসের বিষয় নয়।** (আত-তারিক, ৮৬ : ১১-১৩)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবতীর্ণ করেছেন যা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরও বহু শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের অজানা ছিল। এই আয়াত যে 'বৃষ্টির আবর্তন' -এর কথা বলে তা ছিল আরব বেদুঈনদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এখন আমরা জানি যে, ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ ও সাগরের পানি সূর্যের তাপে বাষ্পীভূত হয়ে মেঘে রূপান্তরিত হয়, ঘনীভূত হয় এবং বৃষ্টি রূপে পুনরায় পতিত হয়। এভাবে আকাশ পৃথিবীকে সেই পানি ফিরিয়ে দেয় যা একটি নিত্য চক্রাবর্তে তার কাছে উঠে। এই বিষয়টি বর্ণনার পর কুরআন মাজিদ মানব জাতিকে পৃথিবী বিদীর্ণ হওয়ার প্রতি মনোনিবেশ করার দাওয়াত দেয়। যেমন, 'বৃষ্টির ফলে জীবনের উদ্ভব। কুরআন মাজিদ অবশেষে মানব জাতিকে দাওয়াত দেয় তার যথার্থতা ও প্রাজ্ঞতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে। এটিকে নিছক মনোরঞ্জনের বিষয় হিসেবে নেয়া মানুষের জন্য অনুচিত।

মুজিজা : ১০৬

ফেরাউনের মৃতদেহ সংরক্ষণ

> **'আজ আমি (আল্লাহ) তোমার দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। আর নিশ্চয় অনেক মানুষ আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে গাফেল।** (ইউনুস, ১০ : ৯২)

চৌদ্দশত বছর পূর্বে কুরআন মাজিদ ভবিষ্যৎবাণী করেছে, আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের দেহ সংরক্ষণ করবেন। প্রত্নতত্ত্ববিদরা সম্প্রতি ফেরাউন 'মাইনপথ'-এর দেহ আবিষ্কার করেছে, যে মূসা আঃ-এর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে ডুবে গিয়েছিল। এটি বর্তমানে কায়রোর একটি মিউজিয়ামে কুরআন মাজিদের একটি জীবন্ত মুজিজারূপে তাদের জন্য সংরক্ষিত আছে যারা আল্লাহ তাআলার নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। স্মর্তব্য যে, বাইবেলেও বর্ণিত আছে, ফেরাউন সমুদ্রে নিমজ্জিত হবে। কিন্তু পরবর্তীতে তার দেহ কি হবে এ ব্যাপারে কোনো তথ্য নেই। পক্ষান্তরে বাস্তবতা হল, কুরআন মাজিদ উল্লেখ করেছে, আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের দেহ সংরক্ষণ করবেন। যা অন্য একটি প্রমাণ যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন মাজিদ বাইবেল থেকে নকল করেন নি। বরং তাঁর জ্ঞানের উৎস হল সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসমানি অহি।

মুজিজা : ১০৭

কুরআন মাজিদে উল্লিখিত শব্দ 'হামান'

> **আর ফিরাউন বলল, 'হে পরিষদবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। অতএব হে হামান, আমার জন্য তুমি ইট পোড়াও, তারপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরি কর। যাতে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাই। আর আমি নিশ্চয় মনে করি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।'** (কাসাস, ২৮ : ৩৮)

কুরআন মাজিদ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে, মিশরের পূর্ববর্তী ইতিহাস সম্পর্কে, যা বহু শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের অজানা ছিল। 'হামান' একটি চরিত্র, যার নাম কুরআন মাজিদে উল্লিখিত হয়েছে ফেরাউনের সঙ্গে। সে ফেরাউনের একজন নিকটতম লোক হিসেবে কুরআন মাজিদের ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে লক্ষ রাখা নিতান্ত আবশ্যক যে, তাওরাতের সেসব পরিচ্ছেদে হামানের নাম মোটেই উল্লিখিত হয় নি, যেখানে মূসার (আলাইহিস সালাম)- জীবন সংক্রান্ত আলোচনা আছে। পুরাতন সমাচারের শেষ অধ্যায়ে একজন ব্যাবিলনীয় রাজার সহযোগী হিসেবে হামানের নাম উল্লেখ রয়েছে, যার আগমন ঘটেছে মূসা আলাইহিস সালাম-এর প্রায় ১,১০০ বছর পরে। এটি নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরাতন সমাচার থেকে কুরআন মাজিদ নকল করতেন তবে ফেরাউনের সঙ্গে কিছুতেই হামানের উল্লেখ করতেন না।

নৃতত্ত্ববিদরা মিশরের পিরামিড থেকে বিচিত্র রকমের বর্ণলিপির ফলক উদ্ধার করেছে। দীর্ঘদিন কেউ এই বর্ণলিপিগুলির পাঠোদ্ধার করতে পারে নি। ১৭৯৯ সালে একটি স্বতন্ত্র ধরনের শিলালিপি উদ্ধার করা হয়। এটিকে বলা হয় 'Rosetta' শিলা, এতে তারিখ লিখা আছে ১৯৬ খৃস্ট পূর্বাব্দ। এই শিলাটিতে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত শিলালিপি রয়েছে : চিত্র লিখন (Hiero glyphics), ডেমোক (Democ) ও গ্রীক। গ্রীক ভাষার সহযোগিতায় অপর দুই ভাষার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়। এই অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছিল Jaen-Francoise Champollin নামক একজন ভাষাবিদের মাধ্যমে। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, এই শিলালিপিতে হামানের নামও রয়েছে।

'People in the New Kingdom' নামক অভিধানে (Herman Rank, Die Agyptischen Personennamen, Verzeichnis dor Namen, Verlag Ven, J.J. Augustin in Gluckstadt, Born 11-1952) যা তৈরি হয়েছিল শিলালিপির সকল সংগ্রহের ওপর ভিত্তি করে, তাতে হামানকে বলা হয়েছে শিলা ছেদনকারী কর্মীদের নেতা। লক্ষণীয় বিষয় হল, কুরআন মাজিদ কেবল ফেরাউনের সঙ্গে হামানের নামকে একত্রিতই করে নি, বরং এও বলেছে যে, সে নির্মাণ বিষয়ক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল। এজন্যেই ফেরাউন তাকে একটি উঁচু টাওয়ার নির্মাণ

করতে আদেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে এই তথ্যটি অবতীর্ণ না করলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে তার বর্ণনা দিলেন?

মুজিজা : ১০৮

কাবা শরিফে আল্লাহ তাআলার নিদর্শন

> **নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের (ইবাদতের) জন্যে স্থাপিত হয়েছে তা বাক্কায় (মক্কায়), যা বরকতময় এবং বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াত (নির্দেশিকা)। তাতে রয়েছে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, (উদাহরণ স্বরূপ) মাকামে ইবরাহিম। আর যে তাতে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হয়ে যাবে।** (আলে ইমরান, ০৩ : ৯৬-৯৭)

এই আয়াত অনুসারে কাবা শরিফ আল্লাহ তাআলার অনেক সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলি ধারণ করে আছে। একজন ঈমানদার পুরুষ কিংবা নারী যখন তাতে প্রবেশ করে তখন সে মুহূর্তেই সেসব আধ্যাত্মিক নিদর্শন অনুভব করতে পারে। অনুরূপভাবে কাবা শরিফের কিছু খুব সমুজ্জ্বল বাহ্যিক নিদর্শনও রয়েছে। এসব নিদর্শনের একটি হল জমজম কূপ, যা কাবা শরিফের অভ্যন্তরে অবস্থিত। হাদিসের ভাষ্য অনুসারে, জমজম কূপের পানি একজন মানুষের যে কোনো ইচ্ছা কিংবা প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করে। এই হাদিসের ওপর ভিত্তি করে মুসলমানরা এই পানি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে।

উল্লেখ্য যে, কাবা শরিফ মক্কায় অবস্থিত, যা খুব শুষ্ক। এর চারপাশে রয়েছে তরু-লতাহীন পাথুরে পর্বতমালা। মক্কা মরুভূমি হওয়ার কারণে তাতে পুরো বছর উল্লেখ করার মত তেমন কোনো বৃষ্টিপাতও হয় না। অধিকন্তু মক্কার ভেতরে কিংবা বাইরে কোনো পুকুর কিংবা হ্রদও নেই। এ কারণে যে কেউ ধারণা করতে পারে, জমজম কূপ একটি সীমিত পরিমাণ পানি সরবরাহ

করবে। কিন্তু বাস্তবতা হল, অসংখ্য মানুষ বিরতিহীনভাবে তার পানি ব্যবহার করছে। প্রথমতঃ মক্কার অধিকাংশ অধিবাসী, জেদ্দার পার্শ্ববর্তী শহরসমূহ এবং তায়েফবাসীরা তাদের প্রাত্যহিক খাবার পানি ও রান্নার জন্য জমজমের পানির নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। দ্বিতীয়তঃ সারা বছর অসংখ্য মানুষ কাবা শরিফ জিয়ারত করতে আসে। তারা খাবার, গোসল এমনকি ধোয়া-মোছার কাজেও ব্যাপকভাবে জমজমের পানি ব্যবহার করে। তৃতীয়তঃ তারা যখন তাদের বাড়ি-ঘরে ফিরে যায় তখন প্রচুর পরিমাণে পানি তাদের বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের জন্য হাদিয়া স্বরূপ নিয়ে যায়। চতুর্থতঃ রোজার মাসে দৈনিক কমপক্ষে পাঁচলাখ মানুষ কাবা শরিফে সমবেত হয়। এ সকল জিয়ারতকারী ত্রিশদিন যাবৎ এই পানি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে। পঞ্চমতঃ হজ্বের মৌসুমে কাবা শরিফে বিশ লাখেরও অধিক লোকের আগমন ঘটে। এ সকল জিয়ারতকারী তাদের প্রাত্যহিক সকল প্রয়োজনে এই পানি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে এবং বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় প্রত্যেকে কমপক্ষে এক কনটেইনার করে পানি সঙ্গে নিয়ে যায়। বিস্ময়কর ব্যাপার হল, সারা বছর ধরে জমজম কূপের পানির এত প্রচুর ব্যবহার সত্ত্বেও তাতে কখনো পানি সল্পতা দেখা দেয় নি। এখনো পর্যন্ত কেউ ধারণাও করতে পারে না যে, মক্কার মত এমন ঊষর ও পাথুরে ভূমিতে এই নিঃসীম পানির উৎস কোথায়। এটি উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত কাবা শরিফে আল্লাহ তাআলার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

মুজিজা : ১০৯

রাসুল সা.-এর সাহাবিদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সহানুভূতি

(আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না।) আর তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামতকে (কৃতজ্ঞতার সঙ্গে) স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করলেন। অতঃপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে। (আলে ইমরান, ০৩ : ১০৩)

আর যদি তারা তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তাহলে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা। আর তিনি তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করেছেন। যদি তুমি জমিনে যা আছে তার সবকিছু ব্যয় করতে, তবুও তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। (আনফাল, ০৮ : ৬২-৬৩)

এই আয়াতগুলি অনুধাবন ও উপলব্ধির জন্য ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আরবদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব উপদ্বীপে কোনো সুসংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল না। দেশটি বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। গোত্র প্রতিহিংসা ও গোত্রযুদ্ধ ছিল সেই ভূখণ্ডের আইন। প্রায়ই যুদ্ধ সংঘটিত হত কোনো তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। যেমন : কোনো কূপ থেকে পানি পান ইত্যাদি। আর এই সৃষ্ট যুদ্ধ যুগযুগ ধরে চলতে থাকত। গোত্র সংঘাত ও গোত্র শত্রুতা মদিনার মধ্যে ছিল অধিক বেশি প্রকট। তাতে ছিল দুটি সমান শক্তিধর গোত্র, একটির নাম আউস, অপরটি খাজরাজ। যেহেতু উভয় গোত্রই ছিল শক্তিধর, তাই তারা জীবনের সব ক্ষেত্রেই ছিল একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। নিত্য যুদ্ধ, প্রতিহিংসা ও অবিশ্বাসের একটি দুর্গন্ধময় পরিবেশে ছিল তাদের নিত্যদিনের বসবাস। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হল, তারা ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এসব কিছু ভালবাসা ও সহানুভূতির পরিবেশে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অধিকন্তু, পুরো আরব সমাজ পারস্পরিক এমন সৌহার্দ্যপূর্ণ একটি অবিচ্ছিন্ন জাতিতে পরিণত হয় পুরো মানবজাতির ইতিহাসে যার কোনো তুলনা মিলে না। কুরআন মাজিদ এ কথাই বলছে, আল্লাহ তাআলাই মুমিনদের ওপর এই অনুগ্রহ করেছেন এবং তা কেউ কোনো জাগতিক উপায়ে অর্জন করতে পারে নি।

মুজিজা : ১১০

সংখ্যাসূচক সমতার রহস্য

কুরআন মাজিদের বিভিন্ন শব্দের সংখ্যাসূচক সম্পর্কের বিবরণ দিয়ে বহু বই ও প্রবন্ধ লিখা হয়েছে। এই সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্পর্কের ব্যাপারে এ পর্যন্ত কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত টানা যায় নি। তবে তা এতই অনুপম যে, কুরআন মাজিদের বিস্ময়কর প্রকৃতিতে তা নতুন ক্ষেত্র প্রসারিত করেছে। নিম্নে কুরআন মাজিদের কিছু সংখ্যাতাত্ত্বিক সাদৃশ্যের দৃষ্টান্ত পেশ করা হল :

১. কুরআন মাজিদ বলে, সাতটি আসমান রয়েছে। কুরআন মাজিদের কেবল সাতটি সুরার মধ্যেই এই বর্ণনা পাওয়া যায়।

২. কুরআন মাজিদ বলে, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক স্থিরীকৃত মাসের সংখ্যা হল ১২ (বারো)। 'মাস' শব্দের আরবি প্রতিশব্দ 'শাহ্‌র' (شـهر)। এই 'শাহ্‌র' শব্দটি কুরআন মাজিদে কেবল বারো বার উল্লিখিত হয়েছে।

৩. আরবি শব্দ 'ঈমান' অর্থ বিশ্বাস। এই শব্দের বিপরীত শব্দ 'কুফর', যার অর্থ অস্বীকৃতি। কুরআন মাজিদে এই (إيمان) ঈমান শব্দটি ১৭ (সতের) বার দেখা যায়। বিস্ময়ের ব্যাপার হল কুরআন মাজিদে কুফর শব্দটিও এসেছে ১৭ (সতের) বার। অধিকন্তু 'মুমিনুন' শব্দটি কুরআন মাজিদে পাওয়া যায় ৮ (আট) স্থানে এবং 'কাফিরুন' শব্দটিও পাওয়া যায় ৮টি স্থানে।

৪. আরবি শব্দ 'মালাইকা' অর্থ ফেরেশতা এবং 'শয়তান' শব্দ নির্দেশ করে ইবলিশ। শব্দদুটি তাদের বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকার ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী। কুরআন মাজিদে এই 'মালাইকা' শব্দটি সর্বমোট ৬৮ (আটষট্টি) বার ব্যবহৃত হয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হল 'শয়তান' শব্দটিও কুরআন মাজিদে ৬৮ (আটষট্টি) বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৫. আরবি শব্দ 'দুনয়া' অর্থ ইহকাল এবং 'আখিরাহ' অর্থ পরকাল। কুরআন মাজিদে 'দুনয়া' শব্দটি এসেছে ১১৫ বার। অনুরূপভাবে 'আখিরাহ' শব্দটিও এসেছে ১১৫ মোট ১০৮ বার।

৬. আরবি শব্দ 'ত্বীন' অর্থ কাদা মাটি এবং 'নুতফা' অর্থ 'শুক্রবিন্দু'। কুরআন মাজিদ বলে, মানুষ প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে 'ত্বীন' থেকে এবং

পরে 'নুতফা' থেকে। কুরআন মাজিদে 'ত্বীন' শব্দটি দেখা যায় মোট ১২ (বারো) বার। 'নুতফা' শব্দেরও একই অবস্থা, তাও রয়েছে ১২ (বারো) বার।

৭. আরবি শব্দ 'ফে'ল' মানে কাজ এবং 'আজর' অর্থ প্রতিদান। কুরআন মাজিদে 'ফে'ল' শব্দটি দেখা যায় মোট ১০৮ (একশত আট) বার। 'আজর' শব্দের ক্ষেত্রেও তা সত্যি, তাও দেখা যায় ১০৮ বার।

৮. 'রহমান' ও 'রহীম' আল্লাহ তাআলার দুটি গুণবাচক নাম, উভয় শব্দই *রহম*, যার অর্থ দয়া- থেকে নির্গত। 'রহমান' এমন দয়াকে ইঙ্গিত করে যার সঙ্গে আছে ন্যায় বিচার। পক্ষান্তরে 'রহীম' এমন দয়াকে নির্দেশ করে যার সঙ্গে আছে ক্ষমা। কুরআন মাজিদে 'রহমান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে মোট ৫৭ (সাতান্ন) বার, কিন্তু 'রাহীম' শব্দটি দেখা যায় মোট ১১৪ (একশত চৌদ্দ) বার। যা ৫৭ (সাতান্ন) এর ঠিক দুই গুণ। বিভিন্ন হাদিস এই সম্পর্কে প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ তাআলার দয়া তাঁর ক্রোধ ও রাগের ওপর প্রবল।

৯. আরবি শব্দ 'জাযা' অর্থ বিনিময় বা প্রতিদান এবং 'মাগফিরাহ' শব্দের অর্থ ক্ষমা। কুরআন মাজিদে 'জাযা' শব্দটি মোট ১১৭ বার দেখা যায়। 'মাগফিরাত' শব্দটি দেখা যায় ২৩৪ (দুইশত চৌত্রিশ) বার, যা ১১৭-এর ঠিক দুই গুণ। তা আবারও নির্দেশ করে, আল্লাহ তাআলার ক্ষমা তার ন্যায় বিচারের ওপর ছায়া বিস্তার করে।

অনেকেই কুরআন মাজিদের এমন অসংখ্য সংখ্যাতাত্ত্বিক সাদৃশ্য বের করেছেন। আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যেক সাদৃশ্যের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। বলাবাহুল্য, কুরআন মাজিদের সকল শব্দ হিসাব করার জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এমন কোনো কম্পিউটার ছিল না, যা তাকে কুরআন মাজিদে একটি বিশেষ শব্দকে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দের সঙ্গে একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্পর্কের মাধ্যমে ব্যবহার করতে সক্ষম করেছে।

মুজিজা : ১১১

অন্ধকার ও আলোর বর্ণনা

এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিতে তিনি তাদেরকে 'যুলুমাত' (অনেক অন্ধকার) থেকে 'নুর' (আলো)-এর দিকে বের করেন। (মায়েদা, ০৫ : ১৬)

কুরআন মাজিদ যখন অন্ধকারের (যুলমাত)- বর্ণনা দেয় তখন তা একবচন ও বহুবচন উভয় ধরনের শব্দ ব্যবহার করে। পক্ষান্তরে, তা যখন আলো (নুর)-এর বর্ণনা দেয় তখন তা সর্বদা একবচনের শব্দই ব্যবহার করে। বস্তুত, কুরআন মাজিদে এমন একটি আয়াতও পাওয়া যায় না যেখানে নুর শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন মাজিদে অন্ধকার বলতে বিভিন্ন ধরনের মানবীয় দুর্বলতা ও অজ্ঞতাকে নির্দেশ করে। একজন মানুষের বিভিন্ন ধরনের মানবিক দুর্বলতা থাকতে পারে। যেমন, অহম, লোভ, কৃপণতা ইত্যাদি। তার বিভিন্ন ধরনের অজ্ঞাতাও থাকতে পারে। যেমন, মিথ্যা উপাস্যের আরাধনা কিংবা ভ্রান্ত মতবাদের অনুসরণ, যেমন, নাস্তি ক্যবাদ, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি। একই সময়ে একজন মানুষ বিভিন্ন মাত্রা ও পরিমাণের অন্ধকারের অনুসরণ করতে পারে। অতএব বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন মাত্রার অন্ধকার রয়েছে। এজন্যেই কুরআন মাজিদ অন্ধকারের বর্ণনার ক্ষেত্রে একবচনের পাশাপাশি বহুবচনের শব্দও ব্যবহার করেছে।

যখন কুরআন মাজিদ আলোর কথা বলে তখন তা সেই সত্য হেদায়েতের প্রতিই নির্দেশ করে যা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) ও আসমানি কিতাবের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন। পুরো মানব ইতিহাসে সত্য কেবল একটিই ছিল। এজন্যেই কুরআন মাজিদ আলো বুঝাতে সর্বদা 'নুর' শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করেছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি কুরআন মাজিদের প্রতিটি শব্দেরই একটি বিশেষ অর্থ ও বার্তাবাহী অবতীর্ণ করেছেন।

মুজিজা : ১১২

শ্রবণেন্দ্রীয় ও দর্শনেন্দ্রীয়ের বর্ণনা

(অবিশ্বাসীদের) বল, তোমরা আমাকে জানাও, যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রবণ (কান) ও তোমাদের দৃষ্টিসমূহ (চক্ষুসমূহ) কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহে মোহর এঁটে দেন, কে আছে ইলাহ আল্লাহ ছাড়া, যে তোমাদের এগুলো নিয়ে আসবে? (আনআম, ০৬ : ৪৬)

তোমরা কিছুই গোপন করতে না (ইহজগতে এই বিশ্বাসে) যে, তোমাদের কান, চোখসমূহ ও চামড়াসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না। বরং তোমরা মনে করেছিলে তোমরা যা কিছু করতে আল্লাহ তার অনেক কিছুই জানতেন না। (ফুসসিলাত, ৪১ : ২২)

আর আমি তাদেরকে কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছিলাম। কিন্তু যখন তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত, তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের হৃদয়সমূহ তাদের কোনো উপকারে আসে নি। আর তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল। (আহকাফ, ৪৬ : ২৬)

একজন সাধারণ পাঠকের চোখে এসব আয়াত পাঠ করার সময় বিশেষ কিছু ধরা নাও পড়তে পারে। কিন্তু একজন মনোযোগী পাঠক লক্ষ্য করবে, কুরআন মাজিদ এসব আয়াতে শ্রবণের ('সামআ') ক্ষেত্রে একবচনের শব্দ, কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে বহুবচনের শব্দ ('আবসার') ব্যবহার করেছে। লক্ষ্য করলে আরও অধিক বিস্মিত হতে হয় যে, আমাদের দুটি চোখের মত দুটি কান রয়েছে। এতদসত্ত্বেও কুরআন মাজিদ শ্রবণেন্দ্রীয়ের ক্ষেত্রে একবচন

এবং দর্শনেন্দ্রীয়ের ক্ষেত্রে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছে। কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন এধরনের শব্দ চয়নের রহস্য। আমরা আমাদের কর্ণ ও চক্ষুর ব্যবহারের ভিন্নতার ভিত্তিতে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারি।

দেখার ক্রিয়া মানুষের এমন একটি অনুভূতির অন্তর্ভুক্ত যা সামগ্রিকভাবে তার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের এ স্বাধীনতা রয়েছে যে, যা সে পছন্দ করে তা দেখবে এবং যা সে পছন্দ করে না তা দেখা থেকে দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। পক্ষান্তরে আগত শব্দ থেকে সে তার কানকে বন্ধ করে রাখতে পারে না, চাই সে পছন্দ করুক বা না করুক। যেখানে দেখার বিষয়টি ঐচ্ছিক ও নৈর্ব্যক্তিক, সেখানে শ্রবণের বিষয়টি আবশ্যিক এবং অনৈর্ব্যক্তিক। অধিকন্তু আমাদের চোখের ওপর আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আমরা একটি চোখ ইচ্ছা করলে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে পারি, কিন্তু একটি কানের ক্ষেত্রে তেমনটি পারি না। এভাবে চোখের বহুমুখী ও ঐচ্ছিক ক্রিয়া রয়েছে। এ কারণেই কুরআন মাজিদ দর্শনের ক্ষেত্রে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছে। শ্রবণের ক্ষেত্রে এই ব্যবহার প্রযোজ্য নয়। এজন্যেই শ্রবণের ক্ষেত্রে কুরআন মাজিদ একবচনের শব্দ ব্যবহার করেছে।

মুজিজা : ১১৩

কুরআন মাজিদের সংরক্ষণ

> **নিঃসন্দেহে আমি এই বার্তা (কুরআন মাজিদ) অবতীর্ণ করেছি, এবং আমিই তার (বিকৃত হওয়া থেকে) রক্ষণাবেক্ষণকারী।** (হিজর, ১৫ : ০৯)

মুসলিম-অমুসলিম সকলে একবাক্যে স্বীকার করে যে, কুরআন মাজিদের টেক্সট এর মধ্যে কখনও কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় নি। কুরআন মাজিদের শাশ্বত সংরক্ষণ ও তার বিশুদ্ধতার ভবিষ্যৎবাণী কেবল তার টেক্সট এর ক্ষেত্রেই সত্য প্রমাণিত হয়নি; বরং তার ক্ষুদ্রতম যতিচিহ্নের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে সত্য। আরও লক্ষণীয় যে, এই বিচারে আরবি ভাষা

সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী যে, বর্ণমালার প্রত্যেকটি বর্ণই বিশেষ সাংকেতিক চিহ্নের (হরকতের) মাধ্যমে লিখা হয়, যা তার নির্দিষ্ট উচ্চারণ প্রদান করে। নিম্নলিখিত উপাত্তটি কুরআন মাজিদের একটি বিস্তারিত বিবরণ সরবরাহ করে। এই তথ্যগুলি নেয়া হয়েছে 'শরিয়া ডাইজেস্ট', কুরআন সংখ্যা, ভলিউম ১৩ নম্বর -৫, পৃ. ১৮৭-৮৯, ১৯৬৯, লাহোর, পাকিস্তান থেকে।

সর্বমোট আয়াত সংখ্যা : ৬,১৩৬।

সর্বমোট শব্দ সংখ্যা : ৮৬,৪৩০।

সর্বমোট বর্ণ সংখ্যা : ৩,২৩,৭৬০।

প্রতিটি বর্ণের মোট সংখ্যা :

'আলিফ' : ৪,৮৮,৭৭২; বা : ১১,৪২৮, তা : ১,১৯৯, ছা : ১,২৬৭, জীম : ৩,২৭৩, হা : ৯৭, খা : ২,৪১৬, দাল : ৫৬০২, জাল : ৪,৫৭৭, রা : ১১,৭৯৩ যা : ১,৫৯০, সীন : ৫৯৯১, শীন : ২,১১০, সাদ : ২,০১২, দুয়াদ : ১, ত্বা : ১২৭৭, যোয়া : ৮৪, আইন : ৯,২২০, গাইন : ২,২০৮, ফা : ৮,৪৯৯, ক্বাফ : ৬,৮১৩, কাফ : ৯৫০০, লাম : ৩,৪২২, মীম : ৩৬,৫৩৫, নূন : ৪০,১৯০, ওয়াও : ২৫,৫৩৬, হা : ১৯,০৭০, হামজা : ৩,৭২০, ইয়া : ৪৫,৯১৯।

হরকত বা বিশেষ ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্নের মোট সংখ্যা :

ফাতহা (যবর) : ৫৩,২২৩, কাসরা (যের) : ৩৯,৫৮২ যম্মা (পেশ) : ৮,৮০৪, মাদ্দ : ১,৭৭১ তাশদিদ : ১,২৭৪ নুকতা : ১০৫৬৮৪।

এটি কুরআন মাজিদের একটি মুজিজা যে তার কোনো শব্দ, কোনো বর্ণ, কোনো যতিচিহ্ন কিংবা কুরআন মাজিদের কোনো হরকত পর্যন্ত বিগত চৌদ্দশত বছরে পরিবর্তিত হয় নি।

মুজিজা : ১১৪

মহাশূন্যে ভ্রমণ

আর আসমানসমূহ ও জমিনে কত নিদর্শন রয়েছে, যা তারা অতিক্রম করে চলে যায়। অথচ সেগুলো থেকে তারা বিমুখ। (ইউসুফ, ১২ : ১০৫)

পথপূর্ণ আসমানের শপথ। (যারিয়াত, ৫১ : ০৭)

অতঃপর আমি কসম করছি পশ্চিম আকাশের লালিমার। আর রাতের কসম এবং রাত যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার। আর চাঁদের কসম, যখন তা পরিপূর্ণ হয়। অবশ্যই তোমরা এক স্তর থেকে আরেক স্তরে (কিংবা এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে) আরোহণ করবে। অতএব তাদের কী হল যে তারা ঈমান আনছে না? (ইনশিক্বাক, ৮৪ : ১৬-২০)

কুরআন মাজিদের ভাষাই একটি স্বতন্ত্র মুজিজা। কুরআন মাজিদ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা (phenomena) এমন এক ভাষায় বর্ণনা করে যা একটি ব্যাপক অর্থ ও বার্তা বহন করে। আমরা এখন কুরআন মাজিদের এসকল আয়াত, মহাশূন্যের নিরেট বাস্তবতা হিসেবে, সম্প্রতিক আবিষ্কারের আলোকে যথার্থরূপে অনুধাবন করতে সক্ষম, যেমন- 'কসম পথপূর্ণ আসমানের' এবং 'আকাশের নিদর্শনসমূহ' এজাতীয় আয়াত। অধিকন্তু কুরআন মাজিদের আয়াত, 'আসমানসমূহের কত নিদর্শন তারা অতিক্রম করে চলে যায়' এবং 'তোমরা আরোহণ করবে একস্তর থেকে আরেকস্তরে' এটিও সাম্প্রতিক সময়ে মহাশূন্যে মানুষের ভ্রমণের পরিভাষায় খুব ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

মুজিজা : ১১৫

মহাশূন্যে বিভিন্ন কক্ষপথ

কসম, কক্ষপথ- গতিপথ- পথপূর্ণ আসমানের। (যারিয়াত, ৫১ : ০৭)

এই মহাবিশ্বে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ছায়াপথ রয়েছে, যার প্রত্যেকটি ধারণ করে আছে প্রায় ২০০ বিলিয়ন নক্ষত্র। অধিকন্তু এসব নক্ষত্রের অধিকাংশেরই রয়েছে গ্রহপুঞ্জ। আর এই গ্রহপুঞ্জের অধিকাংশেরই রয়েছে উপগ্রহ। এসব মহাকাশীয় বস্তুর প্রতিটিই রয়েছে একটি নিত্য-গতিময় অবস্থায়। একই সময়ে ছায়াপথগুলি অসাধারণ গতিতে পরিক্রমণ করছে পরিকল্পিত নির্দিষ্ট পথরেখায়। মহাশূন্যের বহিরাংশ এভাবে অসংখ্য গতিপথ, পথরেখা কিংবা কক্ষপথের স্তরসমূহে পূর্ণ। এ কথা সুনিশ্চিত যে, যখন এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হচ্ছিল তখন মানুষ জানত না, মহাশূন্য বিভিন্ন গতিপথ কিংবা কক্ষপথে পূর্ণ। মহাকাশবিজ্ঞানীগণ কেবল সাম্প্রতিককালেই এই জ্ঞান লাভ করেছেন। এই আয়াতও আল্লাহর নিরংকুশ ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার কথা বলে যে, এই গতিপথ অতিক্রমণের সময় এসব মহাকাশীয় দেহগুলির কোনোটিই অন্যটির পথ কর্তন করে না কিংবা অন্যদের সঙ্গে ধাক্কা খায় না।

মুজিজা : ১১৬

পৃথিবীর চারপাশে সুরক্ষিত ছাদ

আর আমি (আল্লাহ) আসমানকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ (পৃথিবীর চতুর্দিকে); কিন্তু তারা তার নিদর্শনাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (আম্বিয়া, ২১ : ৩২)

পৃথিবীর চারপাশে যে বায়ুমণ্ডল বেষ্টন করে আছে তা আমাদের জীবনের জন্যে সহায়ক সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করে যায়। মহাকাশীয় ভৌত-রসায়নবিদ্যার সাম্প্রতিক অগ্রগতি আমাদেরকে এই বিষয়টি এবং উল্লিখিত আয়াত অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করার জ্ঞান প্রদান করেছে।

বায়ুমণ্ডল সেসব উল্কাকে ধ্বংস করে দেয় যা পৃথিবী অভিমুখে আসার চেষ্টা করে; পাছে যাতে তা সকল প্রকার জীবের ধ্বংসের কারণ না হয়।

পৃথিবীর চারপাশে যে ওজোন-স্তর আছে তা মহাশূন্য থেকে আগত আলোকরশ্মিসমূহের জন্যে ছাকনির কাজ করে। তা কেবল ক্ষতিকর নয় এমন এবং উপকারী রশ্মিসমূহকেই মহাশূন্য থেকে প্রবেশের অনুমতি দেয়। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে মহাশূন্যের জমানো ঠাণ্ডা থেকেও রক্ষা করে, যা আনুমানিক মাইনাস ২৭০. সেন্টিগ্রেড।

বায়ুমণ্ডল একটি চৌম্বক স্তর ধারণ করে যাকে বলা হয় Van Allen Belt। এটি সেসব ক্ষতিকর আলোকরশ্মির বিরুদ্ধে ঢালের কাজ দেয়, যা আমাদের এই গ্রহের দিকে বিস্ফোরিত হয়। এসব বিস্ফোরণের একটি যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করে তা হিরোশিমায় যে পারমাণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সে ধরনের ১০০ বিলিয়ন পারমাণবিক বোমার শক্তির সমান।

সংক্ষেপে বলা চলে, বায়ুমণ্ডলে একটি শক্তিশালী সিস্টেম কাজ করে, তা যেন পৃথিবীর চারপাশে একটি সুরক্ষিত ছাদ। বৈজ্ঞানিকরা কেবল সম্প্রতিই তা উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে, যা কুরআন বর্ণনা করেছে শত শত বছর পূর্বে।

মুজিজা : ১১৭

আবর্তনকারী আকাশ

কসম, আবর্তন প্রক্রিয়াসম্পন্ন আসমানের। (তারিক, ৮৬ : ১১)

কুরআন মাজিদ শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুবই স্বতন্ত্র। প্রায়ই আমরা তার একটি শব্দ, শব্দটির তাৎপর্য ও আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক উদ্ঘাটনের চেষ্টা ব্যতিরেকে অনুধাবন করতে পারি না। উপরোক্ত আয়াত বলে যে, আসমানে একটি চক্রাবর্ত রয়েছে।

এখন এটা ভালভাবে জানা যে, পৃথিবীর চারপাশে যে বায়ুমণ্ডল আছে তার অনেক স্তর রয়েছে। প্রত্যেক স্তরেরই বস্তু কিংবা রশ্মিকে মহাশূন্যে ফিরিয়ে দেয়া কিংবা পৃথিবীতে পুনরায় নামিয়ে দেয়ার নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে। নিম্নে বায়ুমণ্ডলের সেসব চক্রাবর্তের একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা দেওয়া হল :

বায়ুমণ্ডলের যে স্তরকে Trophosphere বা বারিমণ্ডল বলা হয় তা জলীয় বাষ্পকে ঘনীভূত হওয়া এবং তা বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে আসতে সাহায্য করে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৫ কিলোমিটার উপরে যে ওজন স্তর রয়েছে তা ক্ষতিকর অতি বেগুণী বশ্মিকে প্রতিফলিত করে মহাশূন্যে ফিরিয়ে দেয়।

আয়নমণ্ডল নামে যে স্তর রয়েছে তা পৃথিবী থেকে সম্প্রচারিত বেতার তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ফেরত পাঠায়।

'চৌম্বকমণ্ডল' নামে যে স্তর রয়েছে তা সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র থেকে নির্গত ক্ষতিকর বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় উপাদান মহাশূন্যে ফেরত পাঠায়।

কুরআন মাজিদ 'আবর্তনকারী' বা 'চক্রাবর্ত সাধনকারী' আসমান পরিভাষা ব্যবহারের এটি একটি কারণ হতে পারে। কেবল আল্লাহ তাআলাই প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত।

মুজিজা : ১১৮

সময়ের আপেক্ষিকতা

আর তারা তোমাকে আজাব ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ আল্লাহ কখনো তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না। আর তোমার রবের নিকট নিশ্চয় একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান। (হজ্জ, ২২ : ৪৭)

ফেরেশতাগণ ও রূহ এমন একদিনে আল্লাহর পানে উর্ধ্বগামী হবে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। (মা'আরিজ, ৭০ : ০৪)

একজন সাধারণ পাঠক এই আয়াতগুলিকে কুরআন মাজিদের একটি অসঙ্গতি বলে ধরে নিতে পারে। বর্তমানে আপেক্ষিক তত্ত্ব (The theory of relativity) প্রমাণ করেছে যে, সময় হল একটি আপেক্ষিক ধারণা। আর তাই তা পরিবেশ ও অবস্থা অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন দেখিয়েছেন, সময়- ভর ও গতিবেগের ওপর নির্ভরশীল এবং তা অভিকর্ষশক্তির ওপরও নির্ভর করে। এখন এটা প্রমাণিত যে, পৃথিবীতে ও মহাশূন্যে সময়ের ব্যাপারটি একই রকম নয়। কুরআন মাজিদ সময়ের এই আপেক্ষিকতার ধারণার সত্যতা স্বীকার করেছে আইনস্টাইন তা আবিষ্কার করারও শত শত বছর আগে।

বিগত পৃষ্ঠাগুলি কুরআন মাজিদের বিস্ময়কর প্রকৃতির সঙ্গে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। পৃথিবীর আকৃতি-সম্পর্কিত বিস্ময়কর বর্ণনা, কুরআন মাজিদে শব্দসমূহের সংখ্যাগত সাদৃশ্য, মহাশূন্যে মানুষের পরিভ্রমণ ইত্যাদি আরও উজ্জ্বল প্রমাণ সরবরাহ করে যে, কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার কালাম। এই পৃষ্ঠাগুলিও এমন অনেক ফেনোমেনার বর্ণনা দেয় যা ছিল সেই পরিবেশে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, যেখানে কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও, কুরআন মাজিদ এসব ফেনোমেনার যথাযথ ও সঠিক বর্ণনা প্রদান করে। অধিকন্তু এই পৃষ্ঠাগুলি এমন অনেক ঘটনারও বর্ণনা দেয় যা ছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অজানা এবং সেসব লোকদেরও অজ্ঞাত যাদের প্রতি এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। তথাপি এসব বর্ণনার প্রতিটি সত্য ও যথাযথ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী যুগের মুসলমানরা এসব আয়াতকে কুরআন মাজিদের রহস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। যতদিন তারা এসব রহস্যের পাঠোদ্ধারের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন নি, তারা সেগুলিকে আল্লাহ তাআলার কালাম বলে গ্রহণ করে নিয়েছিল। মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী যুগের মুসলমানরা তাদের জ্ঞানের পরিসীমা অনুসারে এসব ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়। এভাবে প্রত্যেক যুগের মুসলমানরাই কুরআন মাজিদের কিছু কিছু রহস্যকে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বাস্তবতায় রূপায়িত করেন। এভাবেই কুরআন মাজিদ সকল প্রজন্মের মানুষের জন্যে একটি জীবন্ত মুজিজা হিসেবে চলমান থেকেছে। কুরআন মাজিদ সর্বদাই তার

শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে এবং তা ভবিষ্যতেও সর্বদা মানব জ্ঞানের পরিধিকে ছাপিয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখবে। এটি মানুষের জন্যে সর্বদা একটি শাশ্বত চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিরাজিত থাকবে। সব যুগের মানুষই কুরআন মাজিদের নতুন নতুন মুজিজা আবিষ্কার করেছে এবং এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

> **আর আসমানসমূহ ও জমিনে কত নিদর্শন রয়েছে, যা তারা অতিক্রম করে চলে যায়, অথচ সেগুলো থেকে তারা বিমুখ। তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তবে (ইবাদতে) শিরক করা অবস্থায়। আর তারা কি নিরাপদ বোধ করছে যে, তাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সর্বগ্রাসী আজাব আসবে না, অথবা হঠাৎ তারা টের না পেতেই কিয়ামত উপস্থিত হবে না?**
> (ইউসুফ, ১২ : ২০৫-২০৭)

নবম অধ্যায়

কুরআন মাজিদের ভবিষ্যৎবাণী সংক্রান্ত মুজিজাসমূহ

কুরআন মাজিদ- জ্যোতিষশাস্ত্রের যে কোনো গ্রন্থের বিপরীতে, কোনো বিশেষ ঘটনা কিংবা তারিখের পরিভাষায় ভবিষ্যৎবাণী করে না। পক্ষান্তরে কুরআন মাজিদের অসংখ্য আয়াত বিভিন্ন ব্যক্তি কিংবা গোত্র সম্পর্কে সুখবর কিংবা আযাবের ভবিষ্যৎবাণী প্রদান করে। যেমনটি তা ভবিষ্যৎবাণী প্রদান করে বিভিন্ন ব্যক্তি, স্থান কিংবা বস্তুর স্থায়ী চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। যখন এই আয়াতগুলি নাজিল হয় তখন মনে হচ্ছিল যেন এসব ভবিষ্যৎবাণী

একেবারেই অসম্ভব। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে, তার সবগুলিই ছিল সন্দেহাতীতভাবে সত্য। এই আয়াতসমূহের বাস্তবতাকে কাকতালীয় ব্যাপার, সম্ভাব্যতা কিংবা সুচিন্তিত ধারণা বলে আখ্যা দেয়া যায় না। প্রত্যেক সম্ভাব্যতাই সঠিক কিংবা ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ধারণ করে। অনুরূপভাবে, একটি সুচিন্তিত ধারণা ও প্রকৃতার্থে সত্য কিংবা মিথ্যা হতে পারে। এভাবে তা কুরআন মাজিদের অন্য একটি মুজিজা যে, তার সকল ভবিষ্যৎবাণীই সত্য হিসেবে দেখা দিয়েছে। বলাবাহুল্য, কেবল আল্লাহ তাআলারই ভূত-ভবিষ্যৎ সবকিছুর যথার্থ জ্ঞান রয়েছে। বাস্তবতা হল, কুরআন মাজিদের সবকটি ভবিষ্যৎবাণীই সত্য হিসেবে দেখা দিয়েছে। অতএব তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, কুরআন মাজিদ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ তাআলারই পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। নিম্নে কুরআন মাজিদের কিছু আয়াত তুলে ধরা হয়েছে, যা কিছু বিশেষ বিশেষ ভবিষ্যৎবাণী ধারণ করে।

এসব ভবিষ্যৎবাণীর অধিকাংশই ইসলামের প্রথম দিককার ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যে ব্যক্তি ইসলামের ইতিহাসের সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত নয় সে এসব ঘটনা উপলব্ধি করতে পারবে না, যদিও চক্ষুস্মান ও বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই এসব ভবিষ্যৎবাণী এখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

মুজিজা নং– ১১৯

রোমানদের বিজয়

> **রোমানরা পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী অঞ্চলে। আর তারা তাদের এ পরাজয়ের পরে অচিরেই বিজয়ী হবে। কয়েক বছরের মধ্যেই। ভূত ও ভবিষ্যতের সব ফয়সালা আল্লাহরই। আর সেদিন মুমিনরাও আনন্দিত হবে। (রুম, ৩০ : ০২-০৪)**

এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের ৬ বছর পূর্বে, মোতাবেক ৬১৫-১৬ খৃস্টাব্দে। এই

সময় পারসিয়ানরা রোমানদের পরাজিত করে এবং তাদেরকে জেরুজালেমসহ তাদের অধিকাংশ ভূখণ্ড থেকে উচ্ছেদ করে। এটি সম্পূর্ণ কল্পনাতীত ছিল যে, অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই দৃশ্যপট সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। আর রোমানরা আক্রমণ করে পারসিয়ানদেরকে একই ধরনের পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করাবে। যদিও কুরআন মাজিদ তেমনটি ভবিষ্যৎবাণী প্রদান করে। মক্কার কাফিররা একথা শুনে এতই বিস্মিত হয় যে, তারা আবু বকর রা.- যিনি সর্বপ্রথম পুরুষ হিসেবে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন-এর সঙ্গে একথার সত্যতার বিরুদ্ধে বড় ধরনের বাজি ধরে বসে। ঠিক আট বছরের মাথায় এই ভবিষ্যৎবাণী বাস্তব রূপ লাভ করে। রোমানরা কেবল তাদের হারানো এলাকাগুলি ফিরেই পায় নি, বরং পারস্য সম্রাজ্যকে সংকুচিত করে পতনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

যেহেতু রোমানরা ছিল খৃস্টান এবং পারসিকরা অগ্নিপূজারী, তাই মুসলমানদের সহানুভূতি ছিল রোমানদের প্রতি এবং মক্কার কাফেরদের সহানুভূতি ছিল পারসিকদের প্রতি। অতএব পারসিকদের কাছে রোমানদের পরাজয় মুসলমানদের ব্যথিত করল। কুরআন মাজিদ এই আয়াতগুলিতে এও ভবিষ্যৎবাণী প্রদান করে যে, মুসলমানরা অচিরেই আনন্দিত হবে। এই ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তবায়ন ঘটে একটি বিস্ময়কর পন্থায়। দ্বিতীয় হিজরিতে বদর যুদ্ধ ছিল এক হাজার (১,০০০) সশস্ত্র কাফিরদের সঙ্গে ৩১৩ জনের একটি দুর্বল নিরস্ত্র মুসলিম বাহিনীর প্রথম মুখোমুখি সংঘর্ষ। মুসলমানরা সব ধরনের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে, কাফিরদের পরাজিত করে। এই বিজয় প্রকৃতই মুসলমানদের জন্য আনন্দ ও খুশি বয়ে এনেছিল। এটি একটি বিস্ময়কর কাকতালীয় ব্যাপার যে, মুসলমানদের কাছে রোমানদের বিজয়ের সংবাদ ঠিক সেদিনই এসে পৌঁছেছিল যেদিন মক্কার মুশরিকদেরকে বদর প্রান্তরে তারা পরাজিত করেছিল। কুরআন মাজিদের উভয় ভবিষ্যৎবাণীই, এভাবে, বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ পায়।

মুজিজা নং– ১২০

আবু লাহাবের ধ্বংস

‘ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু’হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ এবং যা সে অর্জন করেছে তা তার কাজে আসবে না। অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে।’ (লাহাব, ১১১ : ০১-০৩)

এটিই কুরআন মাজিদের একমাত্র স্থান যেখানে ইসলামের একজন শত্রুকে তার নাম ধরে তিরস্কৃত করা হয়েছে। আবু লাহাব ছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা এবং তার সবচেয়ে কঠিন শত্রু। সে ছিল খুব ধনী এবং মক্কার অন্যতম প্রভাবশালী নেতা। সে তার সকল সহায়-সম্পত্তি ও ক্ষমতা নিযুক্ত করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কষ্ট ও নির্যাতন পৌঁছাতে এবং তাঁকে ইসলাম প্রচার থেকে নিবৃত করতে। সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটবর্তী প্রতিবেশী হওয়ায় প্রায় প্রতি রাতেই তাঁর নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাত। এও বর্ণিত আছে যে, সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবারের সদস্যদেরকে প্রাত্যহিক খাবার প্রস্তুত করার ক্ষেত্রেও সে ব্যাঘাত ঘটাত। উপরোল্লিখিত আয়াতগুলি আবু লাহাব সম্পর্কে কিছু বিশেষ ভবিষ্যৎবাণী প্রদান করে।

কুরআন মাজিদের বর্ণনা, ‘অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে।’ ভবিষ্যৎবাণী প্রদান করে যে, সে কাফির হিসেবেই মৃত্যুবরণ করবে। আবু লাহাব যদি তার ন্যুনতম জ্ঞানকে ব্যবহার করত, সে লৌকিকভাবে (মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হলেও) ইসলাম গ্রহণ করতে পারত এবং এই দাবি করতে পারত যে, কুরআন মাজিদের এই বর্ণনা ‘সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে’ মিথ্যা। তবে, বাস্তবতা হল, সে কাফির হিসেবেই মৃত্যুবরণ করেছে। তার চূড়ান্ত আবাস হবে জাহান্নামের তেমন একটি স্থান, যাকে কুরআন মাজিদ ‘একটি লেলিহান অগ্নিকুণ্ড’ বলে আখ্যা দিয়েছে। কুরআন মাজিদের বর্ণনা, ‘ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।’ এটিও একটি ভবিষ্যৎবাণী। এখানে যা ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন ঘটনাকে কুরআন মাজিদে অতীতকালীন শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, যা ছয় বছর পরে বাস্তব রূপ লাভ করে, যখন মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লাঞ্ছনাদায়ক পরাজয়ের মনোকষ্টে ভুগছিল।

কুরআন মাজিদের ভাষ্য, ‘তার ধন-সম্পদ এবং যা সে উপার্জন করেছে তা তার কাজে আসবে না।’- বাস্তবরূপ লাভ করেছে ধিক্কারজনক ও বীভৎস মৃত্যুর মাধ্যমে। সে সংক্রামক ফুঁসকুড়ি রোগে আক্রান্ত হয়েছিল এবং পরিবারের সকল সদস্য থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। এমনকি তার মৃত্যুর পরও কেউ তিনদিন যাবৎ তার মৃতদেহের কাছে আসে নি। যখন মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করে, মক্কাবাসীরা তার সন্তানদের ধিক্কার দিতে শুরু করল। তখন তারা কিছু লোক ভাড়া করে। তারা তার মৃতদেহটিকে কাঠ দিয়ে ঠেলে ঠেলে একটি গর্তে ফেলে দেয়। তার সম্পদ তাকে কোনো সাহায্য করতে পারে নি, এমনকি সাধারণ দাফনকার্য পর্যন্ত তার ভাগ্যে জোটে নি। কুরআন মাজিদের এই তিন ভবিষ্যৎবাণীই শব্দে শব্দে বাস্তব রূপ লাভ করেছে।

মুজিজা নং– ১২১

অবিশ্বাসী কাফিরদের পরাজয়

(হে মুহাম্মদ) তুমি কাফিরদেরকে বল, তোমরা অচিরেই পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হবে। আর সেটি কতইনা নিকৃষ্ট আবাসস্থল। (আলে-ইমরান, ০৩ : ১২)

তোমরা (মক্কার) কাফিররা কি তাদের (নূহ, সালিহ, লূত প্রমুখের কওম) থেকে ভাল? না কি তোমাদের জন্য মুক্তির কোনো ঘোষণা রয়েছে (আসমানি) কিতাবসমূহে? না কি তারা বলে, ‘আমরা সংঘবদ্ধ বিজয়ী দল’? (হে মুহাম্মদ) তাদের সংঘবদ্ধ দলটি শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পিঠ দেখিয়ে পালাবে। (ক্বামার, ৫৪ : ৪৩-৪৫)

সুরা ক্বামারের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে। তখন মুসলমানরা এতই নিপীড়িত ও দুর্বল ছিল যে, তাদের একদলকে ইথিওপিয়ায় হিজরত করতে হয়েছে। অপরদিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবারবর্গসহ মক্কার বাইরে একটি ঊষর উপত্যকায় নির্বাসিত ও বয়কটের স্বীকার হন। এমন পেক্ষাপটে এই আয়াতসমূহ মক্কার কাফিরদের পরাজয়ের ভবিষ্যৎবাণী প্রদান করে। সুরা আলে ইমরানের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাদানী জীবনের প্রথম দিকে। এসময় মুসলমানরা ছিল সর্বদা উৎকণ্ঠা ও ভীতির মধ্যে। মক্কার কাফিররা তখন মদিনার ওপর একটি বড় ধরনের আক্রমণ অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। একই সময়ে মদিনার ইহুদিরা মক্কাবাসীদের সঙ্গে মিলে মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য ফন্দি আঁটছিল। অধিকন্তু মুহাজির মুসলিমরা তাদের সকল সহায়-সম্পত্তি মক্কায় ফেলে এসেছিল এবং মদিনার মুসলিম অধিবাসীদের ওপর তারা অর্থনৈতিক ও বস্তুগতভাবে অতিরিক্ত ভার হিসেবে আপতিত হয়েছিল। এমনতর পরিস্থিতিতে কুরআন মাজিদ ভবিষ্যৎবাণী করে যে, কেবল মদিনার ইহুদি এবং মক্কার কাফিররা নয় বরং যারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছে শীঘ্রই তারা পরাজিত হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে, এই ভবিষ্যৎবাণী বাস্তব রূপ লাভ করে হিজরতের দ্বিতীয় বছর, যখন কাফির বাহিনী বদর প্রান্তরে পরাজিত হয়।

মুজিজা নং– ১২২

মক্কা থেকে অমুসলিমদের বিতাড়ন

> **আর তাদের (অমুসলিমদের) অবস্থা এমন ছিল যে, তারা তোমাকে (মক্কার) জমিন থেকে উৎখাত করে দিবে যাতে তোমাকে সেখান থেকে বের করে দিতে পারে এবং তখন তারা তোমার পরে স্বল্প সময়ই (মক্কায়) টিকে থাকতে পারত।** (বনী ইসরাইল, ১৭ : ৭৬)

এসব আয়াত অবতরণের এক বছর পর মক্কার মুশরিকরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে এবং তাকে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য করে। সে সময় কেউ এ কথা বিশ্বাস করতে পারে নি যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরবর্তীতে মক্কা থেকে মুশরিকদের বহিষ্কার করবেন। ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে, হিজরী অষ্টম বর্ষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন বিজেতার বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন। অধিকন্তু, দুই বছর পর, কুরআন মাজিদের নবম সূরায় বর্ণিত আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুসারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে সকল মুশরিক ও অমুসলিমদের বহিষ্কার করেন। কুরআন মাজিদের এই ভবিষ্যৎবাণী তার পূর্ণ মর্ম সহকারে বাস্তবতার রূপ পরিগ্রহ করে এবঙ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে কোনো কাফিরই মক্কায় বসবাস করত না।

মুজিজা নং– ১২৩

মদিনা থেকে মুনাফিকদের বহিষ্কার

> **যদি মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ব্যধি রয়েছে তারা এবং (মদিনা) শহরে মিথ্যা সংবাদ প্রচারকারীরা বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে ক্ষমতাবান করে দেব। অতঃপর তারা সেখানে তোমার প্রতিবেশি হয়ে অল্প সময়ই থাকবে। (আহযাব, ৩৩ : ৬০)**

মদিনায় মুসলমানদের শক্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুনাফিকদের সংখ্যা দিন দিন ভারি হতে থাকে। তাদের কেউ কেউ যোগ দেয় ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য। অন্যরা যোগ দেয় মুসলমানদের ঐক্য ও শক্তিকে বিনষ্ট করার জন্য।

৩য় হিজরি সনে উহুদ যুদ্ধে ৩,০০০ সৈন্যের একটি মুসলিম বাহিনী মক্কা থেকে আক্রমণ করতে আসা ১০,০০০ সশস্ত্র কাফির দলের মুকাবিলায় মদিনা থেকে রওনা করে। পরবর্তীতে ৭০০ জনের একটি দল মুসলিম বাহিনী থেকে একটি খোঁড়া অজুহাতে মদিনায় ফিরে আসে। তাদের সকলেই ছিল মুনাফিক। এটি পাঠককে মদিনায় মুনাফিকদের সংখ্যা ও শক্তি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেতে সাহায্য করবে। এই আয়াতে কুরআন মাজিদ মুনাফিকদের সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী প্রদান করে যে, তারা মদিনায় থাকতে পারবে না। ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, মুনাফিকদের প্রতিপত্তি সেখানে ধুলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশাতেই মদিনা একটি নির্ভেজাল আদর্শ মুসলিম সমাজে পরিণত হয়েছিল।

মুজিজা নং– ১২৪

মুমিনদের বিজয়

> **তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এই মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে জমিনে প্রতিনিধিনত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি (এর অবস্থা) শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন।**
> (নূর, ২৪ : ৫৫)

এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যখন সবেমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করেছেন। এটি অবশ্যই লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, তখন মুসলমানরা নিত্য ভয়-ভীতি ও শংকায় কালাতিপাত করতেন। মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে আক্রমণের শংকা সদা বিরাজ করত এবং মদিনার ইহুদিদের বিরুদ্ধাচারণের ভয়ও ছিল। পরিস্থিতি এতই সঙ্কটাপন্ন ছিল যে, কিছু কিছু সাহাবি কেঁদে উঠে বলেন, 'এমন কোনো দিন ছিল না যখন আমরা আমাদের শরীর থেকে রণসজ্জা ত্যাগ করতে পারি এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে আক্রমণের ভয় ব্যতিরেকে কোনো সকাল কিংবা সন্ধ্যা অতিক্রম করতে পারি।' এই ছিল অবস্থা যখন কুরআন মাজিদ তিনটি বিশেষ ভবিষ্যৎবাণী প্রদান করে। প্রথমত. আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে তাদের জমিনে শক্তিশালী করবেন। দ্বিতীয়ত. তিনি তাদের দীনকে (ইসলামকে) সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। আর তৃতীয়ত. তিনি তাদের ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দেবেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, খায়বার, যা ছিল ইহুদিদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধ, যা সংগঠিত হয় হিজরি সপ্তম শতাব্দীতে-এতে ইহুদিরা মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। দেশের রাজধানী শহর মক্কার কাফিররা মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করে হিজরি অষ্টম শতাব্দীতে। ইসলাম তখন রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয় এবং মুসলমানরা একটি শান্তিময় ও নিরাপদ রাষ্ট্র লাভ করে। এভাবে দশ বছরের সংক্ষিপ্ত পরিসরে কুরআন মাজিদের ভবিষ্যৎবাণীসমূহ বাস্তবরূপ লাভ করে।

মুজিজা নং– ১২৫

মুহাজিরদের জন্য একটি উত্তম আবাসভূমি

> **আর যারা হিজরত করেছে আল্লাহর রাস্তায় অত্যাচারিত হওয়ার পর, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দান করব। আর আখিরাতের প্রতিদান তো বিশাল, যদি তারা (তা) জানত।**
> (নাহল, ১৬ : ৪১)

ইসলামের সূচনালগ্নে কাফেরদের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে মক্কা থেকে মুসলমানদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে হিজরত করতে হয়। প্রথমে তারা হিজরত করে আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়ায়) এবং পরবর্তীতে মদিনায়। উভয় সময়েই হিজরতকালে তাদের সকল সহায়-সম্পত্তি মক্কায় ফেলে যায়। ইতিহাস বলে, যখন তারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করে তখন আবিসিনিয়ার বাদশা তাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করে। পরবর্তীতে যখন তারা মদিনায় হিজরত করে, মদিনার মুসলমানরা তাদের জন্যে তাদের গৃহ ও অন্তরের দরজা উন্মোচিত করে দেয়। তারা কেবল তাদেরকে আশ্রয়ই প্রদান করে নি, বরং তাদের অর্ধেক সম্পত্তির অধিকারীও বানিয়ে দেয়। এমনকি যাদের দু'জন স্ত্রী ছিল একজনকে তালাক দিয়ে তার মুহাজির মুসলিম ভাইকে দিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা এভাবে ইহজগতে তাদের উত্তম আবাস প্রদানের ভবিষ্যৎবাণীকে বাস্তবায়ন করেন।

মুজিজা নং– ১২৬

একটি বিস্ময়কর ও চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতিশ্রুতি

> **'নিশ্চয় আমি তোমার জন্য মঞ্জুর করেছি একটি সুস্পষ্ট বিজয়।**
> (ফাত্হ, ৪৮ : ০১)

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় একটি অনন্য সাধারণ পরিস্থিতিতে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের ছয় বছর পর ১৪০০ সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে ওমরাহ করার উদ্দেশে মদিনা থেকে মক্কার দিকে রওনা হন। মক্কাবাসীরা মুসলামনদের ওমরাহ পালন প্রতিহত করতে তাঁকে শহরে

প্রবেশে বাধা দেয়। অবস্থা এতই নাজুক হয়ে ওঠে যে, মুসলমান ও মক্কাবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। মক্কাবাসীরা তখন একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য একটি প্রতিনিধি দল পাঠায়। চুক্তির পুরো প্রক্রিয়া এবং তার অধিকাংশ ধারা বাহ্যত মুসলামানদের জন্য পরাজয় ও অবমাননাকর ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেখককে লিখতে বললেন, 'এটি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ও মক্কাবাসীদের মধ্যে সন্ধিপত্র।' তখন মক্কার প্রতিনিধি দলের প্রধান বলল, সে তাঁকে আল্লাহর রাসূল মনে করে না। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেখককে 'আল্লাহর রাসূল' কথাটি মুছে ফেলতে বললেন এবং লিখতে বললেন, এটি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ ও মক্কাবাসীদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র।' এটি মুসলমানদেরকে খুব বেশি মনঃক্ষুণ্ন করে।

চুক্তিপত্রে আরও বলা হয়, যদি কোনো মুসলমান মক্কা থেকে মদিনায় পালিয়ে যায় তবে তাকে মক্কার কাফিরদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। পক্ষান্তরে, যদি কোনো মুসলমান মদিনা থেকে মক্কায় পালিয়ে আসে তবে তাকে মদিনার মুসলামদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে না। এটি মুসলমানদের আরও বেশি পীড়িত করে। যখন সন্ধিচুক্তি লিখিত হচ্ছিল এমন সময় একজন পলাতক মুসলিম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসলেন এবং তাকে মুসলমানদের সঙ্গে থাকতে দিতে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সাহাবায়ে কেরাম দেখতে পেলেন, লোকটি শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং তার শরীরে দৈহিক নির্যাতনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। যেহেতু সন্ধিচুক্তিতে এখনও সই করা হয় নি, তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটিকে মুসলমানদের সঙ্গে অবস্থানের অনুমতি দিতে চাইলেন। মক্কার লোকেরা যুক্তি পেশ করল, এটিও সন্ধির একটি ধারা এবং লোকটিকে মক্কাবাসীদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পরিস্থিতিতে তা মেনে নিলেন। মুসলমানরা এতে সাংঘাতিকভাবে মর্মাহত হল এবং এতে তারা পরাজয় ও অবমাননা বোধ করল। এহেন পরিস্থিতিতে এই বার্তা নিয়ে ওহি অবতীর্ণ হয় যে, আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে একটি সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছেন।

পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে, এই চুক্তি ছিল মুমিনদের জন্য সুস্পষ্ট বিজয়। এই চুক্তি মদিনার মুসলমানদের অধিক নিরাপত্তা ও শান্তি প্রদান করে।

তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এবং চারপাশের সকল গোত্র ও তাদের এলাকাগুলো জয় করে নেয়। দুই বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে তারা এতই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, অষ্টম হিজরি সনে তাঁরা ১০,০০০ সৈন্যের একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে এবং কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই শহরটি অধিকার করে নেয়। যখন মক্কা মুসলমানদের অধীনে এল আরব উপদ্বীপের সকল প্রান্ত থেকে বিভিন্ন গোত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে ইসলামে দীক্ষিত হতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যে পুরো দেশ ইসলামের পতাকাতলে চলে এল। মুসলমানরা তখন বুঝতে পারল, সন্ধিচুক্তি তাদের জন্য একটি সুস্পষ্ট বিজয় হিসেবেই প্রমাণিত হয়েছে।

মুজিজা নং– ১২৭

ইহুদিদের সঙ্গে মুনাফিকদের বিশ্বাসঘাতকতা

> **তুমি কি মুনাফিকদের দেখনি যারা আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে তাদের ভাইদেরকে (ইহুদিদের) বলে, 'তোমাদের বের করে দেয়া হলে আমরাও অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে বেরিয়ে যাব এবং তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব।' আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী। তারা (ইহুদিরা) যদি বহিস্কৃত হয় এরা (মুনাফিকরা) কখনো তাদের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে না। আর তাদের সঙ্গে যদি যুদ্ধ করা হয় এরা কখনো তাদের সাহায্য করবে না।** (হাশর, ৫৯ : ১১-১২)

আয়াতদ্বয় ইহুদি গোত্র বনু নাযিরকে নির্দেশ করছে। তারা মুসলমানদের সঙ্গে একটি সন্ধিচুক্তি সই করেছিল। যেহেতু তারা বারবার তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে চতুর্থ হিজরি সনে দশ দিনের মধ্যে মদিনা ছেড়ে অনত্র চলে যেতে আল্টিমেটাম (সময়সীমা বেঁধে) দেন। মদিনার মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে এই

বলে বার্তা পাঠায় যে, সে তাদের সাহায্যে ২,০০০ সৈন্যের একটি দল নিয়ে আসছে এবং সে তাদেরকে মদিনা ছেড়ে যেতে বারণ করে। সে এও নিশ্চয়তা দেয় যে, তারা যদি মদিনা ছেড়ে চলে যায়, সেও তাদের অনুগামী হবে। ইতিহাস বলে, বনু নাযির দশ দিনের মধ্যে মদিনা থেকে বহিস্কৃত হয়। মুনাফিকরা না তাদেরকে সাহায্য করতে আসে, আর না মদিনা থেকে চলে যাওয়ার সময় তাদের অনুগামী হয়।

মুজিজা নং– ১২৮

শত্রুদের ইসলাম গ্রহণ

> **যাদের সঙ্গে তোমরা (এখন) শত্রুতা করছ, আশা করা যায় আল্লাহ তোমাদের ও তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আর আল্লাহ তাআলা (সবকিছুর ওপর) সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।** (মুমতাহিনা, ৬০ : ০৭)

মুসলমানরা পৌত্তলিক কাফেরদেরকে ঘৃণা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তাদের হাতে তারা অকথ্য নির্যাতন ভোগ করেছে। এই মূর্তিপুজকরা কেবল তাদেরকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং তারা মদিনায় তাদের ছোট্ট কমিউনিটিকেও ধ্বংস করতে সচেষ্ট ছিল। এটি একটি সম্পূর্ণ অসম্ভব বিষয় যে, মুসলমানরা তাদেরকে কখনো ভালোবসবে। কিন্তু ইতিহাস বলে, মূর্তিপূজারীদের অধিকাংশ নেতাই পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে। আবু সুফিয়ান, সাহল ইবনে উমর, হাকীম ইবনে হাজাম, ইকরামা ইবনে আবু জেহেলের মত ব্যক্তিগণ, যারা ছিল ইসলামের ঘোর দুশমন, তারা পরবর্তীতে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করে এবং সকল মুসলমানের ভালবাসা ও বন্ধুত্ব লাভ করে।

মুজিজা নং– ১২৯

কিবলা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইহুদিদের আপত্তি

> **অচিরেই নির্বোধ লোকেরা (ইহুদি ও মুনাফিকরা) বলবে, কী সে তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) তাদের কিবলা (মসজিদে আকসার দিকে ফিরে ইবাদত করা) থেকে ফিরাল, যার ওপর তারা ছিল?** (বাকারা, ০২ : ১৪২)

যখন নামাজ ফরজ হয়, মুসলমানরা প্রথমদিকে ১৬-১৭ মাস যাবৎ জেরুজেলেমের (বায়তুল মুকাদ্দাসের) দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করে। পরবর্তীতে নামাজের দিক মক্কার কাবা শরিফের দিকে পরিবর্তিত হয়। এই আয়াতটি মুনাফিক ও মদিনার ইহুদিদেরকে কুরআন মাজিদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যে একটি সহজ যুক্তি সরবরাহ করে। তারা সকলে মুসলমানদের নতুন কিবলাকে মেনে নিতে পারত এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অভিযুক্ত করতে পারত যে, তাদের ব্যাপারে যে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তা ছিল ভুল। তবে বাস্তবতা হল, তারা কিবলা পরিবর্তনে আপত্তি জানায় এবং কুরআন মাজিদের ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণতা লাভ করে।

মুজিজা নং– ১৩০

শত্রুদের ইসলাম গ্রহণ

> **পেছনে পড়ে থাকা বেদুঈনদেরকে বল, এক কঠোর যোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে শীঘ্রই তোমাদেরকে ডাকা হবে। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে।** (ফাতাহ, ৪৮ : ১৬)

এই আয়াত দু'টি খুব সুস্পষ্ট ও বিশেষ ভবিষ্যৎবাণী প্রদান করে। প্রথমত. মরুর আরব বেদুঈনদেরকে ডাকা হবে শক্তিধর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। দ্বিতীয়ত. যুদ্ধ চলতে থাকবে মুসলমানরা বিজয় লাভের পূর্ব পর্যন্ত। আরব উপদ্বীপকে ঘিরে যে দুটি শক্তিধর জাতি ছিল তারা হল, রোম সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্য। ইতিহাস বলে, মুসলমানরা দ্বিতীয় খলিফা ওমর রা.-এর সময়কালে (১৩-২৩ হিজরি) পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করে। পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরি ১৪ সালে কাদিসিয়া নামক স্থানে। এটি ছিল সেই স্থান যেখানে পারস্য বাহিনী পূর্ণ শক্তি নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হয়। যুদ্ধ চারদিন স্থায়ী হয় এবং পারস্য বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে তার সমাপ্তি ঘটে। হিজরি ১৫ সালে ইয়ারমুকের যুদ্ধ ছিল মুসলিম বাহিনী ও রোমান বাহিনীর মধ্যে চূড়ান্ত মুকাবেলা। মুসলমানরা রোমানদের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করে এবং রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস কনস্টান্টিনোপলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এভাবে কুরআন মাজিদের উভয় ভবিষ্যৎবাণীই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সত্যে পরিণত হয়।

মুজিজা নং– ১৩১

ইহুদি ও খৃস্টানদের ভূমিকা

> **তুমি অবশ্যই মুমিনদের জন্য মানুষের মধ্যে শত্রুতায় অধিক কঠোর পাবে ইহুদিদেরকে ও মুশরিকদেরকে। আর মুমিনদের জন্যে বন্ধুত্বে তাদের জন্যে নিকটতর পাবে তাদেরকে যারা বলে, 'আমরা নাসারা (খ্রিস্টান)'**। (মায়েদা, ০৫ : ৮২)

এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট ঘোষণা, সর্ববিষয়ে যার জ্ঞান অগাধ ও অসীম। বিগত চৌদ্দশত বছর যাবৎ এই ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা প্রত্যক্ষ করা গেছে। আমাদের বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে তা আরও অধিক পরিষ্কারভাবে দেখা যেতে পারে। ইহুদিরা ফিলিস্তিন সমস্যাকে

একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক সমস্যা থেকে বিশ্বের সকল মুসলমানের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধের পরিস্থিতিতে পরিণত করেছে। যদি ইহুদিরা তাদের ন্যূনতম বিবেচনা শক্তি কাজে লাগাত, তারা ভাণ করে হলেও মুসলমানদের প্রতি তাদের ভালবাসা ও দয়া দেখাত এবং এ কথা দাবি করতে পারত যে, কুরআন মাজিদ তাদের সম্পর্কে মিথ্যা ভবিষ্যৎবাণী প্রদান করেছে। এটি কুরআন মাজিদের এখনো মুজিজা যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই বিবেচনা বোধ থেকে বঞ্চিত রেখেছেন।

মুজিজা নং– ১৩২

ইহুদিদের ওপর খৃস্টানদের আধিপত্য

> **হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। যেমন মরিয়ম পুত্র ঈসা হাওয়ারিদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারিগণ বলল, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী। তারপর বনি ইসরাইলের মধ্য থেকে একদল ঈমান আনল এবং অপর একদল প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর যারা ঈমান আনল আমি তাদেরকে তাদের শত্রুবাহিনীর ওপর শক্তিশালী করলাম। ফলে তারা বিজয়ী হল।** (সা’ফ, ৬১ : ১৪)

খৃস্টানরা বর্তমানে ইহুদিদের ওপর সংখ্যা, এলাকা ও ক্ষমতার বিচারে বিস্ময়করভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তারা সকল আন্তর্জাতিক বিষয়ে ইহুদিদের ওপর প্রবল। লক্ষণীয় বিষয় হল, ইসরাইল রাষ্ট্র যে সকল ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করে তা পুরোপুরি খৃস্টান বিশ্বের ওপর নির্ভরশীল। কুরআন মাজিদের শত শত বছর পূর্বেরকৃত এই ভবিষ্যৎবাণী ইহুদিদের পুরো ইতিহাসে সর্বদা বাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়েছে এবং চিরকালই এই বাস্তবতা অক্ষুণ্ন থাকবে।

মুজিজা নং– ১৩৩

খৃস্টান ও ইহুদিদের পারস্পরিক সম্পর্ক

> **হে মুমিনগণ, ইহুদি ও নাসারাকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হেদায়েত দেন না।** (মায়েদা, ০৫ : ৫১)

চারপাশে ইহুদি ও খৃস্টানদের বর্তমানের পারস্পরিক ঘটনা-প্রবাহের দিকে তাকিয়ে একজন সাধারণ পাঠক এই আয়াতে কুরআন মাজিদের মুজিজা খুঁজে পাবে না। একজন পাঠক কেবল তখনই এই আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যখন সে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে ইহুদি ও খৃস্টানদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করবেন।

ইহুদিরা বহু শতাব্দী পর্যন্ত আরবে বসবাস করত। দু’টি প্রধান শহরে তাদের শক্তিশালী বসতি ছিল। একটি মদিনা এবং অপরটি খায়বার। তারা ছিল ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি। তারা মাত্রাতিরিক্ত সুদের ওপর টাকা ঋণ দিত এবং এই শহরদ্বয়ের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করত। তারা এতই শক্তিশালী ছিল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় হিজরত করেন, তিনি তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য একটি বিশেষ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। আরবে কোনো খৃস্টানপল্লী ছিল বলে ইতিহাসে নজির নেই। অধিকন্তু ইতিহাসে ইহুদি কিংবা খৃস্টানদের কোনো ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক কিংবা মুসলামান ও খৃস্টানদের মধ্যে সম্পর্কের কোনো নজিরও নেই।

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল মদিনায় ৬ষ্ঠ হিজরির দিকে। সে সময় কেউ একথা ধারণা করতে পারে নি যে, মানব ইতিহাসে এমন একটি সময় আসবে যখন ইহুদি ও খৃস্টানরা পরস্পর বন্ধুতে পরিণত হবে। কুরআন মাজিদ এই ভবিষ্যৎবাণী প্রদান করে শত শত বছর পূর্বে।

মুজিজা নং– ১৩৪

মুশরিকদের মাধ্যমে তাদের ধর্মকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা

আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা নিজেদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে (তাদেরও অন্তর্ভুক্ত হয়ো না)। প্রত্যেক দলই নিজেদের যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত। (রুম, ৩০ : ৩১-৩২)

এই আয়াতে কুরআন মাজিদ তাদের অবস্থার বর্ণনা দেয় যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে শরীক করে। বলাবাহুল্য, বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক প্রভাবশালী ধর্ম হল খৃস্টান ধর্ম, যারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর সঙ্গে অন্য প্রভুকে শরীক করে। এই আয়াত বলে, এ সকল লোক তাদের ধর্মকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করবে এবং প্রত্যেক দলই নিজেদের বিশেষ বিশ্বাস নিয়ে আনন্দিত হবে। এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন মক্কায় কোনো খৃস্টান ছিল না। মক্কার অধিকাংশ লোকই ছিল মূর্তিপুজারী।

এই আয়াতে কুরআন মাজিদ ভবিষ্যৎবাণী প্রদান করে যে, খৃস্টানরা অবশেষে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবে। এখন যে কেউ এই ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা প্রত্যক্ষ করতে পারে। পুরো খৃস্টান বিশ্ব বর্তমানে বহুভাগে বিভক্ত, যেখানে একদল অন্যদলকে ভ্রান্ত বলে মনে করে। এভাবে পুরো ধর্মটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এদের প্রত্যেকেই নিজকে একটি ভিন্নধর্মের অনুসারী বলে মনে করে। এটি কুরআন মাজিদের অন্য একটি মুজিজা যে, কুরআন মাজিদ এই ভবিষ্যৎবাণীটি প্রদান করেছে শত শত বছর পূর্বে।

মুজিজা নং– ১৩৫

কুরআন মাজিদকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে নি

আল কুরআনের ১৬০ মুজিজা ও রহস্য

বাতিল এতে (কুরআন মাজিদে) অনুপ্রবেশ করতে পারে না, না পেছন থেকে, না সামনে থেকে, এটি প্রজ্ঞাময়, সপ্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত। (ফুসসিলাত, ৪১ : ৪২)

কুরআন মাজিদের ভাষ্যকারগণ বলেন, বাতিল এতে 'সামনে থেকে' বক্তব্যটির উদ্দেশ্য, কেউ কুরআন মাজিদের একটি সাধারণ আয়াতকে সরাসরি আক্রমণ কিংবা চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না। প্রমাণ করতে পারবে না তা অযথার্থ, মিথ্যা বা মেয়াদোত্তীর্ণ। আর 'পেছন থেকে বাতিল' দ্বারা উদ্দেশ্য, কেউ কোনো ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে কখনো এমন কিছু আবিষ্কার করতে পারবে না এবং এই চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম হবে না যে, কুরআন মাজিদের একটি সাধারণ আয়াতও বাস্তবিকভাবে ক্রটিপূর্ণ। বিগত চৌদ্দশ বছরের বিস্তৃত কাল পর্বে কুরআন মাজিদের এতদুভয় মুজিজা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

মুজিজা নং– ১৩৬

হজ্জের উদ্দেশ্যে সফর

আর (হে ইবরাহিম,) মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা দাও; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং কৃশকায় উটে চড়ে দূর-দূরান্তের পথ পাড়ি দিয়ে। (হজ্জ, ২২ : ২৭)

এখানে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণা করা প্রাসঙ্গিক মনে করছি। প্রথমত, আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে হজ্জের এই ঘোষণা দিতে বলেন যখন তিনি কাবা শরিফের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন- আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে। দ্বিতীয়ত, তিনি কাবা শরিফ নির্মাণ করেন একটি নিতান্ত ঊষর ও জনমানবহীন স্থানে। আমাদের আরও স্মর্তব্য

যে, যখন তিনি কাবা শরিফ নির্মাণ করেন তখন মক্কা শরিফে কোনো শহর ছিল না। তৃতীয়ত, কাবা শরিফ এমন এক অঞ্চলে নির্মিত হয় যাতে কোনো ধরনের সফর ও ভ্রমণের সুবিধাদি ছিল না। রাস্তা ও সরাইখানা তো দূরের কথা, বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে ভ্রমণকারীদের জন্যে কোথাও পানির ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল না। তথাপি কুরআন মাজিদ ভবিষ্যৎবাণী প্রদান করে যে, ভ্রমণকারীরা এই কষ্টকর ভ্রমণের ক্লান্তি সহ্য করবেন এবং দূর-দূরান্তের স্থান থেকে কাবা শরিফে এসে সমাগত হবেন। এটি একটি বাস্তব সত্য যে, এই ভবিষ্যৎবাণী বিগত চার হাজার বছর ধরে নিরন্তর বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ কাবা শরিফে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে হজ্জের সফরে আসে।

মুজিজা নং– ১৩৭

মক্কার প্রতিরক্ষা

> **তারা কি দেখে না যে, আমি (মক্কার) 'হারাম'কে নিরাপদ বানিয়েছি। অথচ তাদের আশপাশ থেকে মানুষদেরকে ছিনিয়ে নেয়া হয়? তাহলে কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?** (আনকাবুত, ২৯ : ৬৭)

এই আয়াত এবং কুরআন মাজিদের অন্য কিছু আয়াত মক্কাকে একটি শান্তি ও নিরাপত্তার শহর বলে ঘোষণা করেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে, মক্কা কখনো বৈদেশিক বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয় নি। আর না তাতে কখনো কোনো আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে মক্কা নিরন্তর শান্তি ও নিরাপত্তার যুগ প্রত্যক্ষ করেছে।

মুজিজা নং– ১৩৮

মক্কার জন্য ফল-ফলাদির যোগান

> **আমি কি তাদের জন্য (মক্কায়) এক নিরাপদ 'হারাম'-এর সুব্যবস্থা করি নি? যেখানে সব ধরনের ফলমূল আনিত হয় আমার পক্ষ থেকে রিজিক স্বরূপ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।** (কাসাস, ২৮ : ৫৭)

মক্কা কঠিন কঠিন শিলা ও বালিয়াড়ি বেষ্টিত একটি সম্পূর্ণ উষর ভূমি। শহরটিতে পানির কোনো প্রাকৃতিক উৎস নেই এবং তাতে বার্ষিক বৃষ্টির পরিমাণ ৫ ইঞ্চিরও কম। পক্ষান্তরে বছরের প্রতিটি দিন মক্কায় অসংখ্য মানুষ ভ্রমণে আসে। কেবল এক হজ্জ মৌসুমে মক্কায় ভ্রমণকারীদের সংখ্যা দুই মিলিয়ন (২০ লক্ষ) ছাড়িয়ে যায়। মক্কায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে ফলমূল ও শাক-সবজি আমদানির সর্বদা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। মক্কায় ভ্রমণকারী মাত্রেই দুটি বিষয়ে বিস্মিত হবেন। প্রথমত, মক্কায় ভ্রমণকারীর পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন তাতে ফলমূল ও শাক-সবজির কোনো ঘাটতি পড়ে না। দ্বিতীয়ত, সব ঋতুর ফলমূল ও শাক-সবজি মক্কায় সব সময় পাওয়া যায়।

মুজিজা নং– ১৩৯

দলে দলে মানুষের ইসলামে প্রবেশ

> **যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে আর তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দীনে দাখিল হতে দেখবে, তখন তুমি তোমার রবের সপ্রশংস তাসবিহ পাঠ কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।** (নাসর, ১১০ : ০১-০৩)

এই আয়াতসমূহ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ভবিষ্যৎবাণী প্রদান করে, যা কিছুটা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। প্রথম : কুরআন মাজিদের বর্ণনা, 'যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে' এটি মুসলমানদের একটি সুস্পষ্ট বিজয়ের আগাম বার্তা। কুরআন মাজিদের টীকাকারগণ বলেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়

খায়বার যুদ্ধের পর ৭ম হিজরিতে। আর এই ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তবায়ন ঘটে মক্কা বিজয় রূপে, ৮ম হিজরিতে। দ্বিতীয় ভবিষ্যৎবাণী পাওয়া যায় কুরআন মাজিদের এই বর্ণনায়- 'তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দীনে দাখিল হতে দেখবে।' ইতিহাস বলে, যখন মুসলমানদের হাতে মক্কার পতন হয়, আরব উপদ্বীপের চতুর্দিক থেকে অসংখ্য আরব গোত্র মক্কায় আগমন করে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর হাতে বায়আত হয়ে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করে। বস্তুত এত অধিক গোত্র মক্কায় আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করে যে, ইসলামের ইতিহাসে হিজরি ৯ম সালকে 'প্রতিনিধি আগমনের বছর' নামে আখ্যায়িত করা হয়। বাস্তবতা হল, কুরআন মাজিদের উপরোক্ত ভবিষ্যৎবাণী দুই বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের ভেতরে বাস্তবায়িত হয়। যা কুরআন মাজিদের মুজিজা বা বিস্ময়কর প্রকৃতির অন্য একটি সাক্ষ্য।

মুজিজা নং– ১৪০

মানব-জাতির রিযিকের বন্দোবস্ত

> **দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা কর না। আমিই তোমাদেরকে রিজিক দেই এবং তাদেরকেও।** (আনআম, ০৬ : ১৫১)
>
> **অভাব-অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা কর না। আমিই তাদেরকে রিজিক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা মহাপাপ।** (ইসরা, ১৭ : ৩১)

১৭৯৮ ঈসায়ি সালে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ রবার্ট ম্যালথাস জনসংখ্যানীতির ওপর তার প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, মানুষ বৃদ্ধি

পায় গাণিতিক হারে, কিন্তু সম্পদ বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে। অর্থাৎ জনসংখ্যা বাড়ে ১, ২, ৪ ও ৮ হারে। কিন্তু সম্পদ বাড়ে শতকরা ৩, ৫ কিংবা ১০ হারে। তিনি বলেন, অল্প কয়েক বছরের মধ্যে জনসংখ্যা দাঁড়াবে দ্বিগুণ কিংবা তিনগুণ। কিন্তু সম্পদ বৃদ্ধি পাবে কেবল একটি নির্দিষ্ট মাত্রার শতকরা হারে। এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তবে পৃথিবীতে প্রবল খাদ্যাভাব দেখা দিবে। সকল শিল্পোন্নত দেশই বর্তমানে ম্যালথাসের তত্ত্বকে অনুসরণ করছে এবং তাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। এই অবস্থা ঠিক তেমনি যেমনটি কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে আরব সমাজে ছিল। আরবরা তাদের কন্যা সন্তানদের হত্যা করত। মানুষ বর্তমানে হত্যা করছে না, কিন্তু দারিদ্রের ভয়ে শিশুর জন্ম নিয়ন্ত্রণ করছে। ম্যালথাসের তত্ত্ব ও মানুষের ভয়ের বিপরীতে আল্লাহ তাআলা আছেন এবং মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ করছেন। সন্দেহ নেই আফ্রিকার কোনো কোনো অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের ঘটনা ঘটেছে। এসব কিছুই ঘটেছে কিছু দায়িত্ব-জ্ঞানহীন মানুষের অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির কারণে। পুরো মানব সমাজ কোনো গণদুর্ভিক্ষে পতিত হয় নি কিংবা প্রত্যক্ষ করে নি, যা কুরআন মাজিদের একটি ভবিষ্যৎবাণী।

মুজিজা নং– ১৪১

মহানবী সা.- এর মক্কা প্রত্যাবর্তন

> **নিশ্চয় যিনি তোমার প্রতি কুরআনকে বিধান স্বরূপ দিয়েছেন, অবশ্যই তিনি তোমাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে ফিরিয়ে নেবেন। বল, আমার রব বেশি জানেন কে হিদায়েত নিয়ে এসেছে আর কে রয়েছে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায়।** (কাসাস, ২৮ : ৮৫)

আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী তার কুরআনের তাফসিরে লিখেছেন, প্রত্যাবর্তন স্থলের দু'টি অর্থ রয়েছে। প্রথমত, এটি মক্কা শহরের একটি উপাধি। দ্বিতীয়ত, এটি সেই উপলক্ষকে নির্দেশ করে যখন আমরা সকলে আমাদের পালনকর্তার সামনে সমবেত হব। তিনি আরও বলেন, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের প্রাক্কালে 'যুহফা' নামক স্থানে। যা মক্কা থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃতিগতভাবেই মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে যেতে কষ্ট অনুভব করছিলেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল তাকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সান্ত্বনা দিতে। এই ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবায়িত হয় আট বছরের মধ্যে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজেতার বেশে মক্কা প্রত্যাবর্তন সম্পন্ন করেন।

মুজিজা নং– ১৪২

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খ্যাতি ও মর্যাদা

> **আমি কি তোমার জন্য তোমার বক্ষ প্রশস্ত করি নি? আর আমি নামিয়ে দিয়েছি তোমার থেকে তোমার বোঝা, যা তোমার পিঠ ভেঙ্গে দিচ্ছিল। আর আমি তোমার (মর্যাদার) জন্য তোমার স্মরণকে সমুন্নত করেছি।** (ইনশিরাহ ০৯ : ১-৪)

এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মাক্কি জীবনের প্রথম দিকে, যখন তিনি ছিলেন এমন দুর্বল ও কঠিন পরিস্থিতিতে যে, তিনি শহরের মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা, ইসলাম প্রচার কিংবা নামাজ আদায় পর্যন্ত করতে পারতেন না। এমন প্রেক্ষাপটে কুরআন মাজিদ বলে, তার নাম সমুন্নত হয়েছে মহা সম্মানে। এই ভবিষ্যৎবাণী কিভাবে পূর্ণতা লাভ করেছিল তা দেখার জন্যে আবশ্যক হল, সেসব উপায়-উপকরণের প্রতি লক্ষ করা, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যশ-খ্যাতি ও মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন।

প্রথমত. 'মুহাম্মদ' হল বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় নাম। মুসলমানদের নামের শুরুতে, মাঝখানে কিংবা শেষে মুহাম্মদ শব্দ থাকাটা তাদের একটি অতি সাধারণ রীতি। এটি একটি অনুপম মর্যাদা যা আল্লাহ তাআলা কেবল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রদান করেছেন। লক্ষ লক্ষ মুসলমান সর্বদা এই নামটি বহন করে চলে। যা সারা বিশ্বে এই নামটিকে সর্বাধিক পরিচিতি ও সর্বাপেক্ষা পুনরাবৃত নামের মর্যাদা দান করেছে।

দ্বিতীয়ত. মুসলমানরা জ্ঞানের একটি নতুন শাখার সূচনা করেছে, যা ছিল মানুষের অজ্ঞাত। এ শাখাটি সিরাত নামে পরিচিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবন বৃত্তান্ত রচনার সঙ্গে এটি সম্পর্কিত। মুসলমানদের প্রতিটি প্রজন্ম 'সিরাত' রচনার ক্ষেত্রে একেকটি নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনী লেখার ধারা অব্যাহত রাখে।

তৃতীয়ত. মুসলমানরা সাহিত্যের একটি নতুন ধারাও শুরু করেছে, যা অদ্যাবধি মানুষের অজানা, এটি না'ত নামে পরিচিত। এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কবিতা রচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রতি বছরই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে না'ত সম্পর্কিত অসংখ্য বই প্রকাশিত হয়।

চতুর্থত. আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামকে ইসলামের মূল কালিমার একটি সম্পূর্ণ অংশ করেছেন। অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল)। প্রত্যেক

আমলদার মুসলমানই এই কালিমা তাদের জীবনের প্রাত্যহিক রুটিন হিসেবে বারবার উচ্চারণ করে। এভাবে অসংখ্য মানুষ তাদের জীবনের প্রতিটি দিন অসংখ্যবার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম উচ্চারণ করে থাকে।

পঞ্চমত. আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন। অসংখ্য মানুষ তা সম্পাদন করে এবং এভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম উচ্চারণ করে এবং তাদের প্রাত্যহিক জীবনে তাঁর গুণগান করে।

ষষ্ঠত. আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামকে আযানের অবিচ্ছেদ্য অংশ করেছেন, যা প্রতিদিন পাঁচবার করে পৃথিবীর প্রতিটি মসজিদ থেকে ধ্বনিত হয়। সেহেতু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামও সারা বিশ্বে দৈনিক পাঁচবার উচ্চারিত হয়। অধিকন্তু যদি কেউ ভূগোলকের দিকে লক্ষ করে তবে দেখতে পাবে, পৃথিবীর কোথাও না কোথাও সবসময় কোনো না কোনো নামাজের ও আযানের সময় বিরাজ করে। এভাবে দিন-রাতের চক্রাবর্তের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এমন কোনো ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয় না, যখন পৃথিবীর কোথাও না কোথাও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম উচ্চারিত হয় না। এ-কথাকেই কুরআন মাজিদে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে- 'আর আমি তোমার (মর্যাদার) জন্য তোমার স্মরণকে সমুন্নত করেছি।'

পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাসমূহ কুরআন মাজিদের বহু ভবিষ্যৎবাণীর বর্ণনা দেয়। এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কোনো মানুষই এমন জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে না যা কুরআন মাজিদের এসব ভবিষ্যৎবাণী ধারণ করবে। একজন মানুষ কিছু সঠিক অনুমান তৈরি করতে পারে। কিন্তু কুরআন মাজিদের ভবিষ্যৎবাণীর বৈচিত্র্যময়তা ও গুণগত মান পরিষ্কার সাক্ষ্য বহন করে যে, একমাত্র আল্লাহ তআলাই কুরআন মাজিদের জ্ঞানের উৎস।

এটা লক্ষ করা ও পর্যবেক্ষণ করা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, কুরআন মাজিদ দুই ধরণের ভবিষ্যৎবাণী প্রদান করে। কিছু ভবিষ্যৎবাণী নির্দিষ্ট ও স্বল্পস্থায়ী। কিন্তু অধিকাংশই সাধারণ ও দীর্ঘস্থায়ী। যদি কুরআন মাজিদ কেবল বিশেষ ও স্বল্পস্থায়ী ভবিষ্যৎবাণীসমূহ উল্লেখ করত, যেমন- আবু লাহাবের ধ্বংস সাধন, রোমকদের বিজয়, মদিনা থেকে ইহুদিদের উচ্ছেদ-

তবে অবিশ্বাসী ও কাফিররা এগুলোকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ধারণা-অনুমান বলে আখ্যা দিতে পারত। যাহোক, কুরআন মাজিদ বহু সাধারণ ও দীর্ঘ মেয়াদী ভবিষ্যৎবাণীর উল্লেখ করে, যেমন- মক্কার নিরাপত্তা, হজ্জের জন্য সফর, ইহুদি ও খৃস্টানদের ভূমিকা ইত্যাদি।

একজন সচেতন মানুষ ধারণা করতে পারে না যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সময় থেকে এত অগ্রসর হয়ে এসব বিষয় অনুমান করেছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে এসব ভবিষ্যৎবাণী তাঁর নিদর্শন হিসেবে রেখেছেন যাতে মানুষ এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে এবং তাঁর এই কিতাবকে তাদের জীবন পরিচালনার জন্য আসমানি নির্দেশিকা হিসেবে গ্রহণ করে।

> **'নিশ্চয় এটি মহিমান্বিত কুরআন। যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। কেউ তা স্পর্শ করবে না পবিত্রগণ ছাড়া। তা সৃষ্টিকুলের রবের কাছ থেকে নাজিলকৃত। তবে কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ জ্ঞান করছ? আর তোমরা তোমাদের রিজিক বানিয়ে নিয়েছ যে, তোমরা মিথ্যা আরোপ করবে? সুতরাং কেন নয়, যখন রুহ কণ্ঠদেশে পৌঁছে যায়। আর তোমরা তখন কেবল চেয়ে থাক। আর তোমাদের চাইতে আমি তার খুব কাছে; কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। তোমাদের যদি প্রতিফল দেয়া না হয়, তাহলে তোমরা কেন ফিরিয়ে আনছ না রুহকে, যদি তোমরা (তোমাদের স্বাধীনতা ও কুরআন অমান্য করার ক্ষেত্রে) সত্যবাদী হও?** (ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৭৭-৮৭)

দশম অধ্যায়

কুরআন মাজিদের চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত মুজিজাসমূহ

কুরআন মাজিদের মুজিজার একটি অনুপম দিক হল অবিশ্বাসীদের প্রতি বহু চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া। এসব চ্যালেঞ্জের সবগুলিই খুব সুনির্দিষ্ট, বলিষ্ঠ ও

সুস্পষ্ট। চৌদ্দশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তথাপি এ পর্যন্ত কেউ একটি সাধারণ চ্যালেঞ্জেরও জবাবে সাড়া দিতে সক্ষম হয় নি। যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামক একজন ব্যক্তি কুরআনে এসব চ্যালেঞ্জ সন্নিবিষ্ট করতেন, তবে অসংখ্য মানুষ সেসবের জবাবে সাড়া দিত। বাস্তবতা হল, কোনো মানুষ একটি সাধারণ চ্যালেঞ্জের জবাবেও সাড়া দেয় নি, যা যে কাউকে এই বিশ্বাসের পথে পরিচালিত করে যে, আল্লাহ তাআলাই এসকল চ্যালেঞ্জ কুরআন মাজিদে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এভাবে কুরআন মাজিদের প্রতিটি চ্যালেঞ্জই তা আসমানি গ্রন্থ হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। নিম্নে এসব চ্যালেঞ্জের কিছু নমুনা তুলে ধরা হল :

মুজিজা নং– ১৪৩

কুরআন মাজিদে সন্দেহের একটি ছায়া খুঁজে দেখাও

> **এই সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। মুত্তাকিদের (যারা আল্লাহর প্রতি তাদের করণীয়সমূহ সম্পর্কে সচেতন তাদের) জন্য হেদায়াত।** (বাকারা, ০২ : ০২)
>
> **আর আমি আমার বান্দার ওপর (কুরআন মাজিদে) বিভিন্ন সময়ে যা নাজিল করেছি যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক তবে তোমরা তার মত একটি 'সুরা' নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীসমূহকে ডাক; যদি তোমরা (তোমাদের সন্দেহের ক্ষেত্রে) সত্যবাদী হও।** (বাকারা, ০২ : ২৩)
>
> **এই কুরআন তো এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ তা রচনা করতে পারবে; বরং এটি যা (যে ওহি) তার সামনে, তার সত্যায়ন এবং কিতাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, যা সৃষ্টিকুলেন রবের পক্ষ থেকে।** (ইউনুস, ১০ : ৩৭)
>
> **এ কিতাব সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এতে কোনো সন্দেহ নাই।** (সাজদাহ, ৩২ : ০২)

লক্ষণীয় বিষয় হল, এই আয়াতগুলি কাফিরদেরকে কুরআন মাজিদের ভুল-ত্রুটি, অসঙ্গতি কিংবা অনৈক্য খুঁজে বের করতে বলে না, বরং কুরআন মাজিদে একটি সাধারণ সন্দেহের ছায়া খুঁজে বের করতে বলে। মানব ইতিহাসে এমন কোনো বইয়ের নজির নেই যার লেখক এই দাবি করতে পেরেছেন। কুরআন মাজিদই একমাত্র গ্রন্থ যা এই দাবি করেছে।

এখন আমরা সেসব বিবিধ সন্দেহের বিশ্লেষণ করি যা কোনো বই সম্পর্কে একজন মানুষের হতে পারে। তা এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা লিখিত, রচিত বা প্রচারিত হতে পারে, যিনি মানব সমাজে অপরিচিত কিংবা তা এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা লিখিত, রচিত বা প্রচারিত হতে পারে, যার চরিত্র, আচরণ কিংবা ন্যায়পরায়নতা সন্দেহপূর্ণ। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবন ইতিহাসের এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, তাঁর জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ পর্যন্ত সংরক্ষিত, লিখিত এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে। বস্তুত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই মানব ইতিহাসের একমাত্র ব্যক্তি যার জীবন বৃত্তান্ত বিগত চৌদ্দশ বছরের প্রত্যেক যুগের মুসলমানরাই লিপিবদ্ধ করেছে। অধিকন্তু এ সকল বিবরণ এতই ব্যাপক যে, তারা কেবল তার জীবন-বৃত্তান্ত লিখেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ, সামাজিক সম্পর্ক, আদান-প্রদান, কথা বলার ধরণ, হাঁটা-চলা, নিদ্রা যাওয়া, প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং তাঁর দেহাবয়বের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের ওপরও আলোকপাত করেছে। যেমন- তাঁর দাড়িতে শুভ্র চুলের পরিমাণ কত ইত্যাদি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ ও ন্যায়পরায়নতা সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মক্কায় তাঁর ঘোর শত্রুরাও তাঁকে 'সিদ্দিক' (সত্যবাদী) এবং 'আল-আমিন' (বিশ্বাসী) উপাধিতে ভূষিত করে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবন-ইতিহাস, চারিত্রিক ন্যায়পরায়নতা ও আচার-আচরণ সম্পর্কিত বাস্তব ঘটনাবলি এমন নির্ভুলভাবে সংরক্ষণের পর সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো সংশয় থাকতে পারে না যিনি মানব জাতির কাছে কুরআনের বাণী প্রচার করেছেন। তিনি ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বই নন, বরং একজন প্রখ্যাত ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যের প্রচারক।

অতএব এ থেকে বুঝা যায়, কুরআন মাজিদের উৎসের ক্ষেত্রে কোনো ধরণের সন্দেহের অবকাশ নেই।

দ্বিতীয় প্রকার সন্দেহ, যা একটি গ্রন্থে সৃষ্টি হতে পারে তা, তার অন্তর্নিহিত সঙ্গতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যদি একটি গ্রন্থের কিছু বর্ণনা অন্য বর্ণনার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে তা একটি গ্রন্থের অন্তর্নিহিত সঙ্গতি কিংবা সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে। পুরো কুরআন মাজিদে ৬,২৩৬টি আয়াত এবং ৮৬,৪৩২টি শব্দ রয়েছে।

তথাপি কুরআন মাজিদের একটি সাধারণ আয়াত, প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা কিংবা শব্দ অন্য অংশের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। পক্ষান্তরে প্রত্যেকটি আয়াত ও শব্দ সমগ্র কুরআন মাজিদের টেক্সটের সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। পাঠক এই বিষয়টি সহজে বুঝতে পারবেন, যদি বর্তমান বাইবেল সম্পর্কে কেবল দু'টি উদ্ধৃতি দেয়া হয়। প্রটেস্টেন্ট খ্রিস্টানদের বাইবেলের কপিতে বই সংখ্যা ৬৬টি, যার মধ্যে ৩৯টি বই পুরাতন সমাচার থেকে এবং ২৭টি বই নতুন সমাচার থেকে। অপরপক্ষে ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের বাইবেলের কপিতে বই সংখ্যা ৭৩টি; ৬৬টি বই প্রটেস্টেন্ট খ্রিস্টানদের কপি থেকে এবং ৬টি অতিরিক্ত বই যেগুলি Apocrypha (অ্যাপোক্রাইফা) নামে পরিচিত।

বাইবেলের এই দুই ধরনের ভার্সনের অস্তিত্ব থাকার কারণে পুরো বাইবেলের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর সুস্পষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন জাগে গ্রন্থটির কোন ভার্সনটি গ্রহণ করা যাবে, প্রটেস্টেন্ট ভার্সন না ক্যাথলিক ভার্সন? বাইবেলের একটি বিস্ময়কর অসঙ্গতি হল, এটি যীশু খ্রিস্টের (ঈসা আলাইহিস সালাম-এর) দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বংশ তালিকা প্রদান করে। বাইবেল অনুসারে, তার একজন পূর্বপুরুষের নাম হল যোসেফ। মেথিউ ১ : ১-৭ অনুসারে যোসেফের পিতার নাম জ্যাকব। পক্ষান্তরে লূক ৩ : ২৩ অনুসারে যোসেফের পিতার নাম হেলি।

আল হামদুলিল্লাহ। কুরআন মাজিদের কেবল একটি ভার্সনই সদা বিদ্যমান থেকেছে এবং এর টেক্সটও সবধরনের অসঙ্গতিরহিত। সেহেতু সন্দেহের দ্বিতীয় রূপ অর্থাৎ গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য অনুসারেও কুরআন মাজিদে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই।

একটি গ্রন্থে তৃতীয় প্রকার যে সন্দেহের সৃষ্টি হয় তা তার বাহ্যিক সঙ্গতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তার অর্থ, গ্রন্থটিতে এমন কোনো বর্ণনা থাকবে না, যা গ্রন্থটির বাইরের জগতের স্বতঃসিদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে। বিগত পৃষ্ঠাগুলি তার কিছু নমুনা প্রদান করে যে, কুরআন মাজিদের বর্ণনা শরীরবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভ্রূণবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়সহ কোনো মানবজ্ঞান জগতের সঙ্গেই অসঙ্গতি রাখে না। অধিকন্তু কুরআন মজিদ মানব জ্ঞানের সকল স্তর থেকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা রাখে, চাই তা প্রাচীন, সাম্প্রতিক কিংবা অতি সাম্প্রতিকই হোক না কেন।

এভাবে কুরআন মজিদ বাহ্যিক সঙ্গতির পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ। কোনো মানুষই এমন কোনো গ্রন্থ রচনা করতে পারে নি যা চিরকাল বাহ্যিক সঙ্গতির বিষয়টি রক্ষা করতে পেরেছে। প্রত্যেক বই-ই সময়ের সঙ্গে একটি ধাপ পেরিয়ে গেলে সেকেলে এবং মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে পড়ে। কুরআন মাজিদই একমাত্র গ্রন্থ যা সফলতার সঙ্গে বিগত চৌদ্দশ বছর যাবৎ বাহ্যিক সঙ্গতির চ্যালেঞ্জ মুকাবেলা করেছে। মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ তাআলাই এমন একটি গ্রন্থ অবতীর্ণ করতে পারেন, যা এমন সর্বব্যাপী জ্ঞান ধারণ করে যা সকল যুগের মানুষের জ্ঞানকে পরিব্যাপ্ত করে এবং সকল জ্ঞান জগতের ওপর নিরংকুশ শ্রেষ্ঠত্ব রাখে।

মুজিজা : ১৪৪

কুরআনের মত একটি গ্রন্থ নিয়ে আস

বল, যদি মানুষ ও জ্বিন এ কুরআনের অনুরূপ হাজির করার জন্য একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাজির করতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়। (ইসরা, ১৭ : ৮৮)

এই আয়াতটি সমগ্র মানব ও জ্বিন জাতিকে এ মর্মে চ্যালেঞ্জ করে যে, তারা পারলে কুরআন মাজিদের মত একটি গ্রন্থ তৈরি করে নিয়ে আসুক।

পাশাপাশি এও বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন মাজিদের মত একটি গ্রন্থ তৈরি করতে কেউ কখনো সক্ষম হবে না। বাস্তবতা হল, এমনকি, এ পর্যন্ত কেউ কুরআন মাজিদের মত একটি গ্রন্থ রচনা করার চেষ্টা পর্যন্ত করে নি, যা কুরআন মজিদ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক অবতীর্ণ আসমানি গ্রন্থ হওয়ার ব্যাপারে আরও একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। স্মরণ করে নেয়া ভাল যে, খৃস্টানরা বাইবেলের প্রচুর সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন ভার্সন তৈরি করেছে। কিন্তু কেউ কখনো কুরআন মাজিদের, এমনকি, একটি দ্বিতীয় ভার্সন পর্যন্ত প্রস্তুত করে, দেখায় নি।

মুজিজা : ১৪৫

কুরআন মাজিদের মত একটি সুরা নিয়ে আস

এ কুরআন তো এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ তা রচনা করতে পারবে; বরং এটি, যা তার সামনে রয়েছে, তার সত্যায়ন এবং কিতাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, যাতে কোনো সন্দেহ নাই, যা সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে। নাকি তারা বলে, 'সে তা বানিয়েছে?' বল, তবে তোমরা তার মত একটি সূরা (বানিয়ে) নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো (তোমাদের সাহায্যের জন্য) ডাক, যদি তোমরা (তোমাদের সন্দেহের ক্ষেত্রে) সত্য হয়ে থাক। (ইউনুস, ১০ : ৩৭-৩৮)

আয়াতদ্বয় সমগ্র মানব সমাজের জন্য একটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। আয়াতগুলি পরিষ্কার ভাষায় বলছে, কুরআন মাজিদ এমন একটি গ্রন্থ যা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ রচনা করতে পারে না। অতঃপর বলে, যদি কেউ ধারণা করে এটি একজন মানুষ কর্তৃক রচিত গ্রন্থ সে যেন নিদেনপক্ষে কুরআন মাজিদের মত একটি সুরা তৈরি করে নিয়ে আসে। বাস্তবতা হল, এ যাবৎ কেউ একটি সুরাও তৈরি করতে সক্ষম হয় নি, যা কুরআন মাজিদের কোনো সুরার অনুরূপ হতে পারে। আমরা এখানে একটি

ঘটনার কথা স্মরণ করি, যা তৎকালীন আরব সমাজ কুরআন মাজিদের এই চ্যালেঞ্জকে কিভাবে গ্রহণ করেছিল, তার চিত্র তুলে ধরবে।

কুরআন মাজিদের সর্বকনিষ্ঠ সুরা হল আল-কাউসার (১০৮)। এতে কেবল ছোট ছোট তিনটি আয়াত রয়েছে, যা কেবল একটি সাধারণ সারিতে লেখা যেতে পারে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘোর শত্রু আবু জেহেল এই সুরা শুনতে পেল সে এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, সে বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'সকল মহিমা প্রভুর জন্যে!' উল্লেখ্য যে, আরবরা ছিল খুবই কাব্যানুরাগী। আর কবিতা প্রতিযোগিতা ছিল তাদের সামাজিক অনুষ্ঠান-সমাবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঐতিহাসিকগণ লিখেন, বহুদিন যাবৎ সাতটি আরবি কবিতা তৎকালীন আরবি সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত ছিল। এই কবিতাগুলি পৃথক পৃথকভাবে কাগজের টুকরায় লিখে কাবা শরিফের প্রধান দরজায় ঝুলানো ছিল। ইতিহাসের গ্রন্থে সেগুলি 'সাবআ মুআল্লাকাত' বা ঝুলন্ত সপ্তক নামে খ্যাত।

যখন সুরা কাউসার অবতীর্ণ হয় তখন এসব কবিতার লেখকদের মধ্যে একজন ব্যতীত সবাই মৃত্যুবরণ করে। আবু জেহেল একটি কাগজের টুকরায় সুরা কাউসার লিপিবদ্ধ করে এবং তা একমাত্র জীবিত কবির কাছে নিয়ে যায়। যখন কবি সুরা কাউসার পড়ল, সে বিস্ময়ে ফেটে পড়ল এবং বলল, 'সকল মহিমা প্রভুর জন্যে! এটি কোনো মানুষের কথা হতে পারে না।' সে তখন কাবা শরিফে গেল, নিজের কবিতার টুকরা সেখান থেকে সরিয়ে ফেলল এবং সেখানে সুরা কাউসার লিখিত কাগজটি ঝুলিয়ে দিল। এমনও বর্ণিত আছে যে, সুরা কাউসারের শেষ তৃতীয় আয়াত অর্থাৎ 'ইন্না আতাইনাকাল কাউসার'-এর নিচে সে একটি ছন্দপূর্ণ লাইন যোগ করে দেয়- 'মা হাযা কালামুল বাশার'। অর্থাৎ এটি কোনো মানুষের কথা নয়।

মুজিজা : ১৪৬

কুরআনের মত দশটি সুরা রচনা করে নিয়ে আস

নাকি তারা বলে, সে এটি রটনা করেছে? বল, 'তাহলে তোমরা নিদেনপক্ষে দশটি সুরা বানিয়ে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার (তোমাদের সাহায্যের জন্য) ডেকে নিয়ে আস, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (হুদ, ১১ : ১৩)

আমরা এ ক্ষেত্রে মুসলমান ও কুরআনের বিপক্ষে মক্কাবাসীদের বিদ্বেষ ও শত্রুতার কথা একটু স্মরণ করি। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, কুরআন নাজিলের সময় সকল আরব, বিশেষত যারা মক্কায় ছিল, কুরআনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। তারা কুরআনের বাণীকে মিটিয়ে দিতে এবং মুসলমানদেরকে সমূলে উৎখাত করতে প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যায়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথী-সঙ্গীগণসহ মদিনায় হিজরত করা পর্যন্ত তাদের এ তৎপরতা অব্যাহত থাকে। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কতিপয় যুদ্ধেও লিপ্ত হয়। এতে তাদের কিছু পরাজয়, অপমান ও জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি গুণতে হয়। তারা তাদের একজন কবিকে ডেকে কুরআন মাজিদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কুরআন মাজিদের মত কিছু আয়াত রচনা করিয়ে নিলে এসকল ভোগান্তি এবং জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি সহজে এড়াতে পারত। তবে বাস্তবতা হল, আরবরা কুরআন মাজিদের চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে সক্ষম হয় নি, না এর অবতরণকালে, আর না বিগত চৌদ্দশ বছরের দীর্ঘ সময়ে।

মুজিজা : ১৪৭

কুরআন মাজিদের মত একটি বাণী তৈরি কর

তারা কি বলে, সে এটা বানিয়ে বলছে? বরং তারা ঈমান আনে না। অতএব তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে তার অনুরূপ একটি বাণী নিয়ে আসুক। (তুর, ৫২ : ৩৩-৩৪)

কুরআন মাজিদ একটি জীবন্ত মুজিজা, যা তার ভাষা, যুক্তি উপস্থাপন, অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনার বর্ণনা, শ্রোতাদের ওপর তার প্রতিক্রিয়া, সতর্কবাণী ও সুসংবাদ পরিবেশন, তার অন্তহীন জ্ঞান-ভাণ্ডার, মানব জীবনের ওপর তার প্রভাব এবং মানব ইতিহাস বিনির্মাণে এর ভূমিকা– সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এই আয়াতগুলি মানব জাতিকে কুরআন মাজিদের মত একটি বাণী রচনার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে। এ পর্যন্ত কোনো মানুষই কুরআন মাজিদের মত একটি বাণী রচনা করতে পারে নি। এ থেকে বুঝা যায়, কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এক আসমানি গ্রন্থ। তা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামক একজন মানুষের রচিত নয়।

মুজিজা : ১৪৮

কুরআন মাজিদে একটি অসঙ্গতি খুঁজে বের কর

তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ হতে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরিত্য দেখতে পেত। (নিসা, ০৪ : ৮২)

আসুন আমরা মানব ইতিহাসের একটি সাধারণ ঘটনা স্মরণ করি। যখন থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর ওপর কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হয়, একদল কাফির সর্বদা এর বিরুদ্ধাচরণ করে আসে। তারা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, কুরআন মাজিদ সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ নয়। বলাবাহুল্য, তারা উপর্যুক্ত আয়াতটি পড়েছে। বিগত চৌদ্দশ বছরে কোনো ব্যক্তিই এ যাবৎ পুরো কুরআন মাজিদে একটি বৈপরিত্য খুঁজে বের করতে পারে নি।

যদি বর্তমান সময়ের বাইবেলের ভার্সন থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হয় তবে পাঠকবৃন্দ বিষয়টি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। বাস্তব কথা হল,

বর্তমান সময়ের বাইবেলে এত বেশি বৈপরিত্য ও অসঙ্গতি বিদ্যমান এবং তা এত ভালভাবে প্রমাণিত যে, খৃস্টানদের প্রতিটি দলই তা স্বীকার করে নেয়। নিম্নে বর্তমান বাইবেলের কিছু সুপরিচিত অসঙ্গতি তুলে ধরা হল :

'ম্যাথিউ ১০ : ২-৪– এর মধ্যে বারোজন ঈসায়ি ধর্ম প্রচারকের যে নাম দেয়া হয়েছে তা 'লুক' ৬ : ১৪-১৬– এর মধ্যে প্রদত্ত নামগুলি থেকে ব্যতিক্রম। আর স্যামুয়েল ৬ : ২৩ অনুসারে সল (Saul) এর কন্যা মৃত্যুর সময় কোনো ছেলে সন্তান রেখে যান নি। পক্ষান্তরে স্যামুয়েল ২১ : ১ অনুসারে তিনি পাঁচ সন্তান রেখে যান। অনুরূপভাবে জুডাস (Judas)-এর মৃত্যু সম্পর্কে বাইবেল দু'টি ভিন্ন ভিন্ন তথ্য প্রদান করে। ম্যাথিউ ২৭ : ৫ বলে, 'আর গীর্জার রূপার টুকরোসমূহ নিক্ষেপ করে তিনি নিষ্ক্রান্ত হন এবং চলে গিয়ে নিজেকে ফাঁসিতে ঝুলান।' এ্যাক্ট ১ : ১৮ বলে, 'এই লোকটি তার দুষ্টামির পুরস্কার নিয়ে একটি মাঠ ক্রয় করে এবং অধোমুখে পতিত হয়ে মাঝখানে ছিড়ে আর ফেটে যায়। তার সকল নাড়ি-ভূঁড়ি দ্রুতবেগে বের হয়ে পড়ে।' বাইবেলের নিম্নোক্ত বাক্যটিতে অন্য একটি অসঙ্গতি দেখা লক্ষণীয় । ম্যাথিউ ১২ : ৪০ অনুসারে যীশুখৃস্ট বলেন, 'যেহেতু যোনাহ (Jonah) তিমির পেটে তিনদিন তিনরাত ছিল, তাই মানব সন্তানও মাটির অভ্যন্তরে তিনদিন তিনরাত থাকবে।' যীশুকে দাফন করা হয় শুক্রবার সন্ধ্যায় এবং উত্তোলন করা হয় রবিবার সকালে, কেবল একদিন দুইরাত্রি পর; তিনদিন তিনরাত পরে নয়। বাইবেলের এটিও একটি অসঙ্গতি যে, লুক ২৪ : ৫১ অনুসারে যীশুর আরোহণ সংগঠিত হয় কবর থেকে উত্তোলনের দিন। পক্ষান্তরে Acts (এ্যাক্টস) ১ : ৩-৯ বলে, তা সংগঠিত হয় কবর থেকে উঠানোর চল্লিশ দিন পর। অধিকন্তু জেনেসিস (Genesis) ৬ : ৩ বলে, প্রভু মানুষের জীবনকালের ব্যাপ্তি ১২০ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। পক্ষান্তরে জেনেসিস (Genesis) ১১ : ১০-৩২ বলে, কিন্তু অতি শীঘ্রই মানুষ ১৪০-৬০০ বছর জীবন লাভ করবে। তাছাড়া এক্সোডাস (Exodus) ৪ : ২২ অনুসারে প্রভুর প্রথম পুত্র হল জ্যাকব (Jacob)। কিন্তু 'জারমিয়াহ' (Jermiah) ৩১ : ৯ অনুসারে এফ্রাইম (Ephraim)।

এই হল, আধুনিক বাইবেলে বিদ্যমান সুস্পষ্ট অসঙ্গতি, যা একজন সাধারণ পাঠকও লক্ষ করতে সক্ষম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এ পর্যন্ত কেউ সমগ্র কুরআন মাজিদে একটি সামান্য অসঙ্গতিও আবিষ্কার করতে পারে

নি। কুরআন মাজিদকে আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ গ্রন্থ বলতে বর্তমানযুগেও যারা নারাজ তাদের জন্য এ চ্যালেঞ্জ এখনো উন্মুক্ত।

মুজিজা : ১৪৯

কুরআন মাজিদের সংরক্ষণ

> **নিশ্চয় আমি (আল্লাহ) কুরআন নাজিল করেছি, আর আমিই তার হেফাজতকারী।** (হিজর, ১৫ : ০৯)
>
> **আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?** (কামার, ৫৪ : ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

যেসব উপায়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদের সংরক্ষণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করেছেন তার মধ্যে একটি হল, তিনি ঈমানদারদের জন্য কুরআন মুখস্ত করাকে সহজ করে দিয়েছেন। বস্তুত কুরআন মাজিদই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা তার অনুসারীরা মুখস্ত করে থাকে। প্রতিটি মুসলিম সমাজে প্রচুর সংখ্যক ব্যক্তি কুরআন অবতরণের প্রথম দিন থেকে তা সম্পূর্ণরূপে মুখস্ত করে আসছে। পাঁচ বছরের ছোট শিশু থেকে নিয়ে ৫০ বছরের বৃদ্ধ পুরুষ-মহিলা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার কিতাবের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি নিয়ে পুরো কুরআন মুখস্ত করে থাকে। যে ব্যক্তি কুরআন মাজিদ মুখস্ত করেন তাকে 'হাফিজ' বলা হয়। এটি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার যে, একজন হাফিজ কেবল পুরো কুরআন মাজিদই মুখস্ত করে না, বরং সে কুরআন মাজিদের সকল যতিচিহ্ন, প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের বর্ণসমূহ পর্যন্ত মুখস্ত করে নেয়। মুসলমানরা সারা বিশ্বে রমজান মাসে পুরো কুরআন মাজিদের তেলাওয়াত শ্রবণ করে থাকে। অধিকাংশ মুসলিম সমাজ তারাবির নামাজের ব্যবস্থা করে, যেখানে একজন হাফিজের মাধ্যমে পুরো কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করানো হয়। সে সর্বদা হাফিজদের একটি দলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, যারা তার তেলাওয়াতকে পরীক্ষা করে। এটি কুরআন

মাজিদের একটি অনন্য রহস্য ও অনুপম মুজিজা। যদি একটি পুরো গ্রন্থ মুখস্ত করা মানুষের দ্বারা সম্ভব হত, নিদেনপক্ষে কিছু সংখ্যক লোক হলেও তাদের পবিত্র-কিতাবগুলো মুখস্ত করে নিত। যেহেতু, আল্লাহ তাআলা তাদের কিতাবগুলো সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেন নি, তাই তিনি সেসব কিতাবের অনুসারীদেরকে তা মুখস্ত করার ক্ষমতা দেন নি।

যাহোক, আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং এভাবে তার অনুসারীদেরকে তা মুখস্ত করার ক্ষমতা দান করেছেন। যে কোনো ধরনের বিকৃতি ও বিচ্যুতি থেকে কুরআন মাজিদের নিরাপদ থাকা এবং তার বিশ্বাসীদের দ্বারা তা মুখস্ত করা মানব জাতির জন্যে একটি ওপেন চ্যালেঞ্জ।

মুজিজা : ১৫০

মৃত্যু থেকে পলায়ন

> **তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবে যদিও তোমরা সুদৃঢ় দূর্গে অবস্থান কর।** (নিসা, ০৪ : ৭৮)
>
> **বল, 'তোমাদেরকে মৃত্যু দিবে মৃত্যুর ফেরেশতা যাকে তোমাদের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। তারপর তোমাদের রবের নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।** (সাজদাহ, ৩২ : ১১)

একজন সাধারণ পাঠক এই আয়াতগুলোতে কোনো বিশেষ কিছু কিংবা স্বতন্ত্র বিষয় দেখতে নাও পেতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হল, এই আয়াতগুলো মানব সমাজের জন্য একটি শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ। আয়াতএগুলিতে দুটি বিষয় ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমত, মৃত্যু অনস্বীকার্য এবং কেউ তা থেকে পালাতে পারে না। দ্বিতীয়ত, মৃত্যুর দিনক্ষণ একটি গুপ্ত বিষয়, যা কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন এবং কেউ তা কখনো জানতে পারবে না। এমনকি একজন নাস্তিকও স্বীকার করে যে, আল্লাহর শক্তির কাছে সে অসহায় এবং নিজের মৃত্যুর সময়টাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে

না। অধিকন্তু কোনো বিজ্ঞানীই এ পর্যন্ত কারো মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে নি। আমরা জীবন ও মৃত্যুর ওপর আল্লাহ তাআলার সার্বভৌম ক্ষমতার অসংখ্য প্রমাণ প্রত্যক্ষ করি।

অনেকই আছে যারা সাময়িক রোগ-যন্ত্রণায় ভোগে এবং বহু বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। আবার অনেকই এমন আছে যারা সুস্থ জীবন যাপন করে এবং হঠাৎ করে মৃত্যুবরণ করে। অধিকন্তু কারও অসুস্থতা যতই তীব্র হোক না কেন তা কোনো ব্যাপার নয়, কোনো চিকিৎসকই কারো মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে না। এটি এমন একটি জ্ঞান, যা না এ পর্যন্ত কেউ অর্জন করতে পেরেছে, আর না অর্জন করতে পারে। কারো মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে কেবল আল্লাহ তাআলাই অবগত আছেন।

মুজিজা : ১৫১

আল্লাহ তাআলার সার্বভৌম ক্ষমতা

> **তবে কি তোমরা এই বাণীকে (কুরআনকে) তুচ্ছ জ্ঞান করছ? আর তোমরা রিজিক বানিয়ে নিয়েছ যে, তোমরা মিথ্যা আরোপ করবে। সুতরাং কেন নয়- যখন রুহ কণ্ঠদেশে পৌঁছে যায়? আর তোমরা তখন কেবল চেয়ে থাক। আর তোমাদের চাইতে আমি তার খুব কাছে; কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। তোমাদের যদি প্রতিফল দেয়া না হয়, তাহলে তোমরা কেন ফিরিয়ে আনছ না রুহকে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?** (ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৮১-৮৭)

এই আয়াতগুলি ব্যাখ্যা ব্যতীতই বোধগম্য। কুরআন মাজিদ মানব জাতিকে এই ওপেন চ্যালেঞ্জ প্রদান করে যে, কোনো মানুষই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার পথে অন্তরায় হতে পারে না। এক আল্লাহ তাআলাই মানব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেন। কোনো মানুষই কখনো সাহায্যপ্রাপ্ত হয় নি কিংবা সেই ব্যক্তিকে কখনো সাহায্য করতে পারে নি যার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। প্রায়ই এমন ঘটে থাকে যে, ডাক্তাররা কিংবা তাদের পরিবারের

সদস্যরা এমন রোগে মৃত্যুবরণ করে, যে রোগে তারা বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এই আয়াতগুলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার সার্বভৌম আদেশ ও ক্ষমতার কথা বলে। চলুন আমরা তার আদেশের কাছে মাথা নত করি এবং আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও চলনে-বলনে কুরআন মাজিদকে আসমানি বার্তা ও নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করি।

> **বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিমান। যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিকে থেকে উত্তম? আর তিনি মহাপরক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল। (মুলক, ৬৭ : ০১-০২)**

(লক্ষ কর,) নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য বহু নির্দশন। যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (বলে) 'হে আমাদের রব, তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি কর নি। তুমি পবিত্র মহান। সুতরাং তুমি আমাদেরকে আগুনের আজাব থেকে রক্ষা কর'।

একাদশ অধ্যায়

বিচার দিবসের জ্যোতির্বস্তুবিদ্যা

জ্যোতির্বস্তুবিদ্যা (Astrophysics) আপেক্ষিকভাবে বিজ্ঞানের একটি নতুন ক্ষেত্র। জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক উৎকর্ষ

সাধনের ফলে মহাবিশ্বের রহস্যসমূহের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন মহাবিশ্বের পরিসমাপ্তি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। জ্যোতির্বস্তুবিদ্যার জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা এখন এই সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছেন যে, যদি এই মহাবিশ্বের কখনো পরিসমাপ্তি ঘটে তবে এই পরিসমাপ্তির প্রক্রিয়া ও পরিণতি কী দাঁড়াবে?

অনেক আয়াতে কুরআন মাজিদ বলে যে, এই মহাবিশ্বের একদিন পরিসমাপ্তি ঘটবে, যেদিনকে বলা হয়েছে বিচার দিবস। আর কুরআন মাজিদ এই দিবস সম্পর্কে আরও বিভিন্ন বিস্তারিত বিবরণও পেশ করেছে। এগুলিকে সংক্ষেপে চারটি প্রধান ধাপে ব্যক্ত করা যেতে পারে–

১. একটি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ভূকম্প এবং ভূগর্ভস্থ বস্তুসমূহ বের হয়ে পড়া।

২. কবর থেকে মানুষের উত্থান।

৩. এমন এক সময় যখন সকলের আমলনামা প্রকাশ করা হবে।

৪. আকাশের দরজাসমূহের উন্মোচন এবং প্রত্যেকের একটি উচ্চ মাত্রার জীবনে উত্তরণ অর্থাৎ বেহেশত কিংবা দোযখে।

জ্যোতির্বস্তুবিদ্যা ও সৃষ্টিতত্ত্বের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক গবেষণাসমূহ কুরআন মাজিদে বর্ণিত বিচার দিবস সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহকে সমর্থন করে। এই আয়াতগুলো কুরআন মাজিদের মুজিজার ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। কুরআন মাজিদ বিচার দিবস সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করেছে তা এখন 'Reversal of Time and Gravity' (সময় ও অভিকর্ষের বিপর্যাস) সূত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, জ্যোতির্বস্তুবিদ্যা অনুসারে যা ঘটবে খুব শীঘ্রই কিংবা কিছু বিলম্বে। কিছু মৌলিক জ্ঞান পাঠকদেরকে 'Reversal of Time and Gravity' তত্ত্ব এবং কুরআন মাজিদে বর্ণিত বিচার দিবসের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করবে।

আমাদের ছায়াপথ 'আকাশ গঙ্গায়' সূর্যসহ ২০০ বিলিয়ন নক্ষত্র রয়েছে। মহাবিশ্ব এতই প্রকাণ্ড যে, তার দূরত্ব পরিমাপ করা হয় আলোকবর্ষ দ্বারা। আলো এক বছরে যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হয় এক

আলোকবর্ষ। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। আলোর এই গতির ওপর ভিত্তি করে আমাদের পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে দূরত্ব হল ৮ মিনিট। এর তুলনায় পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্রটি পৃথিবী থেকে চার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। 'আকাশগঙ্গার' এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দূরত্ব এক লক্ষ ৫০ হাজার আলোকবর্ষ। ছায়াপথগুলো একটি থেকে আরেকটি গড়ে ১০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এই তথ্যগুলি আমাদের মহাবিশ্বের বিস্তৃতি এবং তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার অপরিসীম ক্ষমতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়।

মহাবিশ্বের উৎপত্তি হয় আজ থেকে প্রায় ১৫-২০ বিলিয়ন বছর আগে এক মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে, যাকে বলা হয় Big Bang। সূচনালগ্ন থেকে এটি নিয়ত সম্প্রসারণশীল অবস্থায় রয়েছে। এতদুভয় ঘটনাই অর্থাৎ Big Bang-এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও তার সম্প্রসারণ- এই বইয়ের মধ্যে ইতোপূর্বে কুরআন মাজিদের মুজিজা হিসেবে আলোচিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা জানেন না, এই সম্প্রসারণ অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে কি-না, যদি এই সম্প্রসারণ চলতে থাকে, বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, এমন এক সময় আসবে যখন সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের শক্তি ফুরিয়ে আসবে, ফলে এই সম্প্রসারণ থেমে যাবে। ফলে মহাবিশ্ব সংকোচনের একটি প্রক্রিয়া শুরু হবে। পরবর্তীতে এটি 'Reversal of Time and Gravity'-র প্রক্রিয়া শুরু করবে। এই সংকোচনশীল মহাবিশ্ব চূড়ান্তরূপে একটি খুব উষ্ণ ও সংকোচিত অবস্থায় উপনীত হবে, যাকে বলা হয় ' Big Crunch'। এটিই হবে বিচার দিবসের সূচনা। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে আমরা এখন কুরআন মাজিদে উল্লেখিত বিচার দিবসের কিছু বিশেষ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব।

এই তথ্যগুলি নেওয়া হয়েছে ডক্টর মুহাম্মদ হুমায়ুন খানের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ থেকে, যা নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'The message international'-এর জানুয়ারি ২০০১ সংখ্যায় ছাপা হয়ছে। আরও বিস্তারিত জানার জন্য পাঠক মূল প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন।

মুজিজা : ১৫২

নক্ষত্রের পতন

(তখন তোমরা কী করবে) যখন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, অতঃপর তা রক্তিম গোলাপের ন্যায় লাল চামড়ার মত হবে। (রহমান, ৫৫ : ৩৭)

'নাসা' সম্প্রতি আসমানসমূহের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছবি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ 'নাসা' থেকে এই ছবিটি সংগ্রহ করতে পারেন। এর নামকরণ করা হয়েছে Cats Eye Nebula (বিড়াল চক্ষু নীহারিকা)। নাসা এই চিত্রটি ধারণ করে ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ তারিখে। এর অফিসিয়াল সংকেত হল 'NGC 6543'। এই ছবিটি দেখতে লাল গোলাপের পাপড়ির মত। এই আয়াতে কুরআন মাজিদ বলে, এমন একদিন আসবে যখন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। এবং তা গোলাপের মত লাল বস্তুতে পরিণত হবে। নাসা'র মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বলেন, এই চিত্রটি একটি নক্ষত্রের মৃত্যু ও ধ্বংসের চিত্র প্রদর্শন কিংবা প্রতিনিধিত্ব করে যা আসমানে সংগঠিত হয়েছে তিন হাজার আলোক বর্ষের দূরত্বে। কুরআন মাজিদ কিভাবে আজ থেকে শত শত বছর পূর্বে একথা বলতে পারল যে, যখন মহাবিশ্বে একটি নক্ষত্র সশব্দে বিদীর্ণ হবে, যা দেখতে একটি গোলাপের লাল পাপড়ির মত দেখাবে- তা সর্বজ্ঞাতা, জ্ঞানময় প্রভু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতরণ ব্যতিরেকে হতে পারে না।

তার সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে যে, মহাবিশ্ব নিয়ত সম্প্রসারণশীল অবস্থায় রয়েছে। একদল বিজ্ঞানী অসংখ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ধারণা পোষণ করেন যে, এই সম্প্রসারণ একদিন থেমে যাবে এবং সংকোচনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। মহাবিশ্ব তখন একটি বেলুনের মত সংকুচিত হবে এবং কুঁচকে যাবে। সকল গ্রহ-উপগ্রহ যা বর্তমানে মহাকাশে পরস্পর বহুদূরে এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে সেগুলি খুব নিকটে চলে আসবে একটি বেলুনের উপরিভাগের বিন্দুসমূহের মত করে। যেহেতু সংকোচন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে, ফলে গ্রহ-উপগ্রহের বিভিন্ন দল পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যাবে এবং একটির সঙ্গে আরেকটির ধাক্কা লেগে সশব্দে বিস্ফোরিত হয়ে আরো

অধিক লাল গোলাপী চিহ্নের সৃষ্টি করবে। শেষের দিকে পুরো মহাবিশ্বই লাল গোলাপের পাপড়ির মত দেখাবে। (আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন) এটি হতে পারে কিয়ামত দিবস এবং পৃথিবীর সমাপ্তি। তবে এই আয়াতে মহাকাশে নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ও মৃত্যুর একটি স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং তেমনিভাবে কিয়ামতের দিবসে এই পৃথিবীর পরিসমাপ্তির বিষয়টিও পরিষ্কার হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকাশে অসংখ্য লাল গোলাপী চিহ্নের প্রমাণ পেয়েছেন, এসব কিছু পূর্বেকার নক্ষত্রসমূহের মৃত্যুর কথাই ব্যক্ত করে।

মুজিজা : ১৫৩

কিয়ামত দিবসের সুনির্দিষ্ট সময়

তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে, 'তা কখন ঘটবে?' তুমি বল, 'এর জ্ঞান তো রয়েছে আমার রবের নিকট। তিনিই এর নির্ধারিত সময়ে তা প্রকাশ করবেন। (আরাফ, ০৭ : ১৮৭)

কিয়ামত নিকটবর্তী। আল্লাহ ছাড়া কেউ তা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। (নাজম, ৫৩ : ৫৭-৫৮)

মহাবিশ্ব বর্তমানে সম্প্রসারণশীল অবস্থায় আছে। কেউ জানে না কিংবা ধারণা করতে পারে না কখন এই সম্প্রসারণ ও বিস্তৃতি বন্ধ হবে এবং সংকোচন শুরু হবে। এর অর্থ হল, কেউ কখনো ভবিষ্যৎবাণী করতে পারবে না কিংবা জানতে পারবে না, কিয়ামত দিবস কখন শুরু হবে। কেবল সৃষ্টিকর্তা ও এই মহাবিশ্বের প্রভু আল্লাহ তাআলাই এই মহাবিশ্বের সংকোচনের সময় সম্পর্কে জানেন এবং কিয়ামত দিবসের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে অবহিত আছেন। এটি মানবজাতির জন্যে একটি চ্যালেঞ্জ যা কুরআন মাজিদ এই আয়াতে ঘোষণা করেছে।

মুজিজা : ১৫৪

কবরে অবস্থানের সময়কাল

আর যেদিন তিনি তাদেরকে একত্র করবেন। যেন তারা দিবসের মুহূর্তকালমাত্র অবস্থান করেছে (কবরের মধ্যে)। (ইউনুস, ১০ : ৪৬)

আর যেদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে সেদিন অপরাধীরা কসম করে বলবে যে, তারা (কবরে) মুহূর্তকালের বেশি অবস্থান করে নি। এভাবেই তারা সত্যবিমুখ থেকেছে। (রুম, ৩০ : ৫৫-৫৬)

কুরআন মাজিদ জীবনকে চৈতন্য এবং মৃত্যুকে নিদ্রা বলে ব্যক্ত করেছে। মৃত্যু যখন আমাদেরকে একবার গ্রাস করে, তখন কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থান পর্যন্ত আমাদের কোনো সময়-জ্ঞান থাকবে না। এ থেকে বুঝা যায়, যখন মানুষ কবর থেকে উত্থিত হবে তখন তাদের কবরে অবস্থানের সময়কাল সম্পর্কে কোনো ধারণা থাকবে না। যদিও তারা সেখানে শত শত বছর অবস্থান করবে, তথাপি তারা চিন্তা করবে, তারা সেখানে এক ঘন্টা কিংবা সেরকম কিছু সময় অবস্থান করেছে।

মুজিজা : ১৫৫

বিপর্যয়কারী ভূমিকম্প

যখন পৃথিবী প্রকম্পিত হবে (চূড়ান্ত) প্রচণ্ড কম্পনে। (যিলযাল, ৯৯ : ০১)

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। (হজ, ২২ : ০১)

কুরআন মাজিদ আরও কিছু আয়াতে বলে, পৃথিবীর সমাপ্তি ঘটবে একটি প্রলঙ্করী ভূমিকম্পের মাধ্যমে। যার ফলে পৃথিবীর উপরিভাগের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা মধ্যাকর্ষণশক্তির জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে এ ধরনের একটি প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাখ্যা দিতে পারি এবং তার অনুমানও করতে পারি। এটি সর্বজনস্বীকৃত বিষয় যে, সময় ও উচ্চতার সামান্য ব্যবধানের কারণে মধ্যাকর্ষণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন হয়। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠার সঙ্গে সঙ্গে সময়ও কিছুটা দ্রুততার সঙ্গে অতিক্রান্ত হতে থাকে। সময়ের এই ব্যবধান চাই তা যত সূক্ষ্মই হোক না কেন, আণবিক ঘড়ির সহায়তায় পরিমাপ করা যায়। যখন অবশেষে এই মহাবিশ্ব সংকোচনের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, জ্যোতির্বস্তুবিদদের মতে, আগে হোক কিংবা পরে, একটা ঘটনা সংঘটিত হবে। সময়ের আবর্তনও উল্টে যাবে। তা মধ্যাকর্ষণশক্তিকে একটি বিপরীত অবস্থায় নিয়ে যাবে। ফলে ভূপৃষ্ঠের সকল বস্তু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে, এমন একটি ভূমিকম্প সৃষ্টির মাধ্যমে, যা ইতোপূর্বে দৃষ্টিগোচর হয় নি। এটি পৃথিবীপৃষ্ঠের সবকিছুকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিবে, যেমনটি কুরআন মাজিদে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

মুজিজা : ১৫৬

পর্বতমালার অন্তর্ধান

যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে–একটি ফুঁক। আর জমিন ও পর্বতমালাকে সরিয়ে নেয়া হবে এবং মাত্র একটি আঘাতে এগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। (আলহাক্কা, ৬৯ : ১৩-১৪)

আর তারা তোমাকে পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। বল, 'আমার রব এগুলিকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন। তারপর তিনি তাকে (পৃথিবীকে) মসৃণ সমতলভূমি করে দিবেন। তাতে তুমি কোনো বক্রতা ও উচ্চতা দেখবে না। (ত্ব-হা, ২০ : ১০৫-১০৭)

মধ্যাকর্ষণশক্তি পর্বতমালাকে বর্তমানে পৃথিবীপৃষ্ঠের সঙ্গে ধারণ করে আছে এবং সেগুলিকে বর্তমান রূপ দান করেছে। এক সময় মধ্যাকর্ষণশক্তি পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এটি অবশ্যম্ভাবী যে, পর্বতগুলি তাদের স্বরূপ হারিয়ে ফেলবে এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, শেষ বিচারের দিনে মধ্যার্ষণশক্তির রূপান্তরিত অবস্থা আক্ষরিক অর্থে ভূপৃষ্ঠের সবকিছুকে বিদীর্ণ করে দিবে। ভূমি ও পর্বতমালা হঠাৎ করেই উপরের দিকে অপসারিত হবে এবং একটি মাত্র আঘাতে নিচে নেমে আসবে। পর্বতসমূহ তখন ধুলিকণায় পরিণত হবে এবং অদৃশ্য হয়ে যাবে। এই ঘটনা দু'টিই কুরআন মাজিদের আয়াতে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে। সকল প্রশংসা ও মহিমা জ্ঞানময় আল্লাহ তাআলার জন্য। কুরআন মাজিদ যা চৌদ্দশ বছর পূর্বে বর্ণনা করেছে, বিজ্ঞানীরা এখন তারই ভবিষ্যৎবাণী করছেন।

মুজিজা : ১৫৭

ভূগর্ভ শূন্য হয়ে যাওয়া

> **আর যখন জমিনকে সম্প্রসারিত করা হবে। আর তার মধ্যে যা রয়েছে তা নিক্ষেপ করবে এবং খালি হয়ে যাবে।** (ইনশিকাক, ৮৪ : ০৩-০৪)
>
> **যখন প্রচণ্ড কম্পনে জমিন প্রকম্পিত হবে। আর জমিন তার বোঝা বের করে দেবে। আর মানুষ বলবে, 'এর কী হল?' সেদিন জমিন তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।** (যিলযাল, ৯৯ : ০১-০৪)

এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন মধ্যাকর্ষণশক্তির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ উল্টে যাবে। যেমনটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, জ্যোতির্বস্তুবিদরা বিশ্বাস করেন, মধ্যাকর্ষণশক্তির এমন একটি পরিবর্তন আসা সুনিশ্চিত, তা কিছু আগে হোক বা পরে। মধ্যাকর্ষণশক্তির এই পরিবর্তনের ফলে পৃথিবী তার অভ্যন্ত রস্থ সকল বস্তু বাইরে নিক্ষেপ করে বহির্দিকে সম্প্রসারিত হবে। এটি

যেমনটি কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে, পৃথিবীকে তার অভ্যন্তরস্থ অংশকে খালি করে দেয়ার দিকে পরিচালিত করবে। যখন পৃথিবী তার উদরকে খালি করে দেবে, তখন তা তার মধ্যে দাফনকৃত সব বস্তুকেও বাইরে নিক্ষেপ করবে। এটা হবে কবর থেকে মৃতদের পুনরুত্থান, যেমনটি কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে।

মুজিজা : ১৫৮

কবর থেকে মৃতদের উত্থান

> **সেদিন আমি আসমানসমূহকে গুটিয়ে নেব, যেভাবে গুটিয়ে রাখা হয় লিখিত দলিল-পত্রাদি। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করব।** (আম্বিয়া, ২১ : ১০৪)

লিখিত কাগজ গুটানোর মত করে আসমানসমূহকে গুটানোর বিষয়টি হবে বিচার দিবসে সময়ের সংকোচনের প্রভাব। প্রকৃতিতে সকল বস্তুই পশ্চাত দিকে আবর্তিত হবে, একটি বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি পশ্চাত দিকে গুটিয়ে যাওয়ার মত করে। অধিকন্তু সময়ের চক্রাবর্তের ফলে মানুষেরা তাদের কবর থেকে উত্থিত হবে এবং পুনরুজ্জীবন লাভ করবে। সম্ভবত এটিই আয়াতে উল্লিখিত সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি।

মুজিজা : ১৫৯

আমলনামা উন্মোচন

> **আর আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার ঘাড়ে সংযুক্ত করে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন তার জন্য আমি বের করব একটি কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত।** (ইসরা, ১৭ : ১৩)

যেদিন তাদের জিহ্বাগুলো তাদের হাতগুলো ও তাদের পাগুলো তারা যা করত, সে ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। (নুর, ২৪ : ২৪)

সময়ের ক্রীড়াচক্রে বিচার দিবসে লোকেরা দেখতে পাবে অতীতে তারা কী করেছে। তাদের হাত, পা, মুখ ও চোখের ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। সকল ভাল ও মন্দ কর্ম যা তারা সম্পাদন করেছিল তাদের সামনে একটি চলচ্চিত্রের পুনরাভিনয়ের মত উপস্থাপন করা হবে। এই বিস্তৃত বিশ্বে মানুষকে ভাল-মন্দ কাজ নির্বাচনের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করা হয়েছে এবং সময়ের মাধ্যমে তার সকল কর্মকে রেকর্ড করে রাখা হয়েছে। বিচার দিবসে সংকুচিত বিশ্বে কারো কোনো স্বাধীন ইচ্ছা থাকবে না। যখন সময় ধীরে ধীরে পুনরাবর্তিত হবে, প্রত্যেক মানুষই একটি বইয়ের পৃষ্ঠা খোলার মত করে নিজের সকল ভাল-মন্দের রেকর্ড প্রত্যক্ষ করবে।

একজন নাস্তিকের বিশ্বাস হতে পারে, সময়ের উল্টোচক্রের ফলে মানুষ তার শৈশবে ফিরে যাবে, অতঃপর মাতৃগর্ভে, আর তা থেকে অস্তিত্বহীনতায়। পক্ষান্তরে একজন মুমিন জানে, এ সকল ঘটনা সময় ও মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রিত। তিনি তার ইচ্ছামতো এই সংকোচনকে থামিয়ে দেবেন। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্ম অনুসারে পুরস্কার, তিরস্কার বা ক্ষমা করে দেবেন।

মুজিজা : ১৬০

আকাশ উন্মোচন

সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে আসবে। আর আসমান খুলে দেয়া হবে, ফলে তা হবে বহু দ্বার বিশিষ্ট। (নাবা, ৭৮ : ১৮-১৯)

আর আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে। ফলে সেদিন তা হয়ে যাবে দুর্বল বিক্ষিপ্ত। (হাক্কা, ৬৯ : ১৬)

আসমানের দ্বার উন্মোচনের বিষয়টি এমন একটি ধারণা যা 'Black Holes' বা কৃষ্ণগহ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। এধরনের দরজা উন্মোচন হতে পারে অন্যজগত যেমন- জান্নাত কিংবা জাহান্নামের প্রবেশপথ হিসেবে।

কৃষ্ণগহ্বর বলতে আকাশের সেসব অবস্থানসমূহকে নির্দেশ করে যা নক্ষত্রসমূহের মৃত্যুর ফলে শূন্য পড়ে পড়ে। একটি নক্ষত্রের মৃত্যু অর্থ, তার মাত্রা নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। যখন নক্ষত্রের মৃত্যু হয় তা স্বীয় মধ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাবে ঘনীভূত হতে থাকে, যে পর্যন্ত না অণুসমূহের নিউক্লিয়াস অবশিষ্ট থাকে। একটি মৃত নক্ষত্র তার প্রকৃত আকার থেকে কয়েক মিলিয়ন গুণ কুঁচকে ছোট হয়ে যায়। যদি মৃত নক্ষত্রটি আমাদের সূর্যের মত একটি ছোট নক্ষত্র হয়, তবে তা একটি পালসার (এমন ছোট নক্ষত্র যাকে কেবল এক্সরে থেকে আসা বেতার সংকেত দিয়ে চিহ্নিত করা সম্ভব) হয়ে যায় এবং প্রতি ০.০৩ সেকেন্ডে রঞ্জনরশ্মি (X-Ray) নির্গত করে। যদি মৃত নক্ষত্রটি বড় হয়, তবে তার মধ্যাকর্ষণশক্তিজনিত ভাঙ্গন এতই তীব্র হয় যে, তা কেবল নিউক্লিয়ার স্তরে গিয়েই থামে না, বরং তা চলতে থাকে যতক্ষণ না তার সকল পদার্থ ও শক্তি একটি বিন্দুতে গিয়ে ঘনীভূত হয়- যাকে বলা হয় 'Singularity'। এই Singularity মহা জাগতিক কৃষ্ণগহ্বর গঠন করে। এমন বস্তু কণিকায় মধ্যাকর্ষণশক্তি এতই তীব্র যে, এমনকি আলো পর্যন্ত তা থেকে বিচ্ছুরিত হতে পারে না এবং সেগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। এ কারণে এগুলিকে বলা হয় কৃষ্ণগহ্বর।

জ্যোতির্বস্তুবিদরা বিশ্বাস করেন, মহাশূন্য সময় সম্পর্ক কৃষ্ণগহ্বরে এই মহাবিশ্বের পেছনে প্রবেশপথ তৈরি করে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে। মহাবিশ্বের বিস্তৃতির বর্তমান অবস্থায় কৃষ্ণগহ্বরে অবস্থিত বস্তুকণাসমূহ এই দরজা উন্মোচনে বাধার সৃষ্টি করে। মহাবিশ্বের সংকোচনের ধাপে এই সমস্যা আর থাকবে না। বিচার দিবসে মধ্যাকর্ষণশক্তির উল্টোচক্র পৃথিবী ও তার চারপাশে বেষ্টিত সকল মহাকাশীয় বস্তুসমূহকে পরিবর্তিত করে দেবে। সময় তখন মহাশূন্যেও সংকোচন কিংবা মধ্যাকর্ষণের উল্টোবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবে। মহাশূন্যের এই স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংকোচন পরিণামে মহাশূন্য ও সময়ের কাঠামোকে ভেঙ্গে দেবে এবং অবশেষে এই

মহাবিশ্বেও পেছনে প্রবেশ দ্বারের আকারে মহাশূন্য বিদীর্ণ হবে। এই আয়াতে (৬৯ : ২৬) আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। তা বলে, আসমান শেষ বিচারের দিন বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং তা হবে ভঙ্গুর। তার অনিবার্য অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বর্তমান মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণশীল অবস্থায় আসমান ভঙ্গুর নয়। এটি একটি মনোমুগ্ধকর বিষয় যে, কুরআন মাজিদের বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত, অথচ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

অতিক্রান্ত পৃষ্ঠাগুলি কুরআন মাজিদের মুজিজার ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। জ্যোতির্বস্তুবিদ্যার সাম্প্রতিক অগ্রগতি বিষয়ক কুরআন মাজিদের আয়াতসমূহ খুব কমই অধ্যয়ন করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে এমন একটি অবস্থানে পৌঁছেছেন যে, তারা কেবল এই মহাবিশ্বের পরিসমাপ্তি সম্পর্কেই ভবিষ্যৎবাণী করেন না, বরং তার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কেও মতামত ব্যক্ত করেন। এটি কুরআন মাজিদের একটি অনুপম মুজিজা যে, জ্যোতির্বস্তুবিদদের কোনো ভবিষ্যৎবাণী কিংবা কোনো তথ্যই কুরআন মাজিদের একটি সাধারণ বর্ণনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। পক্ষান্তরে এটি প্রমাণ করে যে, সকল আধুনিক বিজ্ঞানই অনুসন্ধান করে এবং ভবিষ্যৎবাণী প্রদান করে। বাস্তবতা হল, কুরআন মাজিদ মানব জ্ঞানের ওপর সর্বদা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও মানবজ্ঞানের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকবে। সকল যুগের মানুষই কুরআন মাজিদে নতুন নতুন মুজিজা আবিষ্কার করেছে এবং এই আবিষ্কারের ধারা অব্যাহত থাকবে।

> **‘যখন সূর্য (অন্ধকারে) গুটিয়ে নেয়া হবে। আর নক্ষত্ররাজি যখন পতিত হবে। আর পর্বতগুলোকে যখন সঞ্চালিত করা হবে। আর যখন দশমাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীগুলো উপেক্ষিত হবে। আর যখন বন্য পশুগুলোকে একত্র করা হবে। আর যখন সমুদ্রগুলিকে অগ্নিউত্তাল করা হবে। আর যখন আত্মাগুলোকে (সমগোত্রীয়দের সঙ্গে) মিলিয়ে দেয়া হবে। আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে? আর যখন আসমানকে আবরণমুক্ত করা হবে। আর জাহান্নামকে যখন প্রজ্বলিত করা হবে। আর জান্নাতকে যখন নিকটবর্তী করা হবে।**

> **তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারবে সে কী উপস্থিত করেছে?**
> (তাকবির, ৮১ : ০১-১৪)

দ্বাদশ অধ্যায়

কুরআন মাজিদের বুনিয়াদি বার্তা

মুসলিম-অমুসলিম সকলে একবাক্যে স্বীকার করে যে, কুরআন মাজিদ বর্তমানে তার সেই প্রকৃত রূপেই বিদ্যমান আছে যেমনটি মানবজাতির জন্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। কেবল কুরআন মাজিদের বিষয়বস্তুতেই কোনো পরিবর্তন আসে নি তা নয়, বরং, এমনকি, তার যতিচিহ্ন এবং বর্ণের ক্ষেত্রেও কোনোরূপ এদিক-ওদিক হয় নি। ফলশ্রুতিতে তার বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে এ পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন ওঠে নি।

বিগত পৃষ্ঠাগুলিতে কুরআন মাজিদের ১৬০টি সুস্পষ্ট মুজিজা উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমনটি ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, মুজিজা আল্লাহ তাআলারই কাজ। যদি পাঠক এসবের কোনো একটি মুজিজাকেও বিশ্বাস করে, প্রকারান্তরে সে যেন স্বীকার করে যে, কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আসমানি প্রত্যাদেশ। কুরআন মাজিদের শাশ্বত ও সদা বর্তমান মুজিজাসমূহও এ কথা নির্দেশ করে যে, এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্যে সার্বজনীন বার্তা। কুরআন মাজিদ এভাবে তার সিদ্ধতার শর্তটি যথাযথভাবে পূরণ করে। অতএব সকলের উচিত সাবধানতার সঙ্গে কুরআন মাজিদের মৌলিক বার্তার প্রতি মনোনিবেশ করা এবং এর নির্দেশনা অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার রহমত লাভ করা।

কুরআন মাজিদের বুনিয়াদি বার্তা হল, সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহ তাআলার একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা। এই বিশ্বাসের নাম তাওহিদ এবং তা ইসলামের সকল বিশ্বাসের মূল বুনিয়াদ বা ভিত্তি। এটি বিশ্বের সকল ধর্ম থেকে ইসলামকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। কুরআন মাজিদ তার বার্তা প্রচারের জন্য খুব সাধারণ ও মানবিক উপায় ব্যবহার করেছে। এটি মানুষের মৌলিক বিচার-বুদ্ধিতে আবেদন সৃষ্টি করে। যেমনটি কিয়দংশ নিম্নে তুলে ধরা হল :

বল, 'সকল প্রশংসাই আল্লাহর নিমিত্তে। আর শান্তি তাঁর বান্দাদের প্রতি যাদের তিনি মনোনীত করেছেন। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, না কি যাদের এরা শরীক করে তারা'? বরং তিনি (শ্রেষ্ঠ), যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সঙ্গে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? বরং তারা এমন এক কওম যারা শির্ক করে। বরং তিনি, যিনি জমিনকে

আবাসযোগ্য করেছেন এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদী-নালা। আর তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা এবং দুই সমুদ্রের মধ্যখানে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সঙ্গে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। বরং তিনি, যিনি নিরুপায়ের আহবানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে জমিনের প্রতিনিধি বানান। আল্লাহর সঙ্গে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে ? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। বরং তিনি, যিনি তোমাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন। আল্লাহর সঙ্গে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? তারা যা কিছু শরীক করে আল্লাহ তা থেকে ঊর্ধ্বে। বরং তিনি, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন এবং যিনি তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিজিক দান করেন, আল্লাহর সঙ্গে কি কোনো ইলাহ আছে? বল, 'তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' বল, 'আল্লাহ ছাড়া আসমানসমূহে ও জমিনে যারা আছে তারা গায়েব জানে না। আর কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে তা তারা অনুভব করতে পারে না'। বরং আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়েছে। বরং সে বিষয়ে তারা সন্দেহে আছে; বরং এ ব্যাপারে তারা অন্ধ। আর কাফিররা বলে, 'আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষরা মাটি হয়ে যাব তখনো কি আমাদেরকে উত্থিত করা হবে'? ইতঃপূর্বে আমাদেরকে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এ বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হয়েছিল, 'এটি প্রাচীন লোকদের উপকথা ছাড়া কিছুই নয়'। বল, 'তোমরা জমিনে ভ্রমণ কর, তারপর দেখ, কিরূপ হয়েছিল অপরাধীদের পরিণতি।' আর তাদের জন্য দুঃখ করো না এবং তারা যে ষড়যন্ত্র করে তাতে মনক্ষুণ্ন হয়ো না। আর তারা বলে, 'তোমরা সত্যবাদী হলে (বল) এই ওয়াদা কখন আসবে'? বল, 'আশা করা যায়, তোমরা যে বিষয়ে তাড়াহুড়া করছ তার কিছু অচিরেই হবে'। আর নিশ্চয় তোমার রব মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের বেশির ভাগই শুকরিয়া আদায় করে না। (নামাল ২৭ : ৫৯-৬৪)

তাওহিদের পর দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। কুরআন মাজিদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি জীবন্ত মুজিজা

এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও কুরআন মাজিদের জীবন্ত প্রতীক। কুরআন মাজিদ বলে,

‘যারা অনুসরণ করে রাসূলের, যে উম্মি নবী; যার গুণাবলি তারা নিজদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়, যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও বারণ করে অসৎ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃংখল- যা তাদের উপরে ছিল- অপসারণ করে। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং তার সঙ্গে যে নূর নাজিল করা হয়েছে তা অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।’ (আরাফ ০৭ : ১৫৭)

যুক্তি ও সাধারণ চেতনাবোধ এ কথা দাবি করে যে, যারা কুরআন মাজিদের এই বার্তা অনুসরণ করে তারা আল্লাহ তাআলার রহমত ও অনুগ্রহ লাভ করবে। আর যারা এই বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করবে তারা আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও সাজা প্রাপ্ত হবে। কুরআন মাজিদ এই বিষয়টি খুব পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে। এটি শেষ বিচারের দিবসের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে আহ্বান করে।

‘আর প্রত্যেককে তার আমলের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে এবং তারা যা করে সে সম্পর্কে তিনিই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। আর কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে এসে পৌঁছবে তখন তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কি রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করত এবং এ দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করত’? তারা বলবে, ‘অবশ্যই এসেছিল’; কিন্তু কাফিরদের ওপর আযাবের বাণী সত্যে পরিণত হল। বলা হবে, ‘তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, তাতেই স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। অতএব অহঙ্কারীদের আবাসস্থল কতই না মন্দ। আর যারা তাদের রবকে ভয় করেছে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে এসে পৌঁছবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রতি সালাম,

তোমরা ভাল ছিলে। অতএব স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এখানে প্রবেশ কর’। (যুমার ৩৯ : ৭০-৭৩)

আল্লাহ তাআলা পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু, অধিক উপকারী, সর্বাপেক্ষা অনুগ্রহশীল এবং অপরিসীম উদার। তিনি তাঁর সর্বশেষ বাণীকে মানব জাতির জন্য সকল ধরনের বিচ্যুতি ও ত্রুটি থেকে সংরক্ষিত রেখেছেন। আর তিনি তার সর্বশেষ এই বাণীকে করেছেন খুব সুস্পষ্ট, সব ধরনের অসঙ্গতি, এমনকি সন্দেহের লেশ থেকে পর্যন্ত রেখেছেন মুক্ত । অধিকন্তু তিনি তাঁর এই আসমানি বাণীকে দ্ব্যর্থকতা ও দুর্বোধ্যতা থেকে। তাঁর আসমানি বার্তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যক্তিত্বের মধ্যে তার একটি জীবন্ত নমুনাও পাঠিয়েছেন। একই সময়ে আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে সাধারণ বোধশক্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং বিচার-বিবেচনার গুণাবলিও দান করেছেন। অতঃপর তিনি প্রত্যেক মানুষকে তাঁর সেই গুণগুলি ব্যবহার করে তাঁর সর্বশেষ বাণীর অনুসরণ করা কিংবা তার গুণগুলিকে নষ্ট করে তাঁর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা দান করেছেন। তারাই রহমতপ্রাপ্ত যারা তাঁর বাণীর অনুসরণ করে। তারাই সেসব লোক যারা উভয় জগতে উন্নতি ও সফলতা লাভ করে। তারাই সেসব লোক যারা তার অপরিসীম রহমত ও দয়া লাভের আশা করতে পারে এবং পরকালে একটি অন্তহীন পুরস্কার জান্নাত এবং অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে। তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত যারা নিজেদের স্বার্থপর প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং তাঁর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে। তারাই হচ্ছে সেসব লোক যারা উভয় জাহানে ব্যর্থ ও বিফল। তারাই আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও সাজাপ্রাপ্ত হবে এবং তাদের আবাস হবে জাহান্নামের আগুনে, যেখানে তারা লাভ করবে কষ্ট ও যন্ত্রণার এক অনন্ত জীবন। ইরশাদ হয়েছে—

‘আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তোমাদের ওপর আজাব আসার পূর্বেই তার কাছে আত্মসমর্পণ কর। তার (আজাব আসার) পরে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। আর অনুসরণ কর উত্তম যা নাযিল করা হয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে আজাব আসার পূর্বে। অথচ তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে না। যাতে কাউকেও বলতে না হয়, হায় আফসোস! আল্লাহর হক আদায়ে আমি যে

শৈথিল্য করেছিলাম তার জন্য। আর আমি কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম'। অথবা যাতে কাউকে একথাও বলতে না হয়, 'আল্লাহ যদি আমাকে হিদায়াত দিতেন তাহলে অবশ্যই আমি মুত্তাকিদের অন্তর্ভুক্ত হতাম'। অথবা আজাব প্রত্যক্ষ করার সময় যাতে কাউকে একথাও বলতে না হয়, 'যদি একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ আমার হত, তাহলে আমি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম'। হ্যাঁ, অবশ্যই তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলি এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলোকে অস্বীকার করেছিলে এবং তুমি অহঙ্কার করেছিলে। আর তুমি কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। আর যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে কিয়ামতের দিন তুমি তাদের চেহারাগুলো কালো দেখতে পাবে। অহঙ্কারীদের বাসস্থান জাহান্নামের মধ্যে নয় কি? আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তোমাদের ওপর আজাব আসার পূর্বেই তার কাছে আত্মসমর্পণ কর। তার (আজাব আসার) পরে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। (যুমার, ৩৯ : ৫৪-৬১)

সমাপ্ত